তুলনামূলকভাবে জামায়াত এবং গোলাম আযমের চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক ছিল শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করেছিল জামায়াত। কিন্তু তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রক্ষক আওয়ামী-বাকশালীরা স্বাধীনতার পর অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল শত সহস্র মুক্তিযোদ্ধা।

'৯০ এর দশকের প্রথম যখন প্রফেসর গোলাম আযমের নাগরিকত্বের বিষয়টি কোর্টে বিবেচনাধীন তখন তথাকথিত '৭১ এর চেতনার ধারক-বাহকরা জাহানারা ইমামকে সামনে রেখে 'ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি' নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। এ বিষয়ে কোন বিতর্কে না গিয়ে সহজেই বলা চলে ঐ ধরণের উদ্যোগ নেবার আগে নিজেদের অতীতের দিকে তাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত ছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিন পরই ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে ত্রিপাক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৯ই এপ্রিল ১৯৭৪ সালে। চুক্তিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ অপরাধীদের বিনা বিচারে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন মুজিব। আপোষকামী এবং সুবিধাবাদী চরিত্রের শেখ মুজিবর রহমান সর্বোপরিসরে স্বাধীন বাংলার মাটিতে স্বাধীনতার শত্রুদের পুনর্বাসিত করে স্বাধীনতার চেতনার সাথে বেঈমানীর এক অবিশ্বাস্য নজীর স্থাপন করেছিলেন। সে সময় অধুনাকালের তথাকাথিত স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির চ্যাম্পিয়নরা সব কোথায় ছিলেন? কেন সেদিন শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠলেন না? শেখের আমলে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণআদালত গঠন করা হল না কেন? গোলাম আযম বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন তার রাজনৈতিক আদর্শের কারণে। তিনি যদি অপরাধী হন তবে তার চেয়েও বড় অপরাধী শেখ মুজিব, তার দল ও আওয়ামী-বাকশালীরা। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এককভাবে কুক্ষিগত করে নিয়ে স্বাধীনতার চেতনাকে সমূলে উৎপাটন করার চক্রান্ত করে জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তিনি ও তার দল। নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। তাই যুক্তিসঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের মাটিতে গণআদালতে গোলাম আযম ও তার দোসরদের বিচারের আগে বিচার করতে হবে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী-বাকশালীদের। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমীর মা জাহানারা ইমাম। পুত্র হারাবার শোকে তার স্বামীও মারা যান। বিশ বছর পর তথাকথিত গণআদালত গঠন করে আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে একই মঞ্চে দাড়িয়ে গোলাম আযমের বিচারের প্রহসন করে তিনি তার ছেলে শহীদ রুমীর বুকের রক্তের সাথেই বেঈমানী করার অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা নিধনকারী আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তার সম্মান হারিয়েছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার এ ধরণের উদ্যোগে ব্যক্তিগতভাবে আমিও দুঃখ পেয়েছি। জনাব রব, মেনন এন্ড গং এবং তথাকথিত প্রগতিশীল বিপ্লবী দলগুলোর নেতারা যারা বর্তমানে আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন তারাও আজ একই অপরাধে অপরাধী। তাদের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসনের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও দলীয় কর্মী। হালে আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদেরকে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার তাদের অপচেষ্টা জনগণকে বিস্মিত করেছে। নিজেদের স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে আওয়ামী লীগে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা নিজেদের আওয়ামী-বাকশালীদের 'বি' টিম বলে জনগণের মনে যে সন্দেহ বিরাজমান ছিল তাকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। হারিয়েছেন বিশ্বাসযোগ্যতা। লাখো শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানীর শাস্তিস্বরূপ তারা নিক্ষিপ্ত হবেন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। ইতিহাসের বিধান অমোঘ। সত্যকে খুজে

বের করার দায়িত্ব ঐতিহাসিকদের। সত্যের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে গতিশীল মানব সভ্যতার ইতিহাস। বাংলাদেশের ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ধুদ্ধ বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী এবং মুজিব সরকার

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চরিত্র এবং প্রত্যয়

স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতি যখন শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের ভারত তোষণ নীতি, ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি, সীমাহীন দুর্নীতি, অবাধ চোরাকারবার, রক্ষীবাহিনী এবং ব্যক্তিগত বাহিনী সমূহের ত্রাস, দমন নীতি, দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্দ্ধগতি, অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, সমাজতন্ত্রের নামে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত; তখন সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তারা শাসকদের হাতে শোষণের হাতিয়ার না হয়ে জনগণের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবেন।

এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশের প্রায় সব দেশই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো অস্ত্রবলে দখল করে নেয়। দখল করে নেবার পর ঔপনিবেশিক প্রভুরা প্রতিটি দেশে জাতীয় শোষক শ্রেণীর যোগসাজসে গড়ে তোলে দু'টো প্রশাসনিক হাতিয়ার, সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্র। নিজেদেরকে জনগণের প্রত্যক্ষ শোষক হিসেবে প্রতিপন্ন না করার এক অপূর্ব ব্যবস্থা। 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা' তোলার এ কৌশল গ্রহণ করে জাতীয় শোষক শ্রেণীকে যৎসামান্য সুখ-সুবিধা দিয়ে জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ তারা নিয়ে যায় নিজেদের দেশে। জাতীয় শোষক শ্রেণীকে বশীভূত করে তাদের বিদেশী ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের আকৃষ্ট করতেও সমর্থ হয় ঔপনিবেশিক প্রভুরা প্রগতি ও মানবতাবাদের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। বিজাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে জনগণের মাঝে। তারা মনে করে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেই তাদের দাসত্ব ঘুচে যাবে। দেশের উন্নতি হবে এবং জীবনের মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। তারই ফলে শুরু হয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। সংগ্রামের প্রচন্ডতার মুখে এক পর্যায়ে প্রত্যক্ষ শোষণ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লে ঔপনিবেশিক শাসকরা পরোক্ষ শোষণের বন্দোবস্ত করে। জাতীয় উচ্চবিত্ত ও তাদের দোসরদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দান করে প্রতিটি দেশের উপর পরোক্ষভাবে তাদের শোষণ কায়েম রাখে। বিদেশী প্রভুদের জায়গায় নতুন দেশী প্রভুরা ক্ষমতায় আসীন হয়ে তাদের প্রভুদের শিক্ষা অনুযায়ী এবং প্রভুদের প্রতিষ্ঠিত সামরিক বাহিনী, শাসন ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রকে অটুট রেখে নিজেদের স্বার্থে জনগণের বিরুদ্ধে তাদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে থাকে। জাতীয় শোষক শ্রেণীর এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শুরু হয় জাতীয় শোষণ ও শাসন। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। দেশগুলো আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক সূত্রে অর্থনৈতিকভাবে জরাজীর্ণ এসমস্ত দেশগুলোর শাসনভার যারা গ্রহণ করে তাদের অযোগ্যতা, প্রশাসন চালানোর অনভিজ্ঞতা, লোভ-লালসা, কোন্দল এবং ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ায় পালাক্রমে ক্ষমতা হাতবদল হতে থাকে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত দলগুলোর মধ্যে। এই 'মেরি গো রাউন্ড' এর গোলক ধাধাঁয় আজও তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ ঘুরপাক খাচ্ছে।

সামরিক বাহিনীই ক্ষমতায় থাকুক আর বেসামরিক রাজনৈতিক নেতারাই ক্ষমতায় থাকুক তাদের শিকড় একই শ্রেণীতে। তাই তাদের মধ্যে থাকে এক অটুট বন্ধন। তাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইকে রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে জাহির করার প্রচেষ্টা একটা প্রহসন মাত্র। জনগণকে বোকা বানানোর আরেকটি কায়দা। তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব যতই তীব্র হোক না কেন জনগণের বিরুদ্ধে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা নিজেদের বিবাদ ভুলে সব এক হয়ে যায়। এর ফলেই সম্ভব হয় সমঝোতার মাধ্যমে লোক দেখানো গণতন্ত্রের খেলা, দলবদলের ভেলকিবাজী। এই

উদ্দেশ্যেই মুক্তিযুদ্ধের অস্বাভাবিক ইতি টানার সাথে সাথে ঔপনিবেশিক ছাচে গড়া রাষ্ট্রযন্ত্রগুলো পুরোপুরি অক্ষুন্ন রাখার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সৃষ্টি, ইতিহাস ও চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পাকিস্তান স্বাধীন করার সংগ্রামে পূর্ব বাংলার জনগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশ সৃষ্ট শাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণের যাতাকলে পিষতে থাকে। এরই ফলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। স্বৈরতন্ত্র বিরোধী জাতীয়তাবাদী এ সংগ্রামে গণতান্ত্রিক চেতনাও গড়ে উঠতে থাকে। সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল দেশ স্বাধীন করে গণতান্ত্রিক, জনগণের মৌলিক এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে স্বনির্ভর সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠিদের নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল তৎকালীন সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বাঙ্গালী সদস্যদেরও। তাদের উপরও করা হয়েছিল অন্যায়-অবিচার। ফলে গোড়া থেকেই তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়ে এসেছেন জাতীয় সংগ্রামে। জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক সংগ্রামের চরম স্তরই ছিল '৭১ এর স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম। হানাদার বাহিনীর আচমকা হামলার মুখে যখন রাজনৈতিক নেতারা জাতিকে লক্ষ্যহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যান তখন ঔপনিবেশিক ছাঁচে গড়া সেনাবাহিনীরই এক জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সেনা অফিসার মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও পুলিশ বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যরাই প্রথম বিদ্রোহ করেন এবং কৃষক, শ্রমিক, যুবক, ছাত্র, প্রশাসনিক আমলাদের একাংশ এবং জনগণের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয় দেশব্যাপী প্রতিরোধ সংগ্রাম। জনগণের সাথে সৈনিকদের চেতনা, আশা-আকাংখা এক হয়ে মিলে গিয়েছিল বলেই গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। পরবর্তিকালে নয় মাস জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তারা। শ্রেণী বিন্যাসের সব বাধাঁ ভেঙ্গে তারা নিজেদের পরিচয় কায়েম করেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন জনগণের সাথে এক হয়ে গিয়ে যুদ্ধ সংগঠিত করছিলেন তখন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের বেশিরভাগ সদস্য ভারতে পালিয়ে গিয়ে ভারতীয় সরকারের সহায়তায় তথাকথিত মুজিবনগর প্রবাসী সরকার গঠন করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একক নেতৃত্বের দাবিদার হয়ে বসেন। যুদ্ধক্ষেত্রে না যেয়ে অবস্থান নেন কোলকাতার ৫৮নং বালিগঞ্জ, ৮নং থিয়েটার রোড এবং ১৯নং সার্কাস এ্যাভেনিউতে। এভাবেই তারা নিজেদের ভারতীয় চক্রান্তের ক্রীড়ানকে পরিণত করেন। মুক্তিযোদ্ধারা চেয়েছিলেন তাদের আত্মত্যাগ, তিতিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তাদের সংগ্রাম আর তারই ফলে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে পরীক্ষিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব; যারা পরিচালিত করবে মুক্তি সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর তারা গড়ে তুলবেন জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ। কিন্তু ভারতীয় সেনা বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে মুক্তিযুদ্ধ সেই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারেনি। ফলে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন তাদের বদলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে গেল আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে।

যেসব বাঙ্গালী সৈনিকরা ঔপনিবেশিক ধাচেঁ গড়া সেনা বাহিনীর কাঠামো ভেঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের আবার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হল। গড়ে তোলা হল পুরনো ধাচেঁর সশস্ত্র বাহিনী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে। কিন্তু বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেশিরভাগই তখন হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন। এই সচেনতার বিকাশ ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। তাই বিশ্বের অন্যান্য গতানুগতিকভাবে সৃষ্ট সেনা বাহিনীগুলোর ধাঁচে তাদের আবার সংগঠিত করলেও চারিত্রিকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মুক্তিযোদ্ধাদের বৃহৎ অংশই ছিলেন নিঃস্বার্থ অকুতোভয়, দেশপ্রেমিক। কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, স্পষ্ট বক্তা মুক্তিযোদ্ধারা কোন অন্যায়কে মেনে নেননি যুদ্ধের সময় থেকেই। সীমিত গন্ডির ভেতরে থেকেও তারা সব অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন; সুযোগ মত অন্যায়কে প্রতিহত করার চেষ্টাও করেছেন সাধ্যমত। তাই ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণায় এ ধরণের চরিত্রের সেনাবাহিনীকে জাতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ব্যারাকে আবদ্ধ রাখার চিন্তা-ভাবনা ছিল

নেহায়েতই অবাস্তব। সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা সমাজ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতি জনগণের মত তারাও স্বাভাবিকভাবে ছিলেন সদা সচেতন। সেই কারণেই ঔপনিবেশিক ধ্যান ধারণায় সেনা সদস্যদের জাতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ব্যারাকে আবদ্ধ করে রাখার সরকারি প্রচেষ্টা ফলদায়ক হয়নি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে। জনগণ ও সেনা সদস্যদের মাঝে গড়ে উঠা দেশপ্রেমের অটুট বন্ধনের গভীরতা অনুধাবন করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন আওয়ামী-বাকশালী শাসকগোষ্ঠি। সৈনিকদের ব্যারাকে আবদ্ধ করে রাখলেও তাদের সিংহভাগই দেশের রাজনৈতিক গতিধারার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখে চলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কারণেই। শুধু বাইরেই তার প্রকাশ ছিল না। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পুরনো ধাঁচের রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে পশ্চিমা শাসকদের স্থলাভিষিক্ত আওয়ামী লীগ সরকার দেশ শাসন করতে গিয়েও চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত সেনা বাহিনীর মধ্যেও বিক্ষোভ ধুঁমায়িত হয়ে উঠতে থাকে।

বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভাগ্যে জোটে 'বিড়ম্বনা'

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ কখনোই একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে চায়নি। উপরন্তু সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রাখার জন্য তারা সেখানেও 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি প্রবর্তন করে। বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিও ছিল তাদের অবিশ্বাস।

ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে চলে যাবার পর আমাদের তরফ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের জোর দাবি জানানো হয়েছিল সরকারের কাছে। এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সরকারি মহল থেকে জোর প্রচারণা চালানো হয়, "বাংলাদেশের মত শান্তিপ্রিয় দরিদ্র একটি দেশের জন্য সেনাবাহিনীর কি প্রয়োজন? বাংলাদেশের তিন দিক ঘিরে রয়েছে ভারত। বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সাথে রয়েছে মৈত্রী চুক্তি। সেখানে যুদ্ধ হবে কার সাথে? অন্য কোন তৃতীয় শক্তির পক্ষ থেকে আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর কোন হুমকি এলে চুক্তি অনুযায়ী বন্ধুরাষ্ট্রই আমাদের রক্ষা করবে।" কি উদ্ভট যুক্তি!! আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী মিত্র বা শত্রু বলে কিছু নেই। সব সম্পর্কই পরিবর্তনশীল। তাছাড়া জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সুস্পষ্ট জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির অধিনে সম্পদের সংকুলান অনুযায়ী ধাপে ধাপে একটি সুসংগঠিত সামরিক বাহিনী আমাদের গড়ে তুলতে হবে নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই। সেই বাহিনীর দায়িত্ব হবে সমর্থ ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা। অনেক দর কষাকষির পর সরকার অনুমতি দিল সেনা বাহিনী গঠন করার। সিদ্ধান্ত নেয়া হল- মুক্তি বাহিনীর নিয়মিত বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হবে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর এবং যশোর সেনা নিবাসের পাচঁটি ব্রিগেড। এই ব্রিগেডগুলোকে পর্যায়ক্রমে গড়ে তোলা হবে পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন রূপে। একই সাথে নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর অবকাঠামোও গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন দেখা দিল পাকিস্তানে আটক অবস্থায় থাকা ৩০,০০০ বাঙ্গালী সৈনিকদের কি করা হবে। যদিও তারা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তবুও তাদের বেশিরভাগই ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং বাংলাদেশের প্রতি অনুগত এবং সমর্থক। তাই তাদের দেশে ফিরে আসার পর পূর্ণমর্যাদায় নিয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত হবে ফলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বললেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের সেনা বাহিনীতে থাকবে শুধু মুক্তিযোদ্ধারাই। যুদ্ধবন্দীরা দেশে ফিরে এলে সামরিক বাহিনীর বিধান অনুযায়ী তাদের সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে বেসামরিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করা উচিত।" সরকার সিদ্ধান্ত নিল, "পাকিস্তান প্রত্যাগতদের সামরিক বাহিনীতেই নিয়োগ করা হবে।" একই সাথে সরকারি সিদ্ধান্তে বলা হল, "মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের সিনিয়রিটি দেয়া হবে পাকিস্তান প্রত্যাগতদের উপর।" এভাবেই সেনাবাহিনীর মধ্যে সুস্পষ্ট ফাটল সৃষ্টি করল আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের এ সুদূরপ্রসারী চক্রান্তে সমর্থন জানিয়েছিলেন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক উচ্চাভিলাষী এবং সুযোগ সন্ধানী সিনিয়র অফিসার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির প্রয়োগ করে যে চরম সর্বনাশা খেলা শুরু করেছিলেন শেখ মুজিবর রহমান তার খেসারত জাতি এবং সেনাবাহিনীকে চরমভাবে দিতে হয়েছে পরবর্তিকালে।

এছাড়া অন্যায়ভাবে কোন কারণ ছাড়াই মেজর জিয়াউর রহমানকে সুপারসিড করে মেজর শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করে শেখ মুজিব সেনা বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেন। এভাবেই সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে জাতির মেরুদন্ড সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন শেখ মুজিব। সামরিক বাহিনীতে বিভেদ নীতি প্রণয়ন করার সাথে সাথে বিএলএফ পরবর্তিকালে মুজিব বাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় তৈরি করা হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী। সেনা বাহিনী গঠন করার অনুমতি সরকার দিলেও সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার তেমন কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা

সরকারিভাবে নেয়া হয়নি মুজিব আমলে। পক্ষান্তরে রক্ষীবাহিনীকে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ভারতীয় সহযোগিতায়। রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছিল ভারতীয় সেনা বাহিনীর উপর। তাদের পোষাকও ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোষাকের মতো। ভারত সরবরাহ করে তাদের গাড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, রসদপত্র এবং আনুসাঙ্গিক সমস্ত কিছু। এদের অফিসারদের প্রশিক্ষণ হত দেড়াদুনের ভারতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সৈনিকদের ভারতীয় বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ দিত ঢাকার অদূরে সাভারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত রক্ষীবাহিনী। সামরিক অধিনায়ক ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য কর্নেল নূরুজ্জামান। রক্ষীবাহিনী সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। জনসাধারণ ক্রমশঃ রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের যে কাউকে বিনা বিচারে বন্দী এবং হত্যা করার ক্ষমতা প্রদান; অপরাধীদের দেশের প্রচলিত আইনে বিচার না করে গোপনে হত্যা করার প্রচলন এবং আওয়ামী লীগ বিরোধীদের নির্বিচারে অত্যাচার নিপীড়নের ফলে আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের ভাবমুর্তি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া ভারতীয় বাহিনীর অনূরূপ জলপাই রং-এর পোষাক জনগণের মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। তাদের মনে ধারণা জন্মে, প্রয়োজনে মৈত্রী চুক্তির আওতায় আওয়ামী সরকার মতলব হাসিল করার জন্য যে কোন সময় রক্ষীবাহিনীর আবরণে ভারতীয় বাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরেও ডেকে নিয়ে আসতে পারে। উপযুক্ত কোন এক সময় বাংলাদেশ সেনা বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে সরকার রক্ষীবাহিনীকেই সেনাবাহিনী হিসেবে অধিষ্ঠিত করবে; এ ধরণের কথাও শোনা যাচ্ছিল সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ ধরণের বৈরী মনোভাবে এবং অবহেলায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা মনঃক্ষুন্ন হন।

একইভাবে দেশের বেসামরিক প্রশাসনিক অবকাঠামোকে দুর্বল করে তোলার জন্য সেখানেও বিভেদ নীতির প্রবর্তন করা হয়। তাজুদ্দিন সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ভারতীয় আমলাদের সাহায্যে ঢেলে সাজাতে। কিন্তু তার সে প্রচেষ্টা বাঙ্গালী আমলাদের তীব্র বিরোধিতার ফলে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। পরিণামে বাংলাদেশের বেসামরিক আমলারাও মুজিব সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাননি। সেনাবাহিনীর সদস্যদের মত তাদেরও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে মুজিব সরকার। এভাবে জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দেশপ্রেমের যথার্থ মূল্যায়ন না করে তাদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। বেসামরিক প্রশাসনকে সর্ম্পূনরূপে দলীয় নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য আওয়ামী সরকার অভিজ্ঞ আমলাদের বাদ দিয়ে সে সমস্ত পদে দলীয় লোক নিয়োগের এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের দলীয় সমর্থকদের মাঝ থেকে প্রায় ৩০০ তরুণ যুবককে পাঠানো হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফেরার পর তাদের প্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ করা হয়। এদের বলা হয় ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আইএমস) ক্যাডার। এছাড়া পুরো বেসামরিক প্রশাসনের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেন শেখ মুজিবের বোনের জামাই জনাব সাইদ হোসেন। জনাব হোসেন ছিলেন একজন সেকশন অফিসার। রাতারাতি পদোন্নতি দিয়ে প্রশাসন পরিচালনার সব ক্ষমতাই অলিখিতভাবে তার হাতে সঁপে দেন শেখ মুজিব। শেখ মুজিবের সমর্থনপুষ্ট জনাব সাইদ হোসেন সমস্ত বেসমারিক প্রশাসন চালাতে থাকেন অঙ্গুলী হেলনে। ফলে আমলাতন্ত্রের মধ্যেও অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। এটাও ছিল নীল নকশা বাস্তবায়নেরই একটি সূক্ষ্ম চাল।

ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান সুপারসিড (Supersede) হলেন

ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে সুপারসিড করে ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহকে চীফ অব ষ্টাফ বানালেন শেখ মুজিব।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠন পর্বের শুরুতে আমি কুমিল্লাতে পোষ্টেড হই। কর্নেল জিয়াউর রহমান ছিলেন আমাদের প্রথম ব্রিগেড কমান্ডার। কুমিল্লাতে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নতি লাভ করেন। জেনারেল ওসমানী তখনো আমাদের কমান্ডার-ইন-চীফ। তার হেডকোয়টার্স তখন ২৭নং মিন্টু রোডে। অল্প কিছুদিন পর সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। সাধারণ নিয়মে জেনারেল ওসমানীর পর ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকেই আর্মির সিনিয়র মোষ্ট অফিসার হিসেবে চীফ অব আর্মি ষ্টাফ বানানো উচিত ছিল। কিন্তু অত্যান্ত অন্যায়ভাবে জিয়াউর রহমানকে তার ন্যায্য পদ থেকে বঞ্চিত করা হল। স্বাধীনতার ঘোষক হওয়ার ফলেই আওয়ামী লীগ সরকার তার প্রতি এ ধরণের অবমাননাকর আচরণ করে তার জুনিয়র ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহকে আর্মি চীফ অব ষ্টাফ পদে নিযুক্ত করে। অস্বাভাবিক এ পদোন্নতির ফলে শফিউল্লাহ শেখ মুজিব ও তার সরকারের একান্ত বিশ্বস্ত এবং অনুগত তাবেদার হয়ে তাদের খেদমত করতে শুরু করে। আর্মির স্বার্থ ও নিয়ম জলাঞ্জলী দিয়ে শফিউল্লাহ শেখ মুজিব ও তার সরকারের ইচ্ছা ও স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। এর ফলেই মুজিব ভক্ত কয়েকজন অফিসারকে উত্তরোত্তর পদোন্নতি দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণ করা হল নিয়ম বর্হিভূতভাবে। মুজিব সরকারের এ সমস্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আর্মির তরুণ দেশপ্রেমিক অংশ সোচ্চার হয়ে উঠেন।

আর্মিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়

ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে সুপারসিড করে ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহকে চীফ অব ষ্টাফ পদে নিয়োগ করায় আর্মিতে আশংকাজনক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবর রহমান সেটা জানতে পেরে আমায় ডেকে পাঠান; ঘনিষ্টতার সুবাদে তিনি আমাকে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন খবরা-খবর নিতে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ভেতরের খবর জানতে চাইতেন তিনি।

৩২নং ধানমন্ডিতে গিয়েই তার সাথে দেখা করলাম। তিনি জানতে চাইলেন শফিউল্লাহকে সেনা প্রধান বানানোর সিদ্ধান্তের ফলে সেনাবাহিনীতে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে? আমি পরিষ্কারভাবে তাকে জানালাম- তার এ সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীতে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আমি তাকে বলেছিলাম অন্যায়ভাবে ব্রিগেডিয়ার জিয়াকে তার ন্যায্য পদে নিয়োগ না করে শেখ মুজিব অত্যন্ত ভুল করেছেন। কারণ এ সিদ্ধান্তে শুধু যে প্রচন্ড ক্ষোভই সেনাবাহিনীতে সৃষ্টি হয়েছে তা নয়; সরকার এবং সেনাবাহিনীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝিরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সবাই তাকেই একান্তভাবে দায়ী করেছে জিয়াউর রহমানের প্রতি এ অবিচার করার জন্য। ফলে তারই ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে সেনাবাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যদের কাছে। অবিলম্বে এ ভুলের সংশোধন হওয়া উচিত। আমার বক্তব্য শুনে শেখ মুজিব সেদিন বলেছিলেন, কর্নেল ওসমানীর পরামর্শ অনুযায়ীই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি। সিদ্ধান্ত বদলিয়ে এই মূহুর্তে শফিউল্লাহকে সরিয়ে জিয়াউর রহমানকে চীফ বানানো তার জন্য বিব্রতকর হয়ে দাড়াবে। তিনি এ জবাব দিয়েছিলেন তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে। তবে তিনি কথা দিয়েছিলেন কিছুদিন পর জিয়াউর রহমানকে চীফ অব ষ্টাফ বানানোর কথা তিনি পুর্নবিবেচনা করবেন। তার এ বক্তব্য অনেক কারণেই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবুও আমি তার প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যতদিন শফিউল্লাহ চীফ থাকেন ততদিন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে সাধারণ ব্রিগেড কমান্ডার কিংবা চীফ অব ষ্টাফের পিএসও হিসাবে না রেখে উপপ্রধান হিসাবে নিয়োগ করলে সেনাবাহিনীতে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে সেটা অনেকাংশে কমে যাবে। জনাব মুজিব আমাকে কথা দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে তিনি চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন। তিনি আমাকে একইসাথে অনুরোধ করেছিলেন, তার এই অভিমত ব্যক্তিগতভাবে ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে জানাতে এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচার করতে। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবের নির্দেশে আর্মিতে উঈঙঝ (ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ) পদ সৃষ্টি করা হয় এবং মেজর জেনারেল হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে জিয়াউর রহমানকে সে পদে নিয়োগ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, যোগ্য চীফ অব ষ্টাফ হিসাবে জনাব শফিউল্লাহর পদমর্যাদাও ছিল মেজর জেনারেল। আমাদের সবার প্রিয় জেনারেল জিয়াউর রহমানের চীফ অব ষ্টাফ পদে উন্নতির যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন তার বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রইলাম আমরা।

আমি এবং ৩২নং ধানমন্ডি

ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে ৩২নং ধানমন্ডির বাসভবন আমার জন্য ছিল অবারিত দ্বার। যখন ইচ্ছে তখনই আমি সেখানে যেতে পারতাম।

যখনই আমি ৩২নং এ গিয়েছি, সবসময় দেখেছি লোকের ভীড়; সবাই শেখ মুজিবকে ঘিরে রাখছে। কিন্তু কম লোকজনকেই দেখেছি তার সামনে কোন প্রশ্নের সঠিক এবং সত্য জবাব দিতে। বেশিরভাগ লোকই তোষামোদ করে যা বললে তিনি খুশি হন সেটাই বলত। আশ্চর্য হতাম তাদের চাটুকারিতা এবং মোশায়েবীপনায়। দর্শনার্থীরা একথা সেকথার পর সুবিধামত নিজের ব্যক্তিগত কাজটি বাগিয়ে নিয়ে কেটে পড়তেন। এটাই ছিল নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। তিনি আমাকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। মুজিব পরিবারের অন্য সবাইও আমাকে এবং আমার স্ত্রী নিম্মীকে খুবই ভালোবাসতো। পাকিস্তান থেকে ফেরার পর ১৯৭২ সালে আমাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে তিনি স্বপরিবারে উপস্থিত হয়ে আমাদের আর্শীবাদ করেছিলেন। সে অনুষ্ঠানই ছিল তার বাংলাদেশে আসার পর প্রথম কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি। পুরো মন্ত্রী পরিষদও উপস্থিত ছিলেন সে অনুষ্ঠানে। আমি ও আমার পরিবারবর্গ রাজনৈতিকভাবে তার দল ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার নীতিকে সমর্থন না করলেও তাকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। নিজের কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য আমি তার কাছে কখনোই যাইনি। যেতাম সত্যকে তার কাছে তুলে ধরার জন্য। ভাবতাম, সবাই যেখানে চাম্চাগিরী করছে সেখানে সাহস করে সত্যকে তার সামনে তুলে ধরলে তিনি নিশ্চয়ই তা অনুধাবন করতে পারবেন এবং এতে করে তার দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করতে তার সুবিধা হবে। তার রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটবে।
একদিন বেশ রাত করে ধানমন্ডির এক বন্ধুর বাসার পার্টি থেকে ফিরছিলাম আমি ও নিম্মী। মশুলধারে বৃষ্টি পড়ছে। অল্পদূরেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ইন্টারকন ছেড়ে পুরনো গণভবন মানে বর্তমানের সুগন্ধার কাছাকাছি এসেছি; হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে একটি গাড়ি অতি দ্রুতগতিতে আসছে দেখলাম। দূর থেকেই গাড়ির ভিতর থেকে হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিছু উশৃঙ্খল তরুন বেসামাল অবস্থায় হৈ-হুল্লোড় করছিল। গাড়িটিও এগিয়ে আসছিল ঠিক একই অবস্থায় একেবেকে। নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য গাড়ি একটু সাইড করতেই গাড়ি স্কিড় করে গিয়ে জোরে মুখোমুখি ধাক্কা খেল সামনের ল্যাম্পপোষ্টের সাথে। জোরে ধাক্কা লাগায় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। সামনের বনেটটাও দুমড়ে-মুচড়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। গাড়ি কিছুতেই আর স্টার্ট নিচ্ছে না। অন্য গাড়িটি আমাদের অবস্থা দেখে না থেমে আরো দ্রুতবেগে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। বৃষ্টির প্রচন্ডতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। রাত অনেক হয়েছে তার উপর এমন বৃষ্টি তাই রাস্তাও একদম ফাঁকা। ষ্টিয়ারিং এর সাথে মাথা লেগে মাথা ফেটে রক্ত ঝরে পরছে আমার কপাল বেয়ে। নিম্মীর অবশ্য কিছুই হয়নি। আমার রক্ত দেখে ঘাবড়ে গেছে বেচারী। কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ইঞ্জিনটা একটু নেড়েচেড়ে দেখছিলাম যদি কোনমতে গাড়িটা স্টার্ট নেয়। না; কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হঠাৎ সাইরেন বাজিয়ে রাষ্ট্রপতির কাফেলা এগিয়ে আসছে দেখতে পেলাম। আমি তখন অসহায় অবস্থায় দাড়িয়ে আছি গাড়ির পাশে। কাফেলা কাছে আসতেই রাষ্ট্রপতির গাড়ি দাড়িয়ে পড়ল। গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি মুখ বের করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার? কপালের রক্তক্ষরণ দেখে বুঝতে পারলেন গাড়ির এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মুহুর্তে তিনি তার একজন সহযোগীকে নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে গাড়িতে করে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তার হুকুমে আমি ও নিম্মী তার কাফেলারই একটি গাড়িতে করে সিএমএইচ-এ পৌঁছালাম। চিকিৎসার পর তার গাড়িতেই বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরে দেখি বাসার সবাই উৎকন্ঠিত অবস্থায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি বাড়ি ফিরেই মালিবাগে আমাদের দুর্ঘটনার খবরটা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফোনে অবশ্য জানানো হয়েছিল অ্যাকসিডেন্ট

তেমন একটা সিরিয়াস নয়; তাই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আব্বাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলা হয়েছিল দুর্ঘটনাস্থলের কাছ দিয়ে যাবার সময় আমাদের দেখতে পেয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই আমাদের গাড়ি করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেছেন। সবাইকে দুঃশ্চিন্তামুক্ত করার জন্য বলেছিলাম, **"Injury is not serious at all only three stitches that's all. So nothing to worry about and Nimmi is absolutely unhurt."**

এ ঘটনার অবতারনা এখানে এর জন্য করা হল যা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন ব্যক্তি এবং পারিবারিক পর্যায়ে মুজিব পরিবারের সাথে আমাদের কি ধরণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু কোন সম্পর্কই নীতি-আদর্শের উর্ধ্বে নয়। তাই আমিও পারিনি আপোষ করতে। ব্যক্তি মুজিব নয়; গণবিরোধী পুতুল সরকার প্রধান, গণতন্ত্রের হত্যাকারী, বাকশালী স্বৈরশাসনের প্রবর্তক শেখ মুজিবর রহমানের সাথে।

কর্নেল তাহের ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক কমান্ডার

কুমিল্লা ব্রিগেড জনহিতকর কাজে লিপ্ত হয়। আওয়ামী লীগ সেটা অপছন্দ করে। কর্নেল তাহেরকে কমান্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

জিয়াউর রহমানের জায়গায় ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে পোষ্টেড হলেন আমার পূর্ব পরিচিত এবং সুহৃদ কর্নেল তাহের। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা সর্বদাই যোগাযোগ রাখতাম ঘনিষ্ঠভাবে। তরুণ কর্নেল তাহের ছিলেন অসীম সাহসী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনীতে অবকাঠামো গড়ে তোলা ছিল অত্যন্ত দূরূহ কাজ। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় কিছুই নেই তখন। নেই পর্যাপ্ত হাতিয়ার, ইকুইপ্টমেন্ট, পোশাক-পরিচ্ছদ, নেই টুপি, বুট, প্রয়োজনীয় রশদপত্র এবং প্রশিক্ষণের সরঞ্জাম। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে কুমিল্লায় সিদ্ধান্ত নিলাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত ক্যান্টনমেন্টকে বাসপযোগী করে গড়ে তোলার সাথে সাথে আমাদের অপারেশন এরিয়াতে গিয়ে পুর্নঃগঠন কাজে জনগণকে আমরা সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করব। রাস্তাঘাট মেরামত, ব্রিজ কালভার্ট ঠিক করা, বাড়ি-ঘর তৈরির কাজে সাহায্য করা হবে। হেলথ সার্ভিস, ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল কলেজগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি কাজে আমরা স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টায় সাহায্য করব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই আমাদের উদ্ধুদ্ধ করেছিল এ ধরণের উদ্যোগ নিতে। আমাদের এ উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিল জনগণ। এই ধরণের কর্মতৎপরতায় আমরা জনগণের মনে এই ধারণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, শোষণমূলক পাক বাহিনী এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে মূল্যবোধ ও চারিত্রিক ব্যাতিক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী জনগণের সেবায় নিবেদিত প্রাণ এবং দেশপ্রেমিক। জনগণকে শোষণ এবং নির্যাতন করার জন্য এ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা যাবে না।

সেনা বাহিনীর জনপ্রিয়তাই শুধু যে বেড়ে গিয়েছিল আমাদের তৎপরতায় তাই নয়; আমাদের সর্ম্পকে জনগণের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরশীলতা। আমাদের এ ধরণের গঠনমূলক তৎপরতার সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র। আমাদের সাফল্য এবং ইতিবাচক দিকগুলো অন্যান্য ফরমেশনের দেশপ্রেমিক সচেতন অংশের মাঝে অভূতপুর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। যার ফলে অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরাও এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ ধরণের গণমুখী ভূমিকা পালনের জন্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শাসকমহল এমনকি সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিও আতংকিত হয়ে উঠে। জনগণের সাথে সেনাবাহিনীর এ ধরণের সুসম্পর্ক এবং বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে উঠাকে তারা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ জুড়ে তখন ব্যাপক রিলিফ তৎপরতা চলছিল। রিলিফ বিতরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং কেন্দ্রিয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অসাধুতার কারণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনেরা রিলিফ পাচ্ছিলেন না। আমরা আমাদের অধিনস্ত এলাকায় রিলিফ বিতরণের ব্যাপারে সবরকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা ঠিকমত রিলিফ সামগ্রী পান। এতে বিশেষভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের স্বার্থে আঘাত লাগে ফলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে চটে যান। এরই ফলে পার্টি প্রধান শেখ মুজিব জেনারেল শফিউল্লাহর মাধ্যমে এক আদেশ জারি করে আমাদের গণমুখী সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করে দেন। আদেশের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে প্রচার চালানো হয়- সেনাবাহিনী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয়।

কুখ্যাত আত্রাই অপারেশন

শেখ মুজিব তার অনুগত আস্থাভাজন কর্নেল সাফায়াত জামিলকে আত্রাই ও পাবনা অঞ্চলে সরকার বিরোধী আন্দোলন নির্মূল করার জন্য নিয়োগ করেন।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি জনাব ওহিদুর রহমান ও টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা আত্রাই, পাবনা, রাজবাড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় বেশ তৎপর হয়ে উঠে। শেখ মুজিব তাদের দমন করার জন্য তার বিশেষ প্রিয়ভাজন কর্নেল সাফায়াত জামিলকে (তৎকালীন রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার) হুকুম দিলেন তাদের নির্মূল করার জন্য। নেতার ব্যক্তিগত অনুকম্পা লাভের জন্য কর্নেল সাফায়াত জামিল অন্ধের মত আত্রাই অপারেশনে ঝাপিঁয়ে পড়লেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ঐ সমস্ত এলাকা থেকে সমর্থ ছেলে মেয়েদের ধরে এনে কোন রকম তদন্ত এবং বিচার ছাড়াই তাদের মেরে ফেলার এক জঘণ্য খেলায় মেতে উঠলেন তিনি। তার এই অন্যায় তৎপরতার বিরোধিতা করে তারই ব্রিগেড মেজর ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী। সাফায়াত জামিলকে ষ্টাফ অফিসার হিসাবে নূর বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, শেখ সাহেবের প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য থাকলেও এভাবে ব্যক্তি স্বার্থে নিষ্ঠুরের মত ছেলে মেয়েদের মেরে ফেলা অন্যায় এবং অযৌক্তিক। এ ধরণের পাশবিকতার জন্য নিজের বিবেকের কাছেই তিনি একদিন দায়ী হয়ে পড়বেন। অযুক্তিক এই হত্যাযজ্ঞের ভাগীদার হওয়া ক্যাপ্টেন নূরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্যাপ্টেন নূরের এ পরামর্শ সেদিন কর্নেল সাফায়াত জামিল গ্রহণ করেননি। ফলে ক্যাপ্টেন নূর বাধ্য হয়ে নিজের উদ্যোগেই হেডকোয়াটার্সে পোষ্টিং নিয়ে ঢাকায় চলে আসে। আত্রাই অপারেশনের সাফল্যের জন্য শেখ মুজিব পুরষ্কার স্বরূপ কর্নেল সাফায়াতকে পরে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেন। সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের বদলি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের অনুগত রাখার নীতি গ্রহণ করে মুজিব সরকার। এমনকি কৃতি ও জনপ্রিয় অনেক সামরিক অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এবং বিদেশের দূতাবাসে নিয়োগ করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল আওয়ামী সরকার।

সেনা পরিষদ

সেনা বাহিনীর কিছু সমমনা সদস্য সেনা পরিষদ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত সব অফিসারদের ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসন করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানের বিশেষ আস্থাভাজন এ সমস্ত অফিসারদের একটি অংশ শেখ সাহেবের চোখ ও কান হিসাবে সেনাবাহিনীর উপর নজর রাখছিল। প্রভাবশালী এই মহলটির করুণা পেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ এগিয়ে নেবার জন্য তাদের দালালি করতে তখন অনেকেই নীতি বিসর্জন দিয়ে তাদের এজেন্ট হয়ে যান। এদের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সব খবরা-খবর শেখ মুজিবের কান অব্দি পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল।

সেই সময় এদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা কিছু তরুণ অফিসার উদ্যোগ নেই ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে সচেতন দেশপ্রেমিক ও সমমনা ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি অঘোষিত সংগঠন গড়ে তোলার। প্রতিষ্ঠিত হয় সেনা পরিষদ। সেনা পরিষদ সরকারের প্রতিটি নীতিও পদক্ষেপ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকত। প্রতিটি পদক্ষেপ এবং ইস্যুর চুলচেরা বিশ্লেষন করে জাতীয় পরিসরে এবং সামরিক বাহিনীর উপর এসমস্ত নীতি পদক্ষেপের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া কি হবে অথবা হতে পারে সে বিষয়ে অধিনস্ত সৈনিকদের বুঝিয়ে বলা হত সেনা পরিষদের তরফ থেকে। সৈনিকদের সচেতনতার মান বাড়িয়ে তোলার জন্যই এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম আমরা। সরকারি নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে দৃষ্টি রাখা ছাড়া দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করত সেনা পরিষদ। কি হচ্ছে, কি হওয়া উচিত, কি উচিত নয় বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করা হত সেনা পরিষদের ষ্টাডি সার্কেলগুলোতে। সবকিছুই করা হত অতি সর্তকতার সাথে, গোপনে। বেসামরিক আমলা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি মহলের দেশপ্রেমিক সচেতন সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন সূত্রে যোগাযোগ রক্ষা করে মত বিনিময় করতেন সেনা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরা। এমনকি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরের অনেকের সাথেও যোগাযোগ ছিল সেনা পরিষদের। আন্তরিকভাবে নিয়মিতভাবে খবরা-খবর আদান-প্রদান এবং খোলামেলা মত বিনিময়ের ফলে ক্ষেত্র বিশেষে অনেকের সাথে সেনা পরিষদের সদস্যদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে। সেনাবাহিনীর সদস্য হওয়া সত্বেও সেনা পরিষদের সদস্যরা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। অনেকের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও গড়ে উঠে। আলোচনাকালে অনেকেই মত পোষণ করেন- জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জনগণকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে বাচাঁবার সংগ্রামে সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশকে অগ্রণী হয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব নিতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

তাদের এ ধরণের বক্তব্যের জবাবে সেনা পরিষদের তরফ থেকে বলা হত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য কিছু করণীয় থাকলে সে দায়িত্ব যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে পালন করতে প্রস্তুত রয়েছে সেনা পরিষদ তবে সেনা পরিষদের যে কোন ভূমিকাই হবে সহায়ক শক্তি হিসেবে সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে; নিজেদের ক্ষমতা দখলের জন্য নয়। তৃতীয় বিশ্বে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা কিংবা সামাজিক অস্থিরতার সুযোগে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে কোন দেশেই গণতান্ত্রিক সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি; প্রতিষ্ঠিত হয়নি মানবিক অধিকার। একমাত্র সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব সার্বিক আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জন আর এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের। এটাই ছিল সেনা পরিষদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এ সম্পর্কে মেজর রফিক পিএসসি তার বই 'বাংলাদেশ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট' এ লিখেছেন, ''সমসাময়িক ইতিহাসে কম্বোডিয়া, গণচীন, কিউবা, ভিয়েতনাম তথা সর্বত্রই মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন হবার পর ক্ষমতা দখল করেছে। শুধু বাংলাদেশেই ঘটেছে এর ব্যতিক্রম। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর অস্ত্র সমর্পন করেছে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে; দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী অফিসার-সৈনিকেরা স্বাভাবিকভাবেই দেশের দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতি দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকরা সরকার পরিচালনার মত একটি দূরহ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। মেজর ডালিম, মেজর পাশা, মেজর বজলুল হুদা, মেজর শাহরিয়ার তখন কুমিল্লা সেনানিবাসে চাকুরিরত ছিলেন। এরা প্রায়ই অবসর সময়ে মিলিত হতেন এবং দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আওয়ামী লীগের দুর্নীতিবাজ লোকদের নিয়ে সরকার পরিচালনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সর্ম্পকে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। এভাবে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭২ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্নেল তাহের ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্নেল জিয়াউদ্দিন প্রতি সপ্তাহে ষ্টাডি পিরিয়ডের নামে অফিসারদের সমবেত করে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে তরুণ অফিসারদের সঙ্গে সমালোচনায় লিপ্ত হতেন।''

কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ সাপ্তাহিক হলিডেতে ছাপিয়ে পদত্যাগ করেন। কর্নেল তাহেরকেও পদত্যাগে বাধ্য করা হয়।

"এ্যান্টি স্মাগলিং" এবং "অপারেশন ফুড" থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয় সেনা সদস্যদের মাঝে। সবাই এই সিদ্ধান্তে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন।

এই পরিস্থিতিতে কর্নেল জিয়াউদ্দিন (ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার) অভিমত প্রকাশ করেন, "বর্তমান সরকারের অধিনে সামরিক বাহিনীতে থেকে জনগণের স্বার্থে কাজ করা সম্ভব নয়। সরাসরিভাবে সরকারের বিরোধিতা করাও সম্ভব নয়। তাই সরকারি অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের মাঝ থেকেই গড়ে তুলতে হবে দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম।" তার অভিব্যক্তিতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেলাম। তিনি সক্রিয় রাজনীতির কথা ভাবছেন। তার অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেনা পরিষদের মনোভাব ছিল তার বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিসম্পন্ন। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বিজয়ের চুড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নেয়া সম্ভব জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে গতিশীলতা সৃষ্টি করেই। মূলতঃ এ দায়িত্ব পালনের ভার দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী দল ও নেতৃত্বের উপর। তবে আমরাও সেনাবাহিনীর ভেতরে অবস্থান করেও জনগণের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারব যদি নিজেদের সংগঠিত করতে পারি।

১৯৭২ সালের গ্রীষ্মকালে সাপ্তাহিক হলিডে-তে কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এ নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি সরাসরি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। তিনি তার নিবন্ধে লেখেন, **"Independence has become an agony for the people of this country. Stand on the street and you see purposeless, spiritless, lifeless faces going through the mechanics of life. Generally, after a liberation war, the new spirit carries through and the country builds itself out of nothing. In Bangladesh, the story is simply other way round. The whole of Bangladesh is either begging or singing sad songs or shouting without awareness. The hungry and poor are totally lost. The country is on the verge of falling into the abyss."**

নির্ভিক এই মুক্তিযোদ্ধা এই নিবন্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পচিঁশ বছরের গোপন চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, **"We fought without him and won. If need be we will fight again without him."**

শেখ মুজিবর রহমান সে সময় লন্ডনে গলব্লাডার অপারেশনের পর সুইজ্যারল্যান্ডের এক স্বাস্থ্যনিবাসে অবস্থান করছিলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে জানতে পেরে তড়িঘড়ি করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কষ্টের এবং ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করতে আবার প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে দ্বিধাবোধ করবেন না তারা। তার এই লেখা থেকে দেশবাসী প্রথম পরিষ্কারভাবে জানতে পারেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। প্রমাদ গুনলেন আর্মি চীফ শফিউল্লাহ। তিনি জিয়াউদ্দিনকে হাতেপায়ে ধরে অনেক মিনতি করেছিলেন যেন শেখ সাহেব ফিরে এলে ছাপানো নিবন্ধের জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। কারণ শফিউল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ করে তরুণ ও ছাত্রসমাজ এবং সেনাবাহিনীতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীতে কোন প্রকার বিষ্ফোরন যাতে না ঘটে তার জন্যই মিনতি জানিয়েছিলেন তিনি। শেখ মুজিব দেশে ফিরে বিষ্ফোরন্মুখ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্দি করতে পেরে জেনারেল শফিউল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন কি করে

অবস্থার সামাল দেয়া যায়? শফিউল্লাহ শেখ সাহেবকে জানালেন, নিবন্ধ ছাপানোর পর কর্নেল জিয়াউদ্দিনের ভাবমুর্তি তরুণ অফিসার এবং জোয়ানদের মধ্যে আরো বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কর্নেল জিয়াউদ্দিনের প্রতি কোন কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হলে আর্মির মধ্যে আকস্মিক বিষ্ফোরন ঘটে যেতে পারে। শেখ মুজিব তার মোড়লী বুদ্ধি দিয়ে ঠিক করলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে ডেকে কিছু বকাবকি করে তাকে দিয়ে কৌশলে মাফ চাইয়ে নেবেন। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলা হল জেনারেল সফিউল্লাহকে। গণভবনে জিয়াউদ্দিনকে নিয়ে এলেন শফিউল্লাহ। প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে স্যালুট করে দাড়াতেই গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব, ‘‘তুমি কোন সাহসে এ ধরণের নিবন্ধ ছাপালে? জানো, তোমার অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান? সামরিক বাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় এ ধরণের লেখা ছাপানো বেআইনী। আমি তোমাকে এ ধরণের গুরুতর অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তোমার বিশেষ অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের মত তোমাকে আমি মাফ করব যদি তুমি শফিউল্লাহকে লিখিতভাবে দাও যে, তুমি অন্যায় করেছ।’’ একনাগাড়ে বলে গেলেন শেখ মুজিব। সবকিছুই চুপ করে শুনলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিন।

তিনি জবাব দিলেন, ‘‘শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী। আপনার দয়া-দাক্ষিণ্য আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি যা লিখেছি সেটা আমার বিশ্বাস। অতএব, ক্ষমা চাওয়ার কিংবা ক্ষমা পাওয়ার কোন অবকাশ নেই এখানে। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, চাকুরীতে থাকাকালীন অবস্থায় এ ধরণের লেখা ছাপানো অন্যায়। তাই আমি আমার কমিশনে ইস্তফা দিয়েই আমার নিবন্ধ ছেপেছি।’’ এভাবেই সেদিন শার্দুল সন্তান কর্নেল জিয়াউদ্দিন শেখ মুজিবকে স্তম্ভিত করে দিয়ে গণভবন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার বেরিয়ে আসার পর শফিউল্লাহকে শেখ মুজিব অনুরোধ করেছিলেন জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার জন্য। হেডকোয়াটার্সে ফিরে এসে জেনারেল শফিউল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রমুখ অনেকেই কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। জিয়াউদ্দিন তাদের চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন তার শাণিত জবাব দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, নিজের আত্মার সাথে বেঈমানী করতে পারবেন না সামান্য চাকুরীর লোভে। তাছাড়া তাদের মত মেরুদন্ডহীন কমান্ডারদের অধিনে একই সংগঠনে তাদের অধিনস্ত হয়ে চাকুরী করে তিনি তার আত্মসম্মান খোয়াতে রাজি নন। এভাবেই সেনাবাহিনীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি পরে সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর অন্যায়ভাবে কর্নেল তাহেরকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে ড্রেজার অর্গানাইজেশনের পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। এই নতুন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কর্নেল তাহের জাসদের সশস্ত্র গোপন সংগঠন ‘গণবাহিনী’ গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী থেকে তাকে বের করে দেবার পরও আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি কখনো। আমরা আমাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে একই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে থাকি। লক্ষ্য একটাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন। গণতান্ত্রিক সুষম সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী এবং মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করা। আমাদের মাঝে আদর্শগত বন্ধন এত সুদৃঢ় ছিল যে, আমরা বিশ্বাস করতাম জাতীয় মুক্তির বৃহৎ স্বার্থে যেকোন ক্রান্তিলগ্নে আমরা সবাই এক হয়ে লড়তে পারব নির্দ্বিধায়।

অসাংবিধানিক গোপন রাজনীতি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠে

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলোকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বাধ্য করে ফলে গোপন রাজনীতি একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠে।

১৯৭৩ সালে জাতীয় নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হল আওয়ামী লীগ। কিন্তু দেশের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। সার্বিক অবস্থার অবনতির গতি দ্রুততর হল মাত্র। মরিয়া হয়ে উঠলেন সরকার; রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার প্রচেষ্টায়। সরকারি দলের লক্ষ্যহীনতা ও নৈরাজ্যিক কার্যকলাপের মুখে বাংলাদেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করে বিরোধী দলগুলি এবং সামগ্রিকভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি নিক্ষিপ্ত হল এক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি শাসিত যে কোন দেশেই কোন বিশেষ একটি দল দেশের শাসনতন্ত্রকে দলীয় সম্পদ মনে করে না। সেখানে শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুগত দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল থাকে। ক্ষমতার হাত বদল হয় সে সমস্ত দলগুলোর মধ্যেই। জাতীয় স্বার্থের মৌলিক বিষয়ের প্রশ্নে তারা একে অপরের সহযোগিতা করে থাকে। এই সহযোগিতার ভিত্তিতেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে যেখানে সরকার নিজের স্বার্থের সাথে রাষ্ট্রের স্বার্থকে এক করে দেখেছে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশ মোটেই সম্ভব নয়। বিরোধী দলগুলো অনৈক্য এবং অন্যান্য কারণে আওয়ামী লীগের বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। তাদের উপর নিষ্পেষন চালিয়ে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে সেখানে বিরোধী দলগুলো ভবিষ্যতে কখনো পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগকেও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। যেভাবে সরকারি দল আইনের শাসনের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সব নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে উঠে-পড়ে লেগেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতেই দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বৈরাচার। স্বৈরাচার যখন খোলা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশের সব দরজা বন্ধ করে দেয় তখনই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে উঠে রাজনৈতিক গোপন তৎপরতা। রাজনীতিতে বেজে উঠে অস্ত্রের ঝনঝনানি। রাজনৈতিক বিরোধিতা রূপ নেয় সশস্ত্র সংগ্রামের।

১৯৭৩ সালের ১১ই নভেম্বর বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের ভাষণই এর বড় প্রমাণ। তিনি ঐ ভাষণে বলেন, "যারা রাতের বেলায় গোপনে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তাদের সঙ্গে ডাকাতদের কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করতে পারে তাহলে আমাদেরও তাদের গুলি করে হত্যা করার অধিকার আছে।" (বঙ্গবার্তা ১২ই নভেম্বর ১৯৭৩) ইতিহাসের লিখন যে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অস্ত্রের জোরে বিরোধীদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেছেন তার পতনও ঘটেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্ত্রের মুখেই।

ঐ একই দিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মাওলানা ভাসানী রাজশাহীর এক জনসভায় বলেন, "সরকার যেভাবে বিরোধী দলীয় কর্মী হত্যা করা শুরু করেছে তার ফলে এ দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ বন্ধ হতে চলেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে কোন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। দমন নীতি এবং মানুষকে হত্যা করে দেশ শাসন করা যায় না। আইয়ূব খান-ইয়াহিয়া খানের পতন হয়েছে অতীতে; এ ধরণের দমন নীতি চলতে থাকলে এ সরকারের পতনও অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এবং বিরোধী দল ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক সরকার বেচে থাকতে পারে না।" (১২ই নভেম্বর ১৯৭৩) রাজনৈতিক কর্মী নিধনের ব্যাপারে জাসদের বক্তব্য ছিল একই রকম। সরকার এবং বিরোধী পক্ষের বক্তব্য থেকে যে জিনিষটা স্পষ্ট হয় তাহল আজকের বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পরিবেশ আছে

সেটা কেউই স্বীকার করছেন না। উভয় পক্ষই একমত যে, দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অসি'রতা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে।

বাংলাদেশের শান্তি-শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে রক্ষা ও পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের দু'টি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। প্রথমত: তিনি বিরোধী দলীয় কর্মীদের 'ডাকাত' বলে অভিহিত করছেন। দ্বিতীয়ত: সে সমস্ত ডাকাতদের গুলি করে হত্যা করার অধিকারও তার রয়েছে বলে দাবি করছেন। বিরোধী কর্মীদের চোর, ডাকাত, দেশদ্রোহী, ক্রিমিনাল আখ্যা দেয়ার রেওয়াজ সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৫০ সালে নূরুল আমিন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে 'ডাকাত দলের সরদার' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। রাজশাহীর 'ছাপড়া-ওয়ার্ডে' নাচোল বিদ্রোহের রাজবন্দীদের গুলি করে মারা এবং ইলা মিত্রকে পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণকেও সরকার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে দাবি করেছিলেন। ১৯৭০ সালে যখন রাজবন্দীদের মুক্তির জোর দাবি উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানে তখন স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া খানও পূর্ব পাকিস্তানের সব রাজনীতিবিদদের 'ক্রিমিনাল' আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তাদের মুক্তির দাবি নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছিল নূরুল আমীন এবং ইয়াহিয়া খানের দোসররাই ছিল প্রকৃত ক্রিমিনাল। বিরোধী পক্ষকে চোর, ডাকাত ইত্যাদি বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টার ফল কি দাড়ায় সেটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অজানা থাকার কথা নয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে প্রচুর। কিন্তু দীর্ঘদিনের সেই শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমানের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে চোর-ডাকাত আখ্যা দিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ যে সুগম করছেন না সেটা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে দেশে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি বিরাজমান সে অবস্থায় সরকার এবং বিরোধী দলসমূহ যে দাবি করছে তাতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অবক্ষয় অবধারিত।

সেনাবাহিনীকে “এ্যান্টি স্মাগলিং অপারেশন” এর জন্য তলব করা হয়

১৯৭৩ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে চরম দুর্নীতি এবং ব্যাপক চোরাচালানের ফলে রিলিফ অপারেশনে বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে সরকার অবস্থা সামাল দিতে সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যে তলব করতে বাধ্য হয়।

সেনাবাহিনীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এবং সদস্যরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চোরাচালান বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের আন্তরিকতা অল্পসময়ের মধ্যেই জনগণের মনে আশার সঞ্চার করে। এই অপারেশনের নাম ছিল ‘অ্যান্টি স্ম্যাগলিং অপারেশন’। আমরা সমমনা সবাই সিদ্ধান্ত নেই যদিও তখনো আমরা সুগঠিত নই তবুও যেকোন ত্যাগের বিনিময়েই আমাদের দায়িত্ব পালন করে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাব। এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। এই অপারেশন করার সময়ই তরুণ অফিসার এবং সৈনিকগণ ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ও টাউট বাটপারদের অসৎ চরিত্র এবং সম্পদ গড়ে তোলার লোভ-লালসার অভিলাষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সমর্থ হন। রাজনৈতিক নেতাও টাউটদের সঙ্গে তারা মুখোমুখি দ্বন্দ্বে আসার সুযোগ পান। আমরা অপারেশন কমান্ডার হিসাবে প্রতিজ্ঞা করি পেটের ক্ষুধার তাড়নায় যে ট্রাক ড্রাইভার কিংবা পোর্টার বোঝা বয়ে চোরাচালানের সামগ্রী বর্ডারের ওপারে নিয়ে যাচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের ধরেই ক্ষান্ত হব না, আমাদের প্রচেষ্টা হবে চোরাচালানের মূল ব্যক্তিদের জনসম্মুখে প্রকাশ করা। ক্ষমতাবলয়ের ঐ সমস্ত অসাধু রুই-কাতলাদের উন্মোচন করা; যারা পর্দার অন্তরালে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাতীয় সম্পদের চোরাচালানের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে জনগণের লাশের উপরে। অল্প সময়েই জানা গেল সব সীমান্তে চোরাচালানের মূলে রয়েছে ভারতের একটি প্রভাবশালী মারোয়াড়ী গোষ্ঠি এবং সরকারি দলের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী ও নেতারা। শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, স্বরাষ্টমন্ত্রী মনসুর আলী তদীয় পুত্র নাসিম, বন ও মৎস্য মন্ত্রী সেরনিয়াবাত তদীয় পুত্র হাসনাত। গাজী গোলাম মোস্তফা সরাসরিভাবে ঐ মারোয়াড়ী চক্রের সাথে জড়িত বলেও তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রে এবং সরেজমিনে তদন্তের ফলে। সব ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে আমরা তাদের চরিত্র এবং দুঃষ্কর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরতে থাকি জনগণের কাছে। অফিসার এবং সৈনিকরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এবং নেতারাই হচ্ছে দেশের দুর্গতির মূল উৎস। তাদেরই যোগসাজসে লুটেরারা দেশ ও জাতিকে দেউলিয়া করে তুলছে। সেনা পরিষদের প্রচারণা এবং সরকার সম্পর্কে সংগঠনের মূল্যায়নের সত্যতা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করার সুযোগ পান সেনা সদস্যরা। তারা বুঝতে পারেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই চাকুরী ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেনা পরিষদের নেতৃত্ব এবং সদস্যরা তাদের সচেতনতা বাড়াবার জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়েই সবকিছু করছিলেন। এর ফলে সেনা পরিষদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিল। এভাবেই সেনাবাহিনীতে সেনা পরিষদের ভাবমুর্তি এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অ্যান্টি স্ম্যাগলিং অপারেশন সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। এ থেকেই তৎকালীন সরকারের চরিত্র সর্ম্পকে তারা ধারণা করতে পারবেন। দিনাজপুরের অপারেশন কমান্ডার একদিন ঢাকায় কন্ট্রোল রুমে খবর পাঠাল, চারজন মারোয়াড়ী স্ম্যাগলার আর্মির ভয়ে ঢাকায় গিয়ে জনাব মনসুর আলীর ছেলে নাসিমের সাহচর্যে তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মগোপন করে আছে। ঢাকায় সিদ্ধান্ত নেয়া হল, জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করে মারোয়াড়ীদের গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু আর্মি হেডকোয়াটার্সের হস্তক্ষেপে ঢাকার এরিয়া কমান্ডার জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত বাদ দিতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চাপের মুখেই আর্মি হেডকোয়াটার্স থেকে এ ধরণের হস্তক্ষেপ হয়েছিল। ঐ ঘটনার পর সরকার আর্মির তৎপরতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। অপারেশনের ফলে একদিকে সেনাবাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে সরকার ও তার দলের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ায় ক্ষমতাসীনরা

বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই অবস্থায় কি করা উচিত সেটা ভেবে উভয় সংকটে পড়ল সরকার ও সরকারি দল। এই অবস্থাতেও দাতাগোষ্ঠির চাপে সরকার বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিল খাদ্যসামগ্রী দেশের সকল অঞ্চলে সময়মত পৌঁছে দেবার। সেনাবাহিনী শুরু করল 'অপারেশন ফুড'। এই অপারেশনেও অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে সেনাবাহিনী তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমে। এই অপারেশন আর্মির হাতে দেয়ায় ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয় সরকারি দলের মাঝে। কারণ তাদের স্বাথ বিঘ্নিত হচ্ছিল প্রতিক্ষেত্রে। সব পর্যায়ে দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী এই সমস্ত অপারেশন বন্ধের জন্য প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হল প্রধানমন্ত্রীর উপর। তিনি দলীয় স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। এতে জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনী বাধ্য হয়ে ব্যারাকে ফিরে আসে। সরকার প্রধানের এ ধরণের পক্ষপাতিত্বের ফলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়েন।

আওয়ামী দু:শাসন এবং দুর্নীতির মুখোমুখি সামরিক বাহিনী

অবাধ চোরাচালান এবং চরম দুর্নীতির ফলেই ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ হয়

১৯৭২ সালের যে কোন খবরের কাগজ খুললে দেখা যাবে প্রায় সব খবরই হচ্ছে খুন, রাহাজানি এবং ছিনতাই সংক্রান্ত।

১৯৭২ সালের যে কোন জাতীয় সংবাদপত্র খুললে প্রথমেই চোখে পড়বে খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানী, আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির খবর। প্রতিদিন দেশের শহরগুলোতে ঘটছিল প্রকাশ্য খুন, ডাকাতি ও রাহাজানীর ঘটনা। গ্রামে-গঞ্জেও চলছিল ত্রাসের রাজত্ব। ক্রমবর্ধমান এ ত্রাসের নাগপাশে জনগণ এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কাল অতিবাহিত করছিল। যখন জনগণের পরনে কাপড় নেই তখনই ঘটেছিল সুতা নিয়ে কেলেংকারী। পেটে যখন ভাত নেই তখন লাখ লাখ টন বিদেশী সাহায্যে প্রাপ্ত খাদ্য নির্বিবাদে পাচাঁর হয়ে গিয়েছিল সীমান্তের ওপারে।

মজলুম নেতা ভাসানী অবাধে চোরাচালানের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তিনি আওয়াজ তোলেন সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারনবাদের বিরুদ্ধে। জবাবে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে চীন ও পাকিস্তানের দালাল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে ১৯৬৮-১৯৬৯ এর সাড়া জাগানো আন্দোলনকালে বরফের উপর আঘাত করেছিলেন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তার নাম মাওলানা ভাসানী। মাওলানার সার্বজনীন আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই ছাত্ররা দিলেন ১১ দফা। তারই নির্দেশে ন্যাপ তার নিজস্ব ১৪ দফা বাদ দিয়ে ১১ দফাকেই তাদের দাবি হিসাবে গ্রহণ করে। ঊনসত্তোরের কারাবন্দী মুজিবর রহমানকে মুক্ত করার দুর্বার গণ আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন এই মাওলানা ভাসানীই। ১৬ই ফেব্রুয়ারী পল্টনের বিশাল জনসভায় তিনি বজ্রকন্ঠে হুশিঁয়ারী উচ্চারণ করেন, "প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মত জেলখানা ভেঙ্গে মুজিবকে বের করে আনব।" তার মতো একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ রাজনৈতিক উদারপন্থী নেতাকে সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা বলে গালাগালি দিতেও কুন্ঠাবোধ করেনি শাসক দল। এই গালাগাল পর্ব শুরু করেন তরুণ নেতারা। পরে প্রবীণরাও ক্রমে তাদের সাথে যোগদান করেন। মার্চের শুরু থেকেই খবর আসতে থাকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে- মানুষ মরছে অনাহারে, না খেয়ে। বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইলে বিরাজ করছে দুর্ভিক্ষ অবস্থা। আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের হতে থাকে স্থানে স্থানে। এ অবস্থায় ভারতীয় দূতাবাসের মুখপাত্রও স্বীকার করেন যে, চোরাচালান হচ্ছে ব্যাপক হারে। তারা বলেন, "সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি হয়ে গেলেই এই চোরাচালান বন্ধ হবে।" এ বক্তব্য দূতাবাস থেকে দেয়া হয় ২৩-৩-১৯৭২ তারিখে। দুর্নীতি ছড়িয়ে পরে দেশের সব জায়গায়, সর্বস্তরে।

১৯৭২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব তার সংসদ সদস্যদের প্রতি এক নির্দেশ জারি করে বলেন, "চাকুরি, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না। প্রশাসনকে চলতে দিন।" ১১ই মার্চ দৈনিক বাংলায় এক খবর বের হয় সিগারেটের পারমিট নিয়ে, "বাংলাদেশ ট্যোবাকো কোম্পানীর ২৫জন ডিষ্ট্রিবিউটর নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ তিন হাজার সুপারিশপত্র পেয়েছেন। সুপারিশকারীরা প্রত্যেকেই এমন প্রভাবশালী যে, কোম্পানী কাকে ছেড়ে কাকে ডিলারশীপ দেবেন সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারছেন না।" ৬ই জুন চোরাচালানের স্বর্গ সিলেট থেকে দৈনিক বাংলার প্রতিনিধি খবর পাঠান যে, গ্রেফতারকৃত চোরাচালানীরা প্রভাবশালী ক্ষমতাসীন নেতাদের চাপে ছাড়া পাচ্ছে। একইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য নেমে আসে

সরকারের পারমিটবাজী নীতির সূচনায়। সুতার পারমিট যে পাচ্ছে তার তাঁত নেই, কেরসিনের পারমিট যে পেল সে কোন ডিলার নয়। পারমিট দেয়া হল অব্যবসায়ী রাজনৈতিক টাউটবাজদের খুশি করার জন্য। ফলে র্দুভোগ গিয়ে বর্তাল জনগণের উপর। পারমিট হাত বদল প্রথায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল কয়েকগুন। কাপড়ের অভাবে মা-বোনেরা দিনের বেলায় ঘর থেকে বেরুতে পারতেন না। মেয়ে-মা একখানি কাপড় গোসল করে পালা বদলিয়ে পরছে। এ সমস্ত খবরও প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক পত্রিকায়। ঠিক সেই সময় সরকার টিসিবি'র মাধ্যমে ভারত থেকে আনল 'সুন্দরী শাড়ী'। যে শাড়ীতে হাঁটু ঢাকে না, পর্দাও হয় না। ভারতীয় দূতাবাস বলল টিসিবি দেখেই এনেছে এই শাড়ী। টিসিবি কোন জবাব দিতে পারল না।

আগষ্ট মাসে দেশে বন্যা শুরু হয়। আসে বিস্তর রিলিফ। রিলিফ নিয়ে লুটপাটের কাহিনী পাওয়া যাবে ১৯৭৪ সালের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসের সংবাদপত্রসমূহে। অবাধ লুটপাট চলে বাশঁ, টিন, খাদ্যসামগ্রী, রিলিফের ঔষধপত্র এবং কম্বল নিয়ে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে ছাপা হয় ক্ষুধাতুর মানুষের ছবি। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, মাথা গোজাঁর ঠাই নেই। কোটি কোটি লোক হয় ক্ষতিগ্রস্ত ও বাস্তুহারা। ৩রা আগষ্ট ইত্তেফাকে ছাপা হয় এসব ছবি। দৈনিক বাংলায় খবর বের হয়, বমি খাচ্ছে মানুষ। বাংলাদেশ রেডক্রস সর্ম্পকে প্রকাশিত হয় চুরি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অসংখ্য অভিযোগ। গ্রামে-গঞ্জে রেডক্রস প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফার নামে ছড়া বের হয়। আতাউর রহমান খান রেডক্রসের অসাধু তৎপরতার প্রতিবাদ করেন। দুর্নীতির অভিযোগ করেন। ১০ই আগষ্টের ইত্তেফাকে সে বিবৃতি ছাপা হয়। ১৩ তারিখ সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যায় যে, সারাদেশের মানুষ কচু-ঘেচু খেয়ে জীবনধারণ করছে। আতাউর রহমান খান অভিযোগ করেন যে, বিরোধী দলীয় সদস্যদের ত্রান সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টায় পুলিশ বাধা দিচ্ছে। তাদের গ্রেফতার করছে। জনাব খান ১১ই আগষ্ট কাগজে বিবৃতি দেন যে, দুনিয়ায় এমন কোন নজির নেই যে রেডক্রস সমিতির চেয়ারম্যান কোন দলীয় লোক হয়। তিনি একজন বিচারপতি অথবা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে এ সমিতির দায়িত্ব দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

গ্রাম থেকে, উপদ্রুত এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ শহরে আসতে থাকে। ঢাকা শহরে ১৩৫টি রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ১২ই আগষ্ট যাত্রাবাড়ির রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণকারীরা বলেন যে, তিনদিনে তাদের জন্য একমুঠো খাবারও বরাদ্দ করা হয়নি। ১৬ই আগষ্ট আইসিআরসির সদস্য মিঃ এলভিন কাজ পরিদর্শনের জন্য আদমজী রিলিফ ক্যাম্পে গেলে লোকেরা কমিটির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে চুরি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করে। এলভিন চলে এলে কমিটির চেয়ারম্যান তার গুন্ডা বাহিনী দ্বারা অভিযোগকারীদের উপর হামলা চালায়। এতে ছুরিকাহত দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খাওয়ার অনুপযুক্ত পচাঁ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। তা থেকে ক্যাম্পগুলোতে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেয়। মরতে থাকে মানুষ।

মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে। সে সময়কার পত্রিকার পাতা উল্টালে গা শিউরে উঠে। মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ কেড়ে নেয় লাখ লাখ মানুষের প্রাণ। হাজার হাজার চাষী যারা একদা কষে ধরতো লাঙ্গল, মাঠ ভরে তুলত সবুজ শস্যের সমারোহে, তারা ভিক্ষার জন্য শহরের মানুষের কাছে হাত পাতে। ফিরে যায় ভিক্ষা না পেয়ে। তারপর বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকে। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম প্রতিদিন ঢাকা শহর থেকেই তিরিশ থেকে চল্লিশটি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করছিল। সে কাহিনী ও ছবি আছে সেই সময়কার দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর পাতায় পাতায়। ঢাকায় প্রতি ঘন্টায় ৩-৪ জন লোক মারা যেতে থাকে অনাহারে। এর এক পর্যায়ে আঞ্জুমানের লাশ দাফনের কথা খবরের কাগজে প্রকাশ করা বন্ধ করে দেয়া হয় সরকারি আদেশে। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর মাস অব্দি প্রতিটি জেলা থেকে খবর আসতে থাকে যে, শত শত লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। ভাত নেই, কাপড় নেই, বাসস্থান নেই। ১০ই সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক ছবি ছাপে- মাছ ধরার জাল পরে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে গ্রামের কোন কুল বধু। চট পরে ভিক্ষার

আশায় সন্তান কোলে ঘুরে ফিরছে অসহায় জননী। গৃহবধুরা ক্ষুধার জ্বালায় হচ্ছে প্রমোদবালা। রিলিফের কেলেঙ্কারীর খবর ছাপা হচ্ছিল খবরের কাগজে। কিন্তু অপরাধী ব্যক্তিদের একজনেরও বিচার হয়েছে এমন কথা শোনা যায়নি কখনো। কেন হয়নি সে খবরও সংবাদপত্রের পাতায় আসেনি। উত্তরাঞ্চলে পানির দামে বিক্রি হতে থাকে জমি। অসংখ্য সম্ভ্রান্ত কৃষক ভিক্ষুকে পরিণত হন। সে সময়ের ২২শে সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাররমে দুই শতাধিক উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ নারী পুরুষ অন্নবস্ত্রের দাবিতে মিছিল করে। গ্রাম থেকে আসা অসহায় মানুষের আর্তনাদ একটুও কম্পিত করতে পারেনি আওয়ামী লীগের শাসককুলের হৃদয়। আর সেই সময়েই শেখ মুজিবের ৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৫৫ পাউন্ড ওজনের কেক কাটেন শেখ মুজিব নিজেই!!!

২৩শে সেপ্টেম্বর সারাদেশে ৪৩০০ লঙ্গরখানা খোলার কথা ঘোষণা করা হয়। সে সমস্ত লঙ্গরখানার ইতিহাস আর এক করুণ কেলেঙ্কারীর ইতিহাস। নওগাঁর আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য ২৪শে সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি দিয়ে জানান যে, সারা জেলার মানুষ গত ৩-৪ দিন ধরে না খেয়ে আছে। চালের সের সাত টাকা। তার ক'দিন পরেই ৬ই অক্টেবর ইত্তেফাক খবর দেয় যে, ২১ লাখ টাকার বিদেশী মদ ও সিগারেট আমদানি করা হয়েছে সরকারি টাকায়। ঐ দিনই খাদ্যমন্ত্রী বললেন, "তখন পর্যন্ত অনাহারে কতলোক মরেছে সরকারের তা জানা নেই। প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর খবর অতিরঞ্জিত।" তবে তিনি স্বীকার করেন চোরাচালান কিছুটা হয়েছে।

৮ই অক্টোবর অধ্যাপক আবুল ফজলসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে বলেন, "জাতির জীবনে দুর্যোগ মোকাবেলার প্রতি এত অনাসক্তি, এত অবজ্ঞা, এত অদ্ভুত রকম ঔদাসীন্য কখনও দেখা গেছে বলে মনে হয় না। নিজের প্রতি আস্থাহীন জাতি যে কী রকম জড় পদার্থে পরিণত হতে পারে বর্তমান বাংলাদেশ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই একাত্মতা, ত্যাগের মহৎ শক্তির সেই প্রচন্ডতা পরবর্তিকালে সিদ্ধান্তহীনতায়, ভুল সিদ্ধান্তে, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় আর গুটিকতক লোকের লাগামহীন দুর্নীতির সয়লাবে সব ধুয়ে গেছে। দেশের নেতৃত্বের প্রতি এই জাতীয় দুর্দিনে আমাদের আকুল প্রার্থনা, জাতি হিসেবে আমাদের শক্তিতে আস্থাবান হওয়ার পরিবেশ ফিরিয়ে দিন।"

৮ই অক্টোবর ১৯৭৪ শ্রমিক লীগের আব্দুল মান্নান এমপি জানান, "লবনের দুঃপ্রাপ্যতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল প্রকার খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যে, মজুতদার উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে ২টাকা মন দরে লবন কিনে থাকে। সরকারিভাবে মজুতদারদের জন্য অশোধিত লবনের দাম ১৫ টাকা আর শোধিত লবনের দাম ৫৫ টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "অশোধিত লবনের দাম ৪০ টাকা করা হলে বাজারে প্রচুর লবন পাওয়া যাবে। প্রকাশ, এ ব্যাপারে নাকি আমাদের দলীয় কোন কোন সংসদ সদস্য জড়িত রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।"

১৩ই অক্টোবর ঢাকার সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায় যে, প্রতিদিন গড়ে ৮৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন হচ্ছে। ২৭শে অক্টোবর খবর আসে জামালপুরে প্রতিদিন অনাহারে শতাধিক লোক মারা যাচ্ছে। সরকার এই মৃত্যুকে পুষ্টিহীনতা বলে অভিহিত করে। অনাহারে মানুষ মরছে সরকার সেটা অস্বীকার করে। ২৫শে অক্টোবর ঢাকার সংবাদপত্রে বের হয় ট্রাক বোঝাই ধানচাল ভারতে পাচাঁর হচ্ছে। দিনাজপুরে চালের সের ৮ টাকা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানিকগঞ্জের এক পরিবারের ৭জন আত্মহত্যা করেছে। এসময়ে ২৫শে অক্টোবর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান দাবি করেন, "দেশের প্রচলিত আইনে চোরাচালানীদের দমন করা হচ্ছে না। কয়েক মাস আগে সংসদে চোরাচালানীদের গুলি করে হত্যা করার বিধান পাশ হয়। কিন্তু কাউকে কোন দিন ঐ বিধানে হত্যা করা হয়নি।" একই সঙ্গে কামরুজ্জামান অবশ্য বলেন, "দলের ভেতর থেকে দলের সমালোচনা চলবে না।" তখন থেকে আওয়ামী লীগের ভেতরেও কোন্দল দানা বেঁধে উঠে। সেই ক্রান্তিলগ্নে ২৬শে অক্টোবর '৭৪ স্বাধীনতা সংগ্রামকালের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের নির্দেশে মন্ত্রীত্ব হারান। জনাব তাজুদ্দিন এক

বিবৃতিতে বলেন, "জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তিনি কোন বিতর্ক সৃষ্টি করতে চান না।" ঢাকার এবং বিদেশী সাংবাদিকদের মতে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করায় জনাব তাজুদ্দিন আহমদের যে ইমেজ গড়ে উঠে তা পাকিস্তানে আটক শেখ মুজিবর রহমান সহ্য করতে পারছিলেন না। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আটক শেখ মুজিবের চেয়ে স্বাধীনতার প্রশ্নকে বড় করে দেখার জন্য বেগম মুজিবও তাজুদ্দিনকে সহ্য করতে পারতেন না বলে জানা যায়। তাজুদ্দিন সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয় যে, তিনি অর্থমন্ত্রী থাকাকালে দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের পথে চলে যায়। তাজুদ্দিন আহমদ বাকশালের কেন্দ্রিয় কমিটি থেকেও পরবর্তিতে বাদ পড়েন।

২৯শে অক্টোবর সারাদেশে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একই দিন মজুতদারী আর কালোবাজারীর দায়ে আওয়ামী লীগের আর একজন সংসদ সদস্য গ্রেফতার হন। ৩০ তারিখে লবন মজুতের জন্য আওয়ামী লীগের এমপি ডঃ শামসুদ্দিন আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

এ অবস্থায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির উদ্যোগে ১লা নভেম্বর ১৯৭৪ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে শিক্ষক, আইনজীবি, চিকিৎসক, লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, চিত্রশিল্পী ও ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বর্তমান মন্বন্তর প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সমাবেশে যোগদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবিদের এত বিরাট সমাবেশ ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির' সভাপতি সিকান্দার আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুই ঘন্টার উপর এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ, ডঃ আহমদ শরীফ, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, এনায়েত উল্লাহ খান, কামরুন্নাহার লাইলী, নিজামুদ্দিন আহমদ, মহিউদ্দিন আলমগীর, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মুহাম্মদ জাকারিয়া এবং বদরুদ্দিন উমর। সমাবেশে বিদ্যমান মন্বন্তর পরিস্থিতি ও মৌলিক আধিকার সম্পর্কে ১৭টি প্রস্তাব গৃহিত হয়। সমাবেশের পর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গন থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত যায় এবং সেখানেই সমাবেশের কর্মসূচী শেষ হয়। সমাবেশে গৃহিত প্রস্তাববলীর বিবরণ:-

১৯৭৪ সালের ১লা নভেম্বর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মন্বন্তরের গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকেও অতিক্রম করেছে এবং এই মন্বন্তর, বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি হয়নি বরং শাসকশ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের গণবিরোধী নীতি ও কর্মকান্ডেরই প্রত্যক্ষ পরিণতি। সমাবেশের প্রস্তাবে এই মন্বন্তরকে 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলে বর্ণনা না করে একে মন্বন্তর বলে ঘোষণার জোর দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবে বৈদেশিক সাহায্যের একটি শ্বেতপত্র ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশের প্রস্তাবে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনে সরকারের বিরোধিতার নিন্দা করে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করার দাবি জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে বিরোধী দলসমূহের প্রতি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও রেশনিং এলাকা সম্প্রসারন ও টেষ্ট রিলিফ চালু করার দাবি জানানো হয়। সমাবেশের প্রস্তাবে লঙ্গরখানার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেখানে নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন সমাবেশে রেডক্রসের চেয়ারম্যান হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়। রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ ও মিথ্যা মামলায় আটক ও বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানানো হয়।

পরবর্তিকালে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় আওয়ামী লীগ সরকার ও সরকারি দলের নেতা-সদস্যদের রিলিফ চুরির ও চোরাচালানের বিবরণ দিতে গিয়ে

১৩ই আগষ্ট ১৯৯২ সালে সংসদে বলেছিলেন, ‘‘রিলিফ চুরি ও চোরাচালানের মাত্রা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল আওয়ামী শাসনামলে যে তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধানকে বলতে হয়েছিল, ‘আমার কম্বলটা কোথায়??’ ’’(২১শে আগষ্ট ১৯৯২ বিচিত্রায় প্রকাশিত)।

সেই সময় বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা সংসদে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু ঐ বক্তব্যের বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিক্ত সত্যকে গলঃধরণ করে তাকে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে অসহায়ের মত।

শেখ কামাল নিজেকে ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী বলে দাবি করলো!

বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যে আমরা তখনও ব্যস্ত। একরাতে হঠাৎ করে শেখ কামাল, সাহান এবং তারেক এসে উপস্থিত আমার কুমিল্লা সেনানিবাসের বাসায়। সাহান ও তারেক ছিল কামালের বিশেষ ঘনিষ্ট বন্ধু।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন বেশ রাত করেই শেখ কামাল, সাহান এবং তারেক কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আমার বাসায় এসে হাজির। রাত তখন প্রায় ১১টা বাজে। এতরাতে কোন খবর না দিয়ে ওদের আগমণে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিলাম।

-কি ব্যাপার কামাল। তোমরা এত রাতে এখানে ? প্রশ্ন করলাম।

-বস সরি! কিন্তু উপায় নাই। রাতটা আপনার বাসায় নিরাপদে কাটাবো বলেই এলাম। সকালে এসেছি পার্টির কাজে। সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম শহরে। খবর দেবার সময়ও পাইনি। কিছুক্ষণ আগে কাজ শেষ হল। দিনকাল খারাপ তাই ভাবলাম শহরে না থেকে আপনার কাছে চলে আসি।

-তা বেশ করেছো। শহরেতো আজ গোলাগুলিও হয়েছে শুনলাম।

-না বস। গোলাগুলি না; এই একটু রংবাজী আর কি! জানাল কামাল। এরি মধ্যে নিম্মী খাবারের বন্দোবস্ত করে এসে বলল,

-সবার মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে কারোই খাওয়া হয়নি, এসো খেয়ে নাও; তারপর কথা বলার জন্য সারারাত পড়ে আছে।

-নিম্মী **You are really great** বলল কামাল। সবাই হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে গেল। এরা তিনজনেই বিশেষভাবে পরিচিত এবং আপনজন। খাওয়ার মাঝেই সাহান বলে উঠল,
-ডালিম ভাই কামাল বিয়ে করছে।
-তাই নাকি! তা হঠাৎ করে বিয়ে কি বিষয়?
-না মানে, সবাই ধরছে; না করে আর উপায় কি বস ? রাজি হতেই হল।
-এত খুবই সুখবর। তা তোমার স্কলারশীপের কি হল? সস্ত্রীক যাচ্ছ নাকি? জানতে চাইলাম আমি।
-যাওন যাইবো না বস। পড়ালেখা করার সময় নাই। এরপর কামাল শার্টের কলারের একপ্রান্ত আঙ্গুল দিয়ে নাড়িয়ে বেশ একটু গর্বের সাথেই বলল,
- **Future Prime Minister** বুঝতেইতো পারেন কত কাম। একদম সময় নাই।
-সেটাতো বুঝতেই পারছি; কিন্তু **There is no short cut to knowledge.** মাত্রতো ২-৪ বছরের ব্যাপার ছিল। লেখাপড়াটা সেরে আসলে ভবিষ্যতে একজন **Educated Prime Minister** পেতাম। **This is my only interest nothing else.** তাই বলা আর কি। তাছাড়া আগামী দু'চার বছরেতো চাচা রিটায়ার করছেন না; সেক্ষেত্রে স্কলারশীপটা **avail** করলেই পারতে। দেখ কামাল, চাচা বলেন তিনি প্রায় সর্বমোট ১৭ বছর জেল খেটেছেন পাক আমলে। জেলে থাকাকালীন অবস্থায় পৃথিবীর প্রায় সব নামি-দামী নেতারা বিস্তর লেখাপড়া করেছেন। আমাদের ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের লাইব্রেরীটাও শুনেছি খুবই **rich.** জেলে থাকাকালীন সময়টার যথাযধ সদব্যবহার করে চাচা কিন্তু তেমন একটা লেখাপড়া করেননি। সময়টাকে কাজে লাগালে আজ তারই অনেক সুবিধা হত রাষ্ট্র পরিচালনা করতে। কি কথাটা ঠিক বললাম কি না? ওরা সবাই আমার কথা শুনছিল আর খাচ্ছিল। কামাল কিংবা অন্যদের কেউ কোন উত্তর দিল না। আমার কথাগুলো

সম্ভবত ওদের মনঃপুত হয়নি। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ হালকা আলাপ করে সবাই শুয়ে পড়েছিলাম। পরদিন নাস্তার পর ওরা ঢাকায় ফেরার জন্য রওনা হয়ে গেল।

জেনারেল জিয়াকে সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা

সরকার জেনারেল জিয়াকে বার্মায় 'ডিফেন্স এ্যটাসী' করে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

আমরা তখনো সারাদেশে ডিপ্লয়েড। একদিন নূর ফোন করে জানাল- জেনারেল জিয়া অতি জরুরী প্রয়োজনে আমার সাথে দেখা করতে চান। ফোন পেয়েই এলাম ঢাকায়। নূর জানাল বস আমাকে বাসায় দেখা করতে বলেছেন। বুঝলাম বিশেষ জরুরী বিষয়ে আলাপ করতে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। জরুরী এবং গোপন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা সাধারণতঃ তার বাসাতেই হত। বাসায় গিয়েই দেখা করলাম। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে অনেক আলোচনার পর তিনি আসল কথাটা বললেন,

-**I hear that I am going to be sent out from the army as Defense Attaché to Burma soon, do you know anything about it?**

-আকাশ থেকে পড়লাম! কি বলছেন জেনারেল জিয়া? শেখ মুজিবতো কথা দিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাকে চীফ বানাবেন; তাহলে? জবাব দিলাম,

-আমি কিছুই জানি না স্যার। তবে আপনার যাওয়া চলবে না। আপনাকে হারাতে চাই না আমরা।

- **Well then try to do something..** তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি চাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে আমি আলাপ করি। অবশ্যই আমার সাধ্যমত যা করার সেটা আমি করব। প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করব আজই। বললাম আমি।

- **I shall appreciate that. Do let me know the outcome of your meeting. I shall be waiting for your return.**

-ঠিক আছে স্যার। বলে বেরিয়ে এসেছিলাম তার বাসা থেকে।

সেদিন রাতেই গিয়ে উপস্থিত হলাম ৩২নং ধানমন্ডিতে। নেতা তখনো বাড়ি ফেরেননি। রেহানা ও জামালের সাথে বসে গল্প-গুজব করছিলাম। জামাল জানাল সে স্যান্ডহার্টস না হয় যুগোস্লাভিয়ায় যাচ্ছে **Army officer's course** করার জন্য। শুনে বললাম, '' ভালইতো; ক্যারিয়ার হিসাবে আর্মিকে যদি তোমার পছন্দ হয় তবে তো তোমার যাওয়াই উচিত।'' আমরা যখন কথা বলছিলাম কামাল যেন কোথা থেকে বাসায় ফিরে এল। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল,

-বস কি ব্যাপার ?

-কোন ব্যাপার ছাড়া ৩২নং এ বুঝি কেউ আসে না? আমার পাল্টা প্রশ্নে ও একটু লজ্জা পেলো। তাড়াতাড়ি পরিবেশ হালকা করার জন্য বলল,

-না না তা ঠিক নয়। তবে বেশিরভাগ লোকজনদেরই কিছু না কিছু ব্যাপার থাকে; তবে ব্যতিক্রমও আছে যেমন আপনি। আপনি আসেন শুধু আব্বার সাথে ঝগড়া করতে।

-ঝগড়া করার অধিকার তার, ভালবাসার অধিকার যার। জবাবে বলেছিলাম আমি।

-তাতো অবশ্যই, সেটা কি আমরা বুঝি না। বাদ দেন এসব। একটা পরামর্শ দেনতো বস। বলল কামাল।

-কি বিষয়ে? জিজ্ঞেস করলাম।

-একটা স্কলারশীপ পাইছি ক্যানাডায় ল' পড়ার জন্য। ঠিক করতে পারতাছি না যামু কি যামু না।

-এটাতো অত্যন্ত সুখবর! যাবে না মানে? নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। জ্ঞান অর্জন করার জন্যতো চীন পর্যন্ত যেতে বলেছেন আমাদের প্রিয় নবী। মাত্র ৩-৪ বছরের ব্যাপার। সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আমি যদি এমন একটা সুযোগ পেতাম তবে খুশী হয়ে চলে যেতাম। আমার জবাব শুনে কামাল বলল,

-তাহলে যাওয়াই উচিত আপনার মতে?

-অবশ্যই যাওয়া উচিত। এরই মধ্যে বাড়ির কাজের ছেলেটা এসে জানাল কেউ এসেছে কামালের সাথে দেখা করতে তাই বিদায় নিয়ে কামাল চলে গেল। নেতা ফিরলেন বেশ রাতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ডাক পড়ল।

-কি খবর অনেকদিন পর আইলি যে? শেখ সাহেব বললেন।

-ঢাকায় কাজে এসেছি ভাবলাম আপনাকে সালাম জানিয়ে যাই। তিনি বেশ খোশমেজাজেই ছিলেন। কথার সাথে সাথে পাইপ টানছিলেন।

-চাচা, আপনি নাকি জেনারেল জিয়াকে বার্মায় **Defense Attaché** করে পাঠবেন ঠিক করেছেন? তার ভাল মুড এর সুযোগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

-ঠিক করি নাই; তবে বার্মায় একজনরে পাঠাইতে হইবো। শফিউল্লাহ কইলো জিয়ার নাকি ইন্টিলিজেন্সের ট্রেনিং আছে তাই ওর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হইতাছে।

তার কথার খেই ধরে আমি বললাম,

-ইন্টিলিজেন্স কোর্স করা আর্মিতে আরো অনেক অফিসারই আছে। তাদের থেকে কাউকে পাঠান। **General Zia is too senior for that post anyway.** তাছাড়া এই মুহূর্তে তাকে বাইরে পাঠালে সবাই ভাববে আপনি আপনার কথার খেলাপ করে তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আর্মি থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। এটা আপনার জন্য ভাল হবে কি? তাছাড়া বেশকিছু কারণে আর্মির ভেতরে একটা সুপ্ত ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ অবস্থায় এ ধরণের একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যদি কোন **Out burst** ঘটে; সেটা সরকার এবং সরকার প্রধান হিসাবে আপনার জন্য বিব্রতকরও হতে পারে। বেয়াদবী নেবেন না চাচা, আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক হবে না। চুপ করে আমার কথাগুলো শুনে গেলেন শেখ সাহেব পাইপ মুখে নিয়ে।

-তুই কেমন আছস? কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন তিনি।

-যেমন রাখছেন। জবাব দিলাম।

-তোরাতো একটা কথা বুঝস না। পার্টির রাজনীতি করতে গেলে সবকিছুতে যুক্তি চলে না। নিজের ইচ্ছামতও সবকিছু করন যায় না। আমার অবস্থাটা বুঝিস। দেশও চালাইতে হয় আবার পার্টির স্বার্থও দেখতে হয়।

-চাচা আমি রাজনীতি করি না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক। সেই তুলনায় আমার কোন জ্ঞান নাই বললেই চলে। তবু কেন জানি মনে হয় প্রচলিত প্রবাদটায় একটা গভীর মানে আছে, একটা ঈঙ্গিত বলা চলে।

-কোন প্রবাদের কথা কছ তুই? জানতে চাইলেন জনাব শেখ মুজিব।

-ঐ যে, 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়; দলের চেয়ে দেশ বড়।' হালকাভাবে কথাটা বলেই ফেললাম। পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন শেখ সাহেব।

-জিয়া তোরে পাঠাইছে? প্রশ্ন করলেন তিনি।

-জিয়া পাঠাবে কেন? আপনিই আমাকে কথা দিয়েছিলেন উপযুক্ত সময় তাকে আপনি চীফ বানাবেন; তাই খবরটা জানার পর আমি নিজেই এসেছি স্বেচ্ছায় আপনার কাছ থেকে এ ব্যাপারে জানতে। বেয়াদবী হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন।

-ঠিক আছে বুঝলাম। তুই যা এখন, কিছু লোকজন আইবো।

আমি সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। পরদিন জেনারেল জিয়াকে সবকিছু জানিয়ে কুমিল্লায় ফিরে এলাম। আমাদের সেদিনের আলোচনার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক জেনারেল জিয়াকে আর বার্মায় যেতে হয়নি। তার জায়গায় পাঠানো হয়েছিল কর্নেল নূরুল ইসলাম শিশুকে। তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে চলে গেলেন বার্মায়। তার খুশী হওয়ার কারণ ছিল। যুদ্ধের সময় হার্টের পালপিটেশনের অযুহাতে রণাঙ্গন ছেড়ে কোলকাতার মুজিবনগর হেডকোয়াটার্স চলে এসেছিলেন তিনি। দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পর তিনি হঠাৎ করে একদিন ২৭নং মিন্টু রোডের হেডকোয়াটার্স থেকে লাপাত্তা হয়ে যান। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল তবুও তিনি ফিরলেন না। এতে জেনারেল ওসমানী ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তৎকালীন সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনকে ডেকে হুকুম দিলেন যেকরেই হোক না কেন **deserter** শিশুকে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে আসতে। আমরা সবাই জানতাম আর্মিতে আর চাকুরি করতে চাচ্ছেন না শিশু ভাই।

কিন্তু জেনারেল ওসমানীও ছাড়বেন না তাকে। সে এক উভয় সংকট অবস্থা। এ কারণেই লাপাত্তা হয়েছিলেন তিনি। যাই হোক অনেক কষ্টে তাকে সবাই মিলে বুঝিয়ে কোনরকমে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। সেই শিশু ভাই পরবর্তিকালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে মেজর জেনারেল ইসলাম "**The Rasputin of Bangladesh**" হয়ে উঠেন। একেই বলে 'কপালের নাম গোপাল'। বাংলাদেশের রাজপুটিন শিশুর কর্মতৎপরতার পরিণাম কি হয়েছিল সে এক করুণ ইতিহাস। সেক্সপিয়রীয় বিয়োগান্তর নাটকের জুলিয়াস সিজারে পরিণত হয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। যাই হোক, জেনারেল জিয়াকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ যাত্রায় তিনি রক্ষা পেলেও পরিষ্কার বোঝা গেল সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী চেতনার অধিকারী অংশকে দুর্বল করে তোলার জন্য সরকার ক্ষেপে উঠেছেন। মেজর জলিল, কর্নেল জিয়াউদ্দিন এবং কর্নেল তাহেরকে ইতিমধ্যেই হারিয়েছি এবং আরো অনেককেই হয়তো বা বের করে দেয়া হবে সেনাবাহিনী থেকে কোন না কোন অজুহাতে। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে, রাজনৈতিক মহল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সমমনা লোকদের সাথে আলোচনা হল। প্রায় সবাই একই মত পোষণ করলেন যে, সেনাবাহিনীতে স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিকদের ক্রমান্বয়ে বের করে দিয়ে শুধুমাত্র খয়ের খাঁ, জী হুজুর টাইপের সদস্যদেরকেই রাখা হবে সেনাবাহিনীতে। এরপর এক সময় রক্ষীবাহিনীকে তাদের সাথে একত্রীভূত করে গড়ে তোলা হবে সম্পূর্ণভাবে সরকারের তাবেদার এক সেনাবাহিনী। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম- এখন থেকে যতটুকু সম্ভব এ বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখব।

সেনাবাহিনীকে পুনরায় আইন-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যে তলব করা হয়।

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে এক নাজুক পরিস্থিতিতে দিকহীন আওয়ামী লীগ সরকার আইন শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যে সেনাবাহিনীকে তলব করতে বাধ্য হন শেখ মুজিব ও তার সরকার।

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে দেশের এক নাজুক পরিস্থিতিতে দিশেহারা মুজিব সরকার নেহায়েত অনোন্যপায় হয়ে আবার সেনাবাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং দুস্কৃতিকারী দমন করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের জন্য তলব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কুমিল্লা সেনানিবাসের ব্রিগেড কমান্ডার তখন কর্নেল নাজমুল হুদা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত ছিলেন কর্নেল হুদা। সেই সুবাদে কিংবা অন্য যেকোন কারণেই হোক শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ ভক্তি ছিল তার। তবে এ বিষয়ে সুশিক্ষিত কর্নেল হুদার মনে দ্বন্দ্বও ছিল যথেষ্ট। একই সাথে যুদ্ধ করেছি আমরা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাকে ভীষণ আপন করে নিয়েছিলেন। আমাদের সম্পর্ক এত নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে আমরা রাজনীতি নিয়ে অবাধে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করতাম। আমার স্পষ্টবাদিতায় অনেক সময় তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় বড় ভাইয়ের মত উপদেশ দিতেন বেফাঁস কথাবার্তা বলে আমি যাতে নিজেকে বিপদে না ফেলি। তার আন্তরিকতায় আমি তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতাম। অপারেশন অর্ডার আসার পর আমি হুদা ভাইকে একদিন বলেছিলাম '৭২ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তিনি নিজেও সে বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ঠিক করা হল চীফ অফ স্টাফকে অনুরোধ জানানো হবে যাতে তিনি সশরীরে কুমিল্লায় এসে অপারেশন সম্পর্কে সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বলেন। এতে করে আমরাও জানার সুযোগ পাবো এবার সরকারের উদ্দেশ্য কি? প্রধনমন্ত্রী কি এবার সত্যিই তার 'চাটার দল' ছেড়ে জনগণের কল্যাণ চান? এর জন্যই কি তিনি আমাদের সাহায্য চাইছেন? সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল শফিউল্লাহকে কর্নেল হুদা কুমিল্লায় আসার অনুরোধ জানালেন। এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কনফারেন্সে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, ''৭২ সালের মত সেনাবাহিনীকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে নাতো এবারও?'' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, , **''This time 'BangaBandhu' means business. If even his dead father is found to be implicated in any crime then his body could be exhumed for trial. No exception this time whatsoever. This is what he told me personally and I have no reason to disbelieve him.''** খুবই ভালো কথা। শেখ মুজিব এবার সত্যিই চিনতে পেরেছেন তার সরকার ও দলকে। তিনি তাদের অন্যায়ের প্রতিকার চান। এদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত অর্থে জননেতা হবার জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইছেন তিনি। তার এই প্রচেষ্টায় অবশ্যই আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য করব সব ঝুঁকি হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে; সে কথাই দেয়া হয়েছিল জেনারেল শফিউল্লাকে। অপারেশনকে যেকোন মূল্যে সফল করে তুলবো আমরা। খুশি মনেই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। কুমিল্লা ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেয়া হল কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং সিলেটে অপারেশন পরিচালনার। আমাকে কর্নেল হুদা (হুদা ভাই) কুমিল্লা অপারেশনের দায়িত্ব দিলেন। সিলেট এবং নোয়াখালীর দায়িত্ব দেয়া হল মেজর হায়দার এবং মেজর রশিদকে। **Combing Operation** শুরু হল। সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্ট থেকে জানা গেল সব সেক্টরে আওয়ামী লীগ এবং দলের অঙ্গ সংগঠনগুলোর কাছেই রয়েছে বেশিরভাগ অবৈধ অস্ত্র। প্রভাবশালী নেতাদের ছত্রছায়াতেই নিরাপদে রয়েছে ঐসব অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা। তাতে কি? এবার মুজিব তার মরা বাপকেও ছাড়তে রাজি নন। আমরা যার যার এলাকায় সব প্রস্তুতি শেষে অপারেশন শুরু করলাম। সব জায়গায়ই খবর পাওয়া যাচ্ছিল এলাকার যত দাগী লোক, অবৈধ অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, খুনী, লুটেরাদের মাথা হল আওয়ামী লীগের নেতারা কিংবা নেতাদের পোষ্য মাস্তানরা। সব জায়গাতেই আবার আমাদের সরকারি দলের নেতারাও তাদের তৈরি সন্ত্রাসীদের

নামের তালিকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তদন্তের ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাদের দেওয়া তালিকাভুক্ত লোকেরা প্রায়ই এলাকায় সৎ এবং নীতিবান বলে পরিচিত। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই সরকার বিরোধী রাজনীতির সাথে জড়িত কিংবা সমর্থক ছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হল দুঃস্কৃতিকারীদের ধরা সে যেই হোক না কেন। দল বিশেষের প্রতি আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। ধর-পাকড় করা হল অপরাধীদের স্থানীয় বেসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এবং প্রশাসনের সহায়তায়। যারা ধরা পড়েছিল তাদের বেশিরভাগই হোমরা-চোমরা চাঁই এবং নেতা-নেত্রীরা। সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগম থেকে কুমিল্লার জহিরুল কাইউম কেউই বাদ পড়লেন না। সিলেট, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল এবং দেশের অন্যান্য জায়গাতে আর্মির হাতে ধরা পড়ল শেখ নাছের, হাসনাত প্রমুখ অনেক নামী-দামী নেতারা। সব জায়গায় একই উপাখ্যান। এলাকার দুস্কৃতিকারীদের বেশিরভাগই সরকার ও সরকারি দলের লোকজন। এই অপারেশনের সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা সরাসরিভাবে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-পাতি নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। আর্মি অপারেশনের ফলে সারাদেশে চমক সৃষ্টি হল। লোকজন ভাবল শেখ মুজিব আর্মির সাহায্যে 'চাটার-দল' এর সন্ত্রাস ও দুর্নীতির হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। ফলে সবখানেই জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন আর্মি অপারেশনে সাহায্য করতে। কয়েকদিনের দেশব্যাপী অভিযানের ফলে সন্ত্রাস কমে গেল অস্বাভাবিকভাবে। জনগণের মনে আশা ফিরে এল। দুঃশাসনের ফলে র্নিজীব হয়ে পড়া জাতির মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হল। ধরা পড়া সবার বিরুদ্ধেই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হল। কারো ব্যাপারেই কোন ব্যতিক্রম করা হল না। যদিও বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল থেকে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকেও অনেকের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল অনবরত। কিন্তু আমরা আমাদের নীতিতে সবাই অটল। কারো ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার করা হবে না। আইন সবার জন্যই সমান। হঠাৎ সেনা সদর থেকে কয়েকজন আটক অপরাধীকে ছেড়ে দেবার জন্য নির্দেশ পাঠালেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কর্নেল হুদা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন কাউকে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ শুধুমাত্র আইনই এখন তাদের ভাগ্য নির্ধারন করতে পারে। আইনকে নিজের হাতে নেবার কোন অধিকার তার নেই। ব্রিগেড কমান্ডারের এই জবাব জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। কর্নেল হুদার কাছে ফোন এল প্রধানমন্ত্রীর। কর্নেল হুদা বিনীতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন প্রধানমন্ত্রী যেন তার রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েলকে পাঠিয়ে দেন চীফের সাথে সরেজমিনে অবস্থার তদন্ত করার জন্য। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে আর্মি কারো প্রতি কোন অবিচার কিংবা অন্যায় আচরণ করেছে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর যেকোন শাস্তিই তিনি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন এরিয়া কমান্ডার হিসাবে। প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন যখন আসে তখন দৈবক্রমে আমিও কন্ট্রোল রুমে এ উপস্থিত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর ফোন তাই আমি রুম থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু কর্নেল হুদার নির্দেশেই রুমে থেকে যেতে হয়েছিল আমাকে। কর্নেল হুদার চারিত্রিক দৃঢ়তা সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। নেতার প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য এবং শেখ মুজিবের অতি বিশ্বাসভাজনদের একজন হয়েও কর্নেল হুদা (গুডু ভাই) এ ধরণের জবাব প্রধানমন্ত্রীকে দেবেন সেটা সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন অতিসত্বর তিনি লোক পাঠাচ্ছেন তদন্তের জন্য। সেদিনই হেলিকপ্টারে করে এসে পৌঁছালেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। জনাব তোফায়েলকে কিছুতেই তিনি সঙ্গে আনতে রাজি করাতে পারেননি। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ জনাব তোফায়েল কুমিল্লায় এলে সবকিছু বিস্তারিত জানার পর মাথা হেট করে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর থাকত না তার। জেনারেল জিয়ার আগমণের পর কুমিল্লাসহ অন্য সব জেলার শীর্ষ নেতাদের যারা তখনও বাইরে ছিলেন তাদের সবাইকে সেনানিবাসে আমন্ত্রণ জানানো হল এক মধ্যাহ্ন ভোজে। ভোজপর্ব শেষে একে একে সব ধৃত ব্যক্তিদের কেন এবং কোন চার্জে ধরা হয়েছে; প্রমাণাদিসহ তার বিশদ বিবরণ দিলেন অপারেশন কমান্ডাররা। কেউ কোনকিছুর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। জেনারেল জিয়া কর্নেল হুদা এবং আমাকে সঙ্গে করে একই হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় সেনা সদরে ফিরে এলেন। সেখান থেকে জেনারেল শফিউল্লাহকে সঙ্গে করে আমরা গেলাম ৩২নং ধানমন্ডিতে শেখ সাহেবের

সাথে দেখা করতে। সেখানে পৌঁছে দেখি প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব তোফায়েল আহমদ আমাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকতেই কর্নেল হুদা এবং আমাকে দেখা মাত্র শেখ মুজিব গর্জে উঠলেন,

-কি পাইছস তোরা? আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশে আর কোন দুস্কৃতিকারী নাই? জাসদ, সর্বহারা পার্টির লোকজন তোদের চোখে পড়ে না? অবাক হয়ে গেলাম। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী! কর্নেল হুদা জবাব দিলেন,

-স্যার আমরা আপনার নির্দেশে অপারেশন করছি প্রকৃত দুস্কৃতিকারীদের ধরার জন্য। আমরা নির্দলীয়। আমাদের কাছে সবাই সমান। বিভিন্ন এজেন্সীর দেয়া রির্পোটের ভিত্তিতে এবং আমাদের নিজস্ব এজেন্সী দিয়ে ঐ সমস্ত রিপোর্ট ভেরিফাই করার পরই আমরা এ্যাকশন নিয়েছি। ধৃত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই যদি আওয়ামী লীগার হয় তাতে আমাদের দোষ কোথায়? কথা বাড়তে না দিয়ে জনাব তোফায়েল কয়েকজনের নাম করে তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিতে বললেন। তাকে সমর্থন করে আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বললেন,

-যা হবার তা হইছে। এখন এদের ছাড়ার বন্দোবস্ত কর। জবাবে আমি বললাম,

-ধরার বা ছাড়ার মালিক আমরা নই স্যার। চীফের মাধ্যমে আপনার নির্দেশই কার্যকরী করেছি আমরা। ধরার হুকুম দিয়েছিলেন আপনি; ছাড়ার মালিকও আপনি; তবে এ বিষয়ে আইন কি বলে সেটা আমার জানা নেই। ছেড়ে দেয়াটা যদি আইনসম্মত মনে করেন তবে হুকুম জারি করে আইন সংস্থাকে বলেন তাদের ছেড়ে দিতে। আমরা তাদের ছাড়বো কিভাবে? তারাতো এখন আমাদের অধিন নয়। সবাই এখন রয়েছে আইনের অধিনে। আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। আমার জবাব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেনারেল শফিউল্লাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন,

-বাজান! কিছু একটা কর নাইলে দেশে আওয়ামী লীগ একদম শ্যেষ হইয়া যাইবো। জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর 'বাজান' সম্বোধনে বিগলিত হয়ে দাড়িয়ে পড়ে প্রায় হাতজোড় করে বললেন,

-স্যার। আপনি অস্থির হবেন না। আমি অবশ্যই একটা কিছু করব। আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। কথাগুলো শেষ করে বসতেও ভুলে গিয়েছিলেন সেনা প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর ইশারায় আবার নিজের আসনে বসলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। আমরা সবাই নিশ্চুপ বসে থেকে তার মোসাহেবীপনার কৌতুক উপভোগ করছিলাম কিছুটা বিব্রত হয়ে। **After all he is our Chief!** ইতিমধ্যে জনাব তোফায়েল শেখ সাহেবের কানে কানে নীচুস্বরে কিছু বললেন। তার কান পড়ায় হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন,

-কুমিল্লার ক্যাপ্টেন হাই, ক্যাপ্টেন হুদা, লেফটেন্যান্ট তৈয়ব, সিলেটের লেফটেন্যান্ট জহির এর বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে হইবো। তারা বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। হুদা ভাইকে উদ্দেশ্য করেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন শেখ মুজিব।

-স্যার ওরা সব জুনিয়র **Subordinate officer.** ওরা যা করেছে সেটা আমার হুকুমেই করেছে। অত্যাচারের অভিযোগ সত্যি নয়। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তার পরেও যদি ওদের শাস্তি দিতে চান তবে সেটা সবার আগে আমারই প্রাপ্য। আমাকে ডিঙ্গিয়ে জুনিয়র অফিসারদের শাস্তি দিলে সেটা আমার জন্য অপমানকর হবে সেক্ষেত্রে কমান্ডার হিসাবে অধিনস্থ সব অফিসার এবং সৈনিকদের কাছে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। কর্নেল হুদার জবাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রস্তে উঠে দাড়ালেন তিনি এবং বললেন,

-ঠিক আছে। আইজ তোরা যা, ডালিম তুই রাইতে খাইয়া যাইস। আমাকে রেখে বাকি সবাই চলে গেলেন। শেখ সাহেব ও আমি বাড়ির অন্দর মহলে ঢুকলাম। রাত তখন প্রায় ১১টা। যথাযথ নিয়মে বারান্দায় খাওয়া পরিবেশন করা হল। খেতে খেতে শেখ সাহেব বললেন,

-তুই থাকতে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের এই দশা অইলো ক্যান?

-চাচা বিশ্বাস করেন; আমরা কোন দল দেখে অপারেশন করিনি। চীফ কুমিল্লায় এসে আমাদের বলেছিলেন এবার নাকি আপনি আপনার মরা বাপকেও ছাড়বেন না। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আপনি একবার কুমিল্লায় গিয়ে দেখেন লোকজন কি খুশী। সবাই মনে করছে এবার আপনি সত্যিই চাটার দল এবং টাউট বাটপারদের শায়েস্তা করতে চাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে নেতা

হিসাবে জনগণের মনোভাবকেই তো আপনার প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমিতো মনে করি আমাদের এই অপারেশনের পর আপনার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এখন যেকোন কারণেই আপনি যদি এদের ছেড়ে দেন তবে কি আপনার লাভ হবে? আমারতো মনে হয় ক্ষতিই হবে আপনার। আপনার পরামর্শদাতারা যে যাই বলুক না কেন আমার মনে হয় বিনা বিচারে কাউকেই ছাড়া আপনার উচিত হবে না। এতে ব্যক্তিগতভাবে আপনিই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন সবচেয়ে বেশি।

–কিন্তু পার্টি ছাড়া আমি চলমু কেমনে ? প্রশ্ন করলেন শেখ সাহেব।

–পার্টি আপনার অবশ্যই প্রয়োজন। মনে করেন না কেন এটা একটা শুদ্ধি অভিযান। খারাপদের বাদ দিয়ে সৎ এবং ভালো মানুষদের নিয়েওতো পার্টি চালানো যায়। কিছু মনে করবেন না চাচা; চোর, বদমাইশ, সন্ত্রাসী, লুটেরা, টাউট–বাটপারদের নেতা হিসাবে পরিচিত হওয়াটাকি আপনার শোভা পায়? যারাই ধরা পড়ছে তাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগার। তার মানে বর্তমানে আপনার দলে ভালো লোকের চেয়ে খারাপ লোকজনই বেশি। এদের বাদ দেন। দেখেন লোকজন কিভাবে আপনাকে সমর্থন জানায়। চুপ করে শুনছিলেন আমার কথা। মুখটা ছিল থমথমে। খাওয়ার পর পাইপ টানার অভ্যাস তার, পাইপটা টেবিলের উপর পরে থাকলেও আজ তিনি সেটা ধরাননি। চিন্তিত অবস্থায় হঠাৎ করে বলে উঠলেন,

–বাঙ্গালী জনগণরে খুব ভালো কইরা চিনি আমি।

বুঝলাম না তিনি এই উক্তিতে কি বোঝাতে চাইলেন। কিছুক্ষণ পর শোবার ঘরে উঠে চলে গেলেন শেখ সাহেব। ওখানে তার কোন আত্মীয় অপেক্ষা করছিলেন। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ কামাল এসে উপস্থিত।

–বস দিলেনতো আওয়ামী লীগ শেষ কইরা। কাজটা ভালো করেন নাই। উত্তর দিলাম,

–সব **criminals and badelements** যদি আওয়ামী লীগার হয় তার জন্য আমরা দায়ী না। সারা দিনের ধকলে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিলাম ৩২ নম্বর থেকে। বাসায় ফিরে দেখি আব্বা আমার ফেরার অপেক্ষায় তখনও জেগে বসে আছেন। বুঝতে পারলাম কুমিল্লা থেকে নিম্মী ফোন করে আমার ঢাকায় আসার খবর বাসায় জানিয়েছে।

আব্বা জিজ্ঞেস করলেন কি হল? সবকিছুই খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বললেন, "তোরা কি ভেবেছিলি? শেখ মুজিব সত্যিই অপরাধীদের ধরার জন্য তোদের মাঠে নামিয়েছে? আমি ওকে ভালো করে চিনি। যখন এসএম হলে জিএস ছিলাম তখন একসাথে মুসলীম লীগের রাজনীতিও করেছি। ওর নীতি বলে কিছু নেই। সারাজীবন ক্লিকবাজী আর লাঠিবাজীর মাধ্যমে নিজের সুবিধা আদায় করে নিয়েছে সে। চরম সুবিধাবাদী চরিত্রের ধুরন্দর শেখ মুজিব। তোদের মাঠে নামিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চেয়েছিল শেখ মুজিব। একদিকে বর্তমানের তীব্র সরকার বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিশেষ করে জাসদ, সর্বহারা পার্টির সদস্যদের খতম করা অন্যদিকে সেনাবাহিনী এবং জনগণের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী অংশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীকে তার দলের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত করার জন্যই সে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তার চালকে বানচাল করে দিয়েছিস তোরা। দেখ এখন সে কি করে। তাদের নিয়েই আমার চিন্তা। **I hope you and your other colleauges don't get victimised.** আব্বার কথাগুলো শুনে জবাবে আমার কিছু বলার ছিল না। তার বক্তব্যের সত্যতা ভবিষ্যতেই প্রমাণ হতে পারে। আব্বা বুঝতে পেরেছিলেন আমি ভীষণ ক্লান্ত। তাই কথা না বাড়িয়ে বললেন, "কুমিল্লাতে একটা ফোন করে শুয়ে পড়। **Don't over estimate Mujib, he is just an average man.** আব্বার কথায় কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে জেনারেল শফিউল্লাহ সেনা সদরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল হুদাকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। হুদা ভাই আমাকে বললেন, **"Chief will go with us to Comilla to release all those people."** ভীষণভাবে দমে গিয়েছিলাম এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে। হুদা ভাই ও ভীষণ আপসেট. ক্যাপ্টেন নূর জেনারেল জিয়ার এডিসি. তার কামরায় গিয়ে বললাম, বসের সাথে দেখা করতে চাই। নূরের মাধ্যমে খবরটা পেয়েই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনিও গম্ভীর। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, **"Well I know every thing.**

Don't loose heart. Allah is there. You have done your duty sincerely so forget about the rest and be at ease.'' চীফের সাথে একই হেলিকপ্টারে ফিরে এলাম কুমিল্লায়। চীফ নিজে গিয়ে বন্দীদের মুক্তি দিলেন। আমাদের সামনেই ফুলের মালা গলায় পরিয়ে সমবেত আওয়ামী লীগাররা সদর্পে মিছিল করে চলে গেল শেখ মুজিবের জয়ধ্বনি করতে করতে। বিব্রতকর অবস্থায় **intolerable humiliation** সহ্য করে নিতে হয়েছিল আমাদের সকলকে। ঢাকায় ফেরার আগে জেনারেল শফিউল্লাহ আমাদের সারমন দিলেন, **''Prime minister's desire is an order.''** এ ঘটনার ফলে সারাদেশে ডেপ্লয়েড আর্মির মনোবল একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল শেখ মুজিব শীঘ্রই আর্মি অপারেশন বন্ধ করে দিচ্ছেন। এরপর আমরা নামে মাত্র অপারেশনে ডেপ্লয়েড ছিলাম। আরোপিত দায়িত্ব পালনে কোন উৎসাহ ছিল না কারোই। কোনরকমে সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা।

আমার স্ত্রী এবং আমি গাজী গোলাম মোস্তফা কর্তৃক অপহরিত হই

রেডক্রস চেয়ারম্যান এবং তদানীন্তন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফা নিম্মী এবং আমাকে বন্দুকের মুখে লেডিস ক্লাব থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি ঘটে এক বর্বরোচিত অকল্পনীয় ঘটনা। দুস্কৃতিকারী দমন অভিযানে সেনাবাহিনী তখনও সারাদেশে নিয়োজিত। আমার খালাতো বোন তাহমিনার বিয়ে ঠিক হল কর্নেল রেজার সাথে। দু'পক্ষই আমার বিশেষ ঘনিষ্ট। তাই সব ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছিল আমাকে এবং নিম্মীকেই। বিয়ের দু'দিন আগে ঢাকায় এলাম কুমিল্লা থেকে। ঢাকা লেডিস ক্লাবে বিয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই বিয়েতে অনেক গন্যমান্য সামরিক এবং বেসামরিক লোকজন বিশেষ করে হোমরা-চোমরারা এসেছিলেন অতিথি হিসেবে। পুরো অনুষ্ঠানটাই তদারক করতে হচ্ছিল নিম্মী এবং আমাকেই। আমার শ্যালক বাপ্পি ছুটিতে এসেছে ক্যানাডা থেকে। বিয়েতে সেও উপস্থিত। বিয়ের কাজ সুষ্ঠভাবেই এগিয়ে চলেছে। রেডক্রস চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার পরিবারও উপস্থিত রয়েছেন অভ্যাগতদের মধ্যে। বাইরের হলে পুরুষদের বসার জায়গায় বাপ্পি বসেছিল। তার ঠিক পেছনের সারিতে বসেছিল গাজীর ছেলেরা। বয়সে ওরা সবাই কমবয়সী ছেলে-ছোকরা। বাপ্পি প্রায় আমার সমবয়সী। হঠাৎ করে গাজীর ছেলেরা পেছন থেকে কৌতুকচ্ছলে বাপ্পির মাথার চুল টানে, বাপ্পি পেছনে তাকালে ওরা নির্বাক বসে থাকে। এভাবে দু'/তিনবার চুলে টান পড়ার পর বাপ্পি রাগান্বিত হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করে,

-চুল টানছে কে?

-আমরা পরখ করে দেখছিলাম আপনার চুল আসল না পরচুলা। জবাব দিল একজন। পুচঁকে ছেলেদের রসিকতায় বাপ্পি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণ ক্ষেপে যায়; কিন্তু কিছুই বলে না। মাথা ঘুরিয়ে নিতেই আবার চুলে টান পরে। এবার বাপ্পি যে ছেলেটি চুলে টান দিয়েছিল তাকে ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলে,

-বেয়াদপ ছেলে মশকারী করার জায়গা পাওনি? খবরদার তুমি আর ঐ জায়গায় বসতে পারবে না। এ কথার পর বাপ্পি আবার তার জায়গায় ফিরে আসে। এ ঘটনার কিছুই আমি জানতাম না। কারণ তখন আমি বিয়ের তদারকি এবং অতিথিদের নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত। বিয়ের আনুষ্ঠিকতার প্রায় সবকিছুই সুষ্ঠভাবেই হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর্বও শেষ। অতিথিরা সব ফিরে যাচ্ছেন। সেদিন আবার টেলিভিশনে সত্যজিৎ রায়ের পুরষ্কার প্রাপ্ত ছবি 'মহানগর' ছবিটি দেখানোর কথা; তাই অনেকেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ছবিটি দেখার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই লেডিস ক্লাব প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। মাহবুবের আসার কথা। মানে এসপি মাহবুব। আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ট বন্ধুদের একজন। আমরা সব একইসাথে যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতা সংগ্রামে। কি এক কাজে মানিকগঞ্জ যেতে হয়েছিল তাকে। ওখান থেকে খবর পাঠিয়েছে তার ফিরতে একটু দেরী হবে। ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনরা সবেমাত্র তখন খেতে বসেছি। হঠাৎ দু'টো মাইক্রোবাস এবং একটা কার এসে ঢুকল লেডিস ক্লাবে। কার থেকে নামলেন স্বয়ং গাজী গোলাম মোস্তফা আর মাইক্রোবাস দু'টো থেকে নামল প্রায় ১০-১২ জন অস্ত্রধারী বেসামরিক ব্যক্তি। গাড়ি থেকেই প্রায় চিৎকার করতে করতে বেরুলেন গাজী গোলাম মোস্তফা।

-কোথায় মেজর ডালিম? বেশি বার বেড়েছে। তাকে আজ আমি শায়েস্তা করব। কোথায় সে? আমি তখন ভেতরে সবার সাথে খাচ্ছিলাম। কে যেন এসে বলল গাজী এসেছে। আমাকে তিনি খুঁজছেন। হঠাৎ করে গাজী এসেছেন কি ব্যাপার? ভাবলাম বোধ হয় তার পরিবারকে নিয়ে যেতে এসেছেন তিনি। আমি তাকে অর্ভ্যথনা করার জন্য বাইরে এলাম। বারান্দায় আসতেই ৬-৭জন স্টেনগানধারী আমার বুকে-পিঠে-মাথায় তাদের অস্ত্র ঠেকিয়ে ঘিরে দাড়াল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমিতো হতবাক! কিছুটা অপ্রস্তুতও বটে। সামনে এসে দাড়ালেন স্বয়ং গাজী। আমি অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

-ব্যাপার কি? এ সমস্ত কিছুর মানেই বা কি?
তিনি তখন ভীষণভাবে ক্ষীপ্ত। একনাগাড়ে শুধু বলে চলেছেন,
-গাজীরে চেন না। আমি বঙ্গবন্ধু না। চল্ শালারে লইয়া চল্। আইজ আমি তোরে মজা দেখামু। তুই নিজেরে কি মনে করছস?
অশালীনভাবে কথা বলছিলেন তিনি। আমি প্রশ্ন করলাম,
-কোথায় কেন নিয়ে যাবেন আমাকে?
আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন তার অস্ত্রধারী অনুচরদের। তার ইশারায় অস্ত্রধারীরা সবাই তখন আমাকে টানা-হেচড়া করে মাইক্রোবাসের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিয়ের উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার জন্য পুলিশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে; গাড়িতে আমার এস্কট সিপাইরাও রয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত। একটা বিয়ের অনুষ্ঠান। কন্যা দান তখনও করা হয়নি। কি কারণে যে এমন অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আলম এবং চুল্লুকে মারতে মারতে একটা মাইক্রোবাসে উঠালো ৩-৪ জন অস্ত্রধারী। ইতিমধ্যে বাইরে হৈ চৈ শুনে নিম্মী এবং খালাম্মা মানে তাহমিনার আম্মা বেরিয়ে এসেছেন অন্দরমহল থেকে। খালাম্মা ছুটে এসে গাজীকে বললেন,
-ভাই সাহেব একি করছেন আপনি? ওকে কেন অপদস্ত করছেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে? কি দোষ করেছে ও?
গাজী তার কোন কথারই জবাব দিলেন না। তার হুকুমের তামিল হল। আমাকে জোর করে ঠেলে উঠান হল মাইক্রোবাসে। বাসে উঠে দেখি আলম ও চুল্লু দু'জনেই গুরুতরভাবে আহত। ওদের মাথা এবং মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। আমাকে গাড়িতে তুলতেই খালাম্মা এবং নিম্মী দু'জনেই গাজীকে বলল,
-ওদের সাথে আমাদেরকেও নিতে হবে আপনাকে। ওদের একা নিয়ে যেতে দেব না আমরা।
-ঠিক আছে; তবে তাই হবে। বললেন গাজী।
গাজীর ইশারায় ওদেরকেও ধাক্কা দিয়ে উঠান হল মাইক্রোবাসে। বেচারী খালাম্মা! বয়স্কা মহিলা, আচমকা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মাইক্রোবাসের ভিতরে। আমার দিকে অস্ত্রতাক করে দাড়িয়ে থাকলো পাঁচজন অস্ত্রধারী; গাজীর সন্ত্রাস বাহিনীর মাস্তান। গাজী গিয়ে উঠল তার কারে। বাকি মাস্তানদের নিয়ে দ্বিতীয় মাইক্রোবাসটা কোথায় যেন চলে গেল। মাইক্রোবাস দুইটি ছিল সাদা রং এর এবং তাদের গায়ে ছিল রেডক্রসের চিহ্ন আঁকা। গাজীর গাড়ি চললো আগে আগে আর আমাদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি চললো তার পেছনে। এসমস্ত ঘটনা যখন ঘটছিল তখন আমার ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা কামরুল হক স্বপন বীর বিক্রম ও বাপ্পি লেডিস ক্লাবে উপস্থিত ছিল না। তারা গিয়েছিল কোন এক অতিথিকে ড্রপ করতে। আমাদের কাফেলা লেডিস কালব থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওরা ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানতে পারে লিটুর মুখে। সবকিছু জানার পরমুহূর্তেই ওরা যোগাযোগ করল রেসকোর্সে আর্মি কন্ট্রোল রুমে তারপর ক্যান্টনমেন্টের এমপি ইউনিটে। ঢাকা ব্রিগেড মেসেও খবরটা পৌঁছে দিল স্বপন। তারপর সে বেরিয়ে গেল ঢাকা শহরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের খুঁজে বের করার জন্য। আবুল খায়ের লিটু আমার ছোট বোন মহুয়ার স্বামী এবং আমার বন্ধু। ও ছুটে গেল এসপি মাহবুবের বাসায় বেইলী রোডে। উদ্দেশ্য মাহবুবের সাহায্যে গাজীকে খুঁজে বের করা।

এদিকে আমাদের কাফেলা গিয়ে থামল রমনা থানায়। গাজী তার গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল থানার ভিতরে। অল্প কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন গাজী। কাফেলা আবার চলতে শুরু করল। কাফেলা এবার চলছে সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে। ইতিমধ্যে নিম্মী তার শাড়ী ছিড়ে চুল্লু ও আলমের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজ বেধে দিয়েছে। সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। গাজীর মনে কোন দুরভিসন্ধি নেইতো? রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে নাতো? ওর পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। কিছু একটা করা উচিত। হঠাৎ আমি বলে উঠলাম,

-গাড়ি থামাও!
আমার বলার ধরণে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল। আমাদের গাড়িটা থেমে পড়ায় সামনের গাজীর গাড়িটাও থেমে পড়ল। আমি তখন অস্ত্রধারী একজনকে লক্ষ্য করে বললাম গাজী সাহেবকে ডেকে আনতে। সে আমার কথার পর গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে গাজীকে গিয়ে কিছু বলল। দেখলাম গাজী নেমে আসছে। কাছে এলে আমি তাকে বললাম,
-গাজী সাহেব আপনি আমাদের নিয়ে যাই চিন্তা করে থাকেন না কেন; লেডিস ক্লাব থেকে আমাদের উঠিয়ে আনতে কিন্তু সবাই আপনাকে দেখেছে। তাই কোন কিছু করে সেটাকে বেমালুম হজম করে যাওয়া আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

আমার কথা শুনে কি যেন ভেবে নিয়ে তিনি আবার তার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কাফেলা আবার চলা শুরু করল। তবে এবার রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে নয়, গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি চললেন ৩২নং ধানমন্ডি প্রধানমন্ত্রীর বাসার দিকে। আমরা হাফ ছেড়ে বাচলাম। কলাবাগান দিয়ে ৩২নং রোডে ঢুকে আমাদের মাইক্রোবাসটা শেখ সাহেবের বাসার গেট থেকে একটু দূরে এলকটা গাছের ছায়ায় থামতে ইশারা করে জনাব গাজী তার গাড়ি নিয়ে সোজা গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন ৩২নং এর ভিতরে। সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্ট তখন শেখ সাহেবের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। একবার ভাবলাম ওদের ডাকি, আবার ভাবলাম এর ফলে যদি গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় তবে ক্রস-ফায়ারে বিপদের ঝুঁকি বেশি। এ সমস্তই চিন্তা করছিলাম হঠাৎ দেখি লিটুর ঢাকা ক-৩১৫ সাদা টয়োটা কারটা পাশ দিয়ে হুস্ করে এগিয়ে গিয়ে শেখ সাহেবের বাসার গেটে গিয়ে থামল। লিটুই চালাচ্ছিল গাড়ি। গাড়ি থেকে নামল এসপি মাহবুব। নেমেই প্রায় দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সে। লিটু একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষায় রইলো সম্ভবত মাহুবের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। লিটু এবং মাহুবকে দেখে আমরা সবাই আস্বস্ত হলাম। র্নিঘাত বিপদের হাত থেকে পরম করুণাময় আল্লাহ্'তায়ালা আমাদের বাচিঁয়ে দিলেন।
লিটু যখন মাহ্বুবের বাসায় গিয়ে পৌঁছে মাহবুব তখন মানিকগঞ্জ থেকে সবেমাত্র ফিরে বিয়েতে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হঠাৎ লিটুকে হন্তদন্ত হয়ে উপরে আসতে দেখে তার দিকে চাইতেই লিটু বলে উঠল,
-মাহুব ভাই সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়ি থেকে গাজী বিনা কারণে ডালিম-নিম্মীকে জবরদস্তি গান পয়েন্টে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।
একথা শুনে মাহবুব স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীকেই খবরটা সবচেয়ে আগে দেওয়া দরকার কোন অঘটন ঘটে যাবার আগে। গাজীর কোন বিশ্বাস নাই; ওর দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। মাহবুব টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ টেলিফোনটাই বেজে উঠে। রেড টেলিফোন। মাহবুব ত্রস্তে উঠিয়ে নেয় রিসিভার। প্রধানমন্ত্রী অপর প্রান্তে,
-মাহবুব তুই জলদি চলে আয় আমার বাসায়। গাজী এক মেজর আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ধইরা আনছে এক বিয়ার অনুষ্ঠান থ্যাইকা। ঐ মেজর গাজীর বউ-এর সাথে ইয়ার্কি মারার চেষ্টা করছিল। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। বেশি বাড় বাড়ছে সেনাবাহিনীর অফিসারগুলির।
সব শুনে মাহবুব জানতে চাইলো,
-স্যার গাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন মেজর ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের কোথায় রেখেছেন তিনি?
-ওদের সাথে কইরা লইয়া আইছে গাজী। গেইটের বাইরেই গাড়িতে রাখা হইছে বদমাইশগুলারে। জানালেন প্রধানমন্ত্রী।
-স্যার গাজী সাহেব ডালিম আর নিম্মীকেই তুলে এনেছে লেডিস ক্লাব থেকে। ওখানে ডালিমের খালাতো বোনের বিয়ে হচ্ছিল আজ। জানাল মাহবুব।
-কছ কি তুই! প্রধানমন্ত্রী অবাক হলেন।
-আমি সত্যিই বলছি স্যার। আপনি ওদের খবর নেন আমি এক্ষুণি আসছি।
এই কথোপকথনের পরই মাহবুব লিটুকে সঙ্গে করে চলে আসে ৩২নং ধানমন্ডিতে। মাহ্বুবের ভিতরে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেহানা, কামাল ছুটে বাইরে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে যায়। আলম ও চুল্লুর রক্তক্ষরণ দেখে শেখ সাহেব ও অন্যান্য সবাই শংকিত হয়ে উঠেন।

-হারামজাদা, এইডা কি করছস তুই?
গাজীকে উদ্দেশ্য করে গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে নিম্মী এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। খালাম্মা ঠিকমত হাটতে পারছিলেন না। কামাল, রেহানা ওরা সবাই ধরাধরি করে ওদের উপরে নিয়ে গেল। শেখ সাহেবের কামরায় তখন আমি, নিম্মী আর গাজী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। নিম্মী দুঃখে-গ্ল্যানিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। শেখ সাহেব ওকে জড়িয়ে ধরে সান্তনা দিতে চেষ্টা করছিলেন। অদূরে গাজী ভেজা বেড়ালের মত কুকড়ে দাড়িয়ে কাঁপছিল। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। রেড ফোন। শেখ সাহেব নিজেই তুলে নিলেন রিসিভার। গাজীর বাসা থেকে ফোন এসেছে। বাসা থেকে খবর দিল আর্মি গাজীর বাসা রেইড করে সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সমস্ত শহরে আর্মি চেকপোষ্ট বসিয়ে প্রতিটি গাড়ি চেক করছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিডন্যাপিং এর খবর পাওয়ার পরপরই ইয়ং-অফিসাররা যে যেখনেই ছিল সবাই বেরিয়ে পড়েছে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে মেজর ডালিম ও তার স্ত্রী নিম্মীকে। সমস্ত শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে। গাজীরও কোন খবর নেই। গাজীকে এবং তার অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদেরও খুঁজছে আর্মি তন্নতন্ন করে সম্ভাব্য সব জায়গায়। টেলিফোন পাওয়ার পর শেখ সাহেবের মুখটা কালো হয়ে গেল। ফোন পেয়েই তিনি আমাদের সামনেই আর্মি চীফ শফিউল্লাহকে হটলাইনে বললেন,
-ডালিম, নিম্মী, গাজী সবাই আমার এখানে আছে, তুমি জলদি চলে আসো আমার এখানে।
ফোন রেখে শেখ সাহেব গাজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,
-মাফ চা নিম্মীর কাছে।
গাজী শেখ সাহেবের হুকুমে নিম্মীর দিকে এক পা এগুতেই সিংহীর মত গর্জে উঠল নিম্মী,
-খবরদার! তোর মত ইতর লোকের মাফ চাইবার কোন অধিকার নাই; বদমাইশ।
এরপর শেখ মুজিবের দিকে ফিরে বলল নিম্মী,
-কাদের রক্তের বদলে আজ আপনি প্রধানমন্ত্রী? আমি জানতে চাই। আপনি নিজেকে জাতির পিতা বলে দাবি করেন। আমি আজ আপনার কাছে বিচার চাই। আজ আমার জায়গায় শেখ হাসিনা কিংবা রেহানার যদি এমন অসম্মান হত তবে যে বিচার আপনি করতেন আমি ঠিক সেই বিচারই চাই। যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আপনারা জাতির কর্ণধার হয়ে ক্ষমতা ভোগ করছেন সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ভুলুন্ঠিত করে তাদের গায়ে হাত দেয়ার মত সাহস কম্বলচোর গাজী পায় কি করে? এর উপযুক্ত জবাব আমি আজ চাই আপনার কাছ থেকে। আজ পর্যন্ত আপনি বলতে পারবেন না ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু চেয়েছি আপনার কাছে কিন্তু আজ দাবি করছি ন্যায্য বিচার। আপনি যদি এর বিচার না করেন তবে আমি আল্লাহ্‌র কাছে এই অন্যায়ের বিচার দিয়ে রাখলাম। তিনি নিশ্চয়ই এর বিচার করবেন।

আমি অনেক চেষ্টা করেও সেদিন নিম্মীকে শান্ত করতে পারিনি। ঠান্ডা মেজাজের কোমল প্রকৃতির নিম্মীর মধ্যেও যে এধরণের আগুন লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা আমার কাছেও আশ্চর্য লেগেছিল সেদিন। শেখ সাহেব নিম্মীর কথা শুনে ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলেন,
-মা তুই শান্ত 'হ। হাসিনা-রেহানার মত তুইও আমার মেয়েই। আমি নিশ্চয়ই এর উপযুক্ত বিচার করব। অন্যায়! ভীষণ অন্যায় করছে গাজী কিন্তু তুই মা শান্ত 'হ। বলেই রেহানাকে ডেকে তিনি নিম্মীকে উপরে নিয়ে যেতে বললেন।

রেহানা এসে নিম্মীকে উপরে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে জেনারেল শফিউল্লাহ এবং ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার সাফায়াত জামিল এসে পৌঁছেছে। শেখ সাহেব তাদের সবকিছু খুলে বলে জেনারেল শফিউল্লাকে অনুরোধ করলেন গাজীর পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে। জেনারেল শফিউল্লাহ রেসকোর্স কন্ট্রোল রুমে অপারেশন কমান্ডার মেজর মোমেনের সাথে কথা বলার জন্য টেলিফোন তুলে নিলেন,
-হ্যালো মোমেন, আমি শফিউল্লাহ বলছি প্রাইম মিনিষ্টারের বাসা থেকে। ডালিম, নিম্মী, গাজী ওরা সবাই এখানেই আছে। প্রাইম মিনিষ্টারও এখানেই উপস্থিত আছেন। **Everything is going to be**

all right. Order your troops to stand down এবং গাজী সাহেবের পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দাও। অপরপ্রান্ত থেকে মেজর মোমেন জেনারেল শফিউল্লাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া অফিসার এবং তার স্ত্রীকে না দেখা পর্যন্ত এবং গাজী ও তার ১৭জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের তার হাতে সমর্পন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে গাজীর পরিবারের কাউকেই ছাড়া সম্ভব নয়। শফিউল্লাহ তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু মেজর মোমেন তার অবস্থানে অটল থাকলেন শফিউল্লাহর সব যুক্তিকে অসাড় প্রমাণিত করে। অবশেষে শফিউল্লাহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রধানমন্ত্রীকে অপারেশন কমান্ডার এর শর্তগুলো জানালেন। শেখ সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন মেজর মোমেনের সাথে কথা বলতে। আমি অগত্যা টেলিফোন হাতে তুলে নিলাম,

–হ্যালো স্যার। মেজর ডালিম বলছি। Things are under control প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন তিনি ন্যায় বিচার করবেন।

– Well Dalim it's nice to hear from you. But as the Operation Commander I must have my demands met. I got to be loyal to my duty as long as the army is deployed for anti-miscreant's drive. The identified armed miscreants cannot be allowed to go escort free. As far as I am concerned the law is equal for everyone so there can't be any exception. Chief has got to understand this.বললেন মেজর মোমেন।

– Please Sir, why don't you comeover and judge the situation yourself. অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমি।

– There is no need for me to come. However, I am sending Capt. Feroz. বলে ফোন ছেড়ে দিলেন মেজর মোমেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন ফিরোজ এসে পড়ল। ফিরোজ আমার বাল্যবন্ধু। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরল।

–তুই গাজীরে মাফ কইরা দে। আর গাজী তুই নিজে খোদ উপস্থিত থাকবি কন্যা সম্প্রদানের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অনেকটা মোড়লী কায়দায় একটা আপোষরফা করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

–আমার বোনের সম্প্রদানের জন্য গাজীর বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ওকে মাফ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা হবে আমার জন্য নীতি বিরোধিতা। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি রক্তের বিনিময়ে। আমাদের গা থেকে রক্ত ঝরাটা কোন বড় ব্যাপার নয়। ইউনিফর্মের চাকুরি করি টাকা–পয়সার লোভেও নয়। একজন সৈনিক হিসাবে আমার আত্মমর্যাদা এবং গৌরবকে অপমান করেছেন গাজী নেহায়েত অন্যায়ভাবে। আপনিই আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। অবৈধ অস্ত্রধারীদের খুঁজে বের করে আইনানুযায়ী তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে। সেখানে আজ আমাদেরই ইজ্জত হারাতে হল অবৈধ অস্ত্রধারীদের হাতে! আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে কথা দিয়েছেন এর উচিত বিচার করবেন। আমরা আপনি কি বিচার করেন সেই অপেক্ষায় থাকব।

ক্যাপ্টেন ফিরোজকে উদ্দেশ্য করে সবার সামনেই বলেছিলাম, দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বিচারের ওয়াদা করেছেন সেক্ষেত্রে গাজীর পরিবারের সদস্যদের আর আটকে রাখার প্রয়োজন কি? কর্নেল মোমেনকে বুঝিয়ে তাদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করিস।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক সেই সময় শেখ সাহেব বললেন,

–আমার গাড়ি তোদের পৌঁছে দেবে।

–তার প্রয়োজন হবে না চাচা। বাইরে লিটু–স্বপনরা রয়েছে তাদের সাথেই চলে যেতে পারব।

বাইরে বেরিয়ে দেখি ৩২নং এর সামনের রাস্তায় গাড়ির ভীড়ে তিল ধারণের ঠাই নেই। পুলিশ অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। বন্ধু–বান্ধবরা যারাই জানতে পেরেছে আমাদের কিডন্যাপিং এর ব্যাপারটা; তাদের অনেকেই এসে জমা হয়েছে স্বতঃস্ফুর্তভাবে। আমাদের দেখে সবাই ঘিরে ধরল। সবাই জানতে চায় কি প্রতিকার করবেন প্রধানমন্ত্রী এই জঘণ্য অপরাধের। সংক্ষেপে যতটুকু বলার ততটুকু বলে ফিরে এলাম লেডিস ক্লাবে। মাহবুবও এল সাথে। মাহবুবের উছিলায়

সেদিন রক্ষা পেয়েছিলাম চরম এক বিপদের হাত থেকে আল্লাহ্পাকের অসীম করুণায়। বিয়ের আসরে আমরা ফিরে আসায় পরিবেশ আবার আনন্দ-উচ্ছাসে ভরে উঠল। সবাই আবার হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে বিয়ের বাকি আনুষ্ঠিকতা সম্পন্ন করে কন্যা সম্প্রদান করা হল। তাহমিনার বিয়ের রাতটা আওয়ামী দুঃশাসনের একটা ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে থাকলো। জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে থাকলো আওয়ামী নেতাদের এবং তাদের ব্যক্তিগত বাহিনীর ন্যাক্কারজনক স্বেচ্ছাচার ও নিপীড়নের। কী করে এমন একটা জঘণ্য ঘটনার সাথে গাজী সরাসরি নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পেরেছিল তার কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক পরে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছিলাম আমাদের কুমিল্লা অপারেশনের পর পার্টির তরফ থেকে শেখ মুজিবের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল আমাদের বিশেষ করে আমার ঔদ্ধত্বের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু শেখ মুজিব ঐ চাপের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, "আর্মি কোন কাঁচা কাজ করে নাই। তারা আইন অনুযায়ী সবকিছু করছে, প্রত্যেককে ধরেছে হাতেনাতে প্রমাণসহ সে ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি?" তার ঐ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ আওয়ামী নেতাদের একাংশ। আইনের মাধ্যমে যদি কোন কিছু করা না যায় তবে অন্য কোনভাবে হলেও শিক্ষা তাদের দিতেই হবে এবং সেই দায়িত্বটাই গ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ের **Top terror and most powerful leader** বলে পরিচিত গাজী গোলাম মোস্তফা। তখন থেকেই নাকি সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি জিঘাংসা মিটাতে। বিয়ে বাড়িতে বাপ্পি এবং তার ছেলেদের মাঝে যে সামান্য ঘটনা ঘটে সেটাকেই সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে গাজী চেয়েছিল আমাকে উচিত শিক্ষা দিতে। এ বিষয়ে মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি তার বই 'বাংলাদেশ! সামরিক শাসন এবং গণতন্ত্রের সংকট' এ লিখেছেন, "গাজী সমর্থক লোকদের সম্ভবতঃ মেজর ডালিম ও তার স্ত্রীকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল।"

অপহরণের ঘটনা সেনাবাহিনীতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে

সেই কালোরাত্রির পরদিন আমাকে সেনা সদরে তলব করে পাঠানো হয়।

আর্মি হেডকোয়াটার্সে উপস্থিত হয়েই জানতে পারলাম চীফ আমাকে ডেকেছেন। কিন্তু তার আগেই ডাক পড়ল জেনারেল জিয়ার অফিসে। মেজর হাফিজ তখন **PS-Cord to DCAS.** সেই আমাকে খবর দিল জেনারেল জিয়া আমার সাথে কথা বলতে চান। তিনি আমার অপেক্ষায় আছেন। অনুমতি নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। গতরাতে কি ঘটেছে তিনি জানতে চাইলেন। সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বেশ উত্তেজিতভাবেই বললেন,
-This is incredible and ridiculous. This is simply not acceptable. ঠিক আছে দেখ চীফ কি বলে।
তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই হাফিজ তার ঘরে নিয়ে গেল। নূরও ছিল সেখানে। হাফিজ বলল, "দ্যাখো ডালিম; গতরাতের বিষয়টা শুধুমাত্র তোমার আর ভাবীর ব্যাপারই নয়; সমস্ত আর্মির **Dignity, pride and honour are at stake** মানে আমরা সবাই এর সাথে জড়িত। **You got to understand this clearly ok?** অন্যান্য সব ব্রিগেডের সাথে আলাপ হয়েছে তারাও এ ব্যাপারে সবাই একমত। **This has got to be sorted out right and proper.** শেখ মুজিব কি বিচার করবে? আমরা শফিউল্লাহর মাধ্যমে দাবি জানাবো আর্মির তরফ থেকে। প্রধানমন্ত্রীকে সে দাবি অবশ্যই মানতে হবে। দাবিগুলোও আমরা ঠিক করে ফেলেছি। তুমি শফিউল্লাহ কি বলে সেটা শুনে আস তারপর যা করবার সেটা আমরা করব।"

আর্মি হেডকোয়াটার্স এ সমস্ত তরুণ অফিসারদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। হাফিজের অফিস থেকেই চীফের **ADC** -কে ইন্টারকমে জানালাম,
-I am through with DCAS so I am free now to see the Chief.
Right Sir. বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো **ADC.** কিছুক্ষণ পরই **ADC** হাফিজের কামরায় এসে জানাল চীফ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। চীফের অফিসে ঢুকতেই তিনি আমাকে বসতে বললেন। চেয়ার টেনে বসলাম মুখোমুখি।
-How are you?
-Fine Sir.
-How is Nimmi?
-She is ok Sir, but terribly upset.
-Quite natural. But she is a brave girl I must say. The way she talked to the Prime minister was really commendable. এ সমস্ত কথার পর আসল বিষয়ের অবতারনা করলেন জেনারেল শফিউল্লাহ,
-দেখ ডালিম, গতরাতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নিজেই দুঃখ এবং অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। **I am also very sorry about the whole affair.** শেখ সাহেবতো তোমাদেরও আপনজন। অত্যন্ত স্নেহ করেন তোমাদের দু'জনকেই। তিনি যখন চাইছেন তুমি গাজীকে মাফ করে দাও, তার সে ইচ্ছা তুমি পূরণ করবে সেটাইতো তিনি আশা করছেন। তুমি যদি গাজীকে মাফ কর তবে তিনি খুশী হবেন তাই নয় কি?
-স্যার, তিনি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। পারিবারিকভাবে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও আছে; সেটাও সত্য। তিনি ও তার পরিবার আমাদের ভালোবাসেন। কিন্তু নীতির ব্যাপারে আপোষ আমি করতে পারব না সেটা আপনার সামনেই তাকে আমি বলে এসেছি। **And I shall stick to that till the end.**
- Well that's up to you then. I have nothing more to tell you.

- Thank you Sir. বলে বেরিয়ে এসে দেখি চীফের অফিসের সামনে AHQ -র প্রায় সব অফিসার একত্রিত হয়ে দাড়িয়ে আছে। তারা আমার কাছ থেকে জানতে চাইলো চীফ কি বললেন। আমি আমাদের কথোপকথনের সবটাই তাদের হুবহু খুলে বললাম। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সবাই। একজন ADC কে বলল, "Go and call him out here, we want to talk to him."

ADC-র মাধ্যমে অফিসারদের অভিপ্রায় জানতে পেরে বেরিয়ে এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। সবাই তাকে ঘিরে দাড়াল। চীফ বললেন,

-বলো তোমাদের কি বলার আছে ?

-স্যার, গতরাতের ঘটনা শুধুমাত্র মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমরা আজ যেখানে দুস্কৃতিকারী দমনের জন্য সারাদেশে ডেপ্লয়েড সেই পরিস্থিতিতে বিনা কারণে গাজী ও তার সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে আমাদেরই একজন অফিসার এবং তার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনীই নয়; It has compromised the honour and the dignity of the whole armed forces particularly army. We can't take it lying. It has got to be sorted out right and proper. কথাগুলো বলল একজন। জেনারেল শফিউল্লাহ জবাবে বলার চেষ্টা করলেন,

- Well, the Prime minister is personaly very sorry about the whole affair.

- That's not enough! শফিউল্লাহকে থামিয়ে দিল একজন।

- Now Sir, you being our Chief and the leader have to shoulder your responsibility to uphold the honour and the dignity of this army. সমগ্র সেনাবাহিনীর তরফ থেকে আমাদের ৩টি দাবি আপনাকে জানাচ্ছি।

১। গাজীকে তার সংসদপদ এবং অন্যান্য সমস্ত সরকারি পদ থেকে এই মুহূর্তে অব্যাহতি দিয়ে তাকে এবং তার অবৈধ অস্ত্রধারীদের অবিলম্বে আর্মির হাতে সোপর্দ করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে; যাতে করে আইনানুযায়ী তাদের সাজা হয়।

২। গতরাতের সমস্ত ঘটনা সব প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে দেশের জনগণকে অবগত করার অনুমতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে।

৩। যেহেতু গাজী আওয়ামী লীগের সদস্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আপনাকে আমাদের এই ৩টি দাবি নিয়ে যেতে হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে এ দাবিগুলো মেনে নিতে হবে। এই দাবিগুলি আপনি যদি আদায় করতে অপারগ হন তবে You have got no right to sit on your chair. You will be considered not fit enough to lead this army.

ঘাবড়ে গিয়ে ঢোক গিলতে লাগলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। থতমত খেয়ে বেসামাল অবস্থায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু তার আগেই লেফটেন্যান্ট সামশের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম তার কোমরের বেল্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল জেনারেল শফিউল্লার পায়ের কাছে,

- We serve the army for our pride, honour and dignity. If that is not there then I hate to serve that army any longer.

উত্তেজিতভাবে উপস্থিত সবাই একই সাথে বলে উঠল,

- Sir, you got to restore our lost honour and dignity. We have had enough humiliation but no more. Sir, please don't be afraid. We all are with you. Just try to understand the gravity of the problem and be one of us.

বাইরের শোরগোল শুনে জেনারেল জিয়া কখন বেরিয়ে এসেছিলেন আমরা খেয়ালই করিনি। হঠাৎ তিনি তার গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন,

- Boys be quite and listen to me, I have heared everything and I appreciate your sentiment. I have also understood the problem. Your demands are just and fair. Shafiullah you must go with their demands to the Prime minister and make him understand the gravity of the situation and suggest him to accept the demands for the greater interest of the nation and the armed forces.

জেনারেল শফিউল্লাহ যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন,
-আমি এখনই যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তক্ষুণি তিনি বেরিয়ে গেলেন গণভবনের উদ্দেশ্যে। তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। শফিউল্লাহ চলে যাবার পর আমরাও মেসে চলে এলাম লাঞ্চের জন্য। এখানে একটা বিষয় প্রাণিধানযোগ্য। শফিউল্লাহকে যখন ঘেরাও করা হয়েছিল তখন সেখানে কর্নেল এরশাদও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য **PSO** -দের সাথে। তিনি তখন **AG (Adjutant General)** হিসাবে হেডকোয়াটার্স-এ পোষ্টেড ছিলেন। এক সময় জেনারেল শফিউল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,
-এরশাদ তোমার অভিমত কি ?
- Sir, I think their demands are quite legitimate. এ ধরণের ঘটনা আপনার কিংবা আমার সাথেও ঘটতে পারত। যেখানে **Army is deployed to maintain law and order and engaged in anti-miscreant drive** সেখানে এ ধরণের একটা ঘটনাকে শুধুমাত্র ডালিম-নিম্মীর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কানসিডার করা উচিত হবে না। **It is definitely a question of honour and prestige of the entire army and you being the Chief must make this point clear to the Prime minister and advise the PM correctly to restore the lost honour by accepting the demands.**

তার জবাব শুনে আমরা বেশ কিছুটা আশ্চর্যই হয়েছিলাম। কারণ, তিনি ছিলেন একজন **Repatriated officer** তিনি সাহস করে ঐ ধরণের স্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন সেটা আমাদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। এতেই প্রমাণিত হয় পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মাঝে অনেকেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। সন্ধ্যার দিকে চীফ ফিরলেন গণভবন থেকে; সারাদিন দরবার করে। রাত ৮টার দিকে তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন সেনা ভবনে। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল সাফায়াত এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফও উপস্থিত রয়েছেন। আমরা কুশলাদী বিনিময় করে সবাই বসলাম। চীফ শুরু করলেন,
-আমি প্রধানমন্ত্রীকে তোমাদের দাবিগুলো জানিয়েছি। তিনি সময় চেয়েছেন। প্রাইম মিনিষ্টার যখন সময় চেয়েছেন তখন তাকে সময় আমাদের দিতে হবেই। চীফের কথার মাঝে ফোঁড়ন কাটছিলেন কর্নেল সাফায়াত। ব্রিগেডিয়ার খালেদ নিশ্চুপ বসেছিলেন।
-স্যার 'তোমাদের দাবিগুলো' বলে আপনিকি এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে আপনার ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? দাবিগুলো ছিল **entire army**-র তরফ থেকে। তবে কি আমাদের বুঝতে হবে আপনি বা আপনারা মানে **the senior lots are not with us ?** জানতে চাওয়া হল জেনারেল শফিউল্লাহর কাছ থেকে। তিনি এ ধরণের কথায় একটু ঘাবড়ে গেলেন। চালাক প্রকৃতির ব্রিগেডিয়ার খালেদ অবস্থা আঁচ করতে পেরে শফিউল্লাহর হয়ে জবাব দিলেন,
- Boys don't have wrong impression. Offcourse we all are together. How could we be different on this issue?
-কিন্তু স্যার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দাবি মানবেন না। সময় চেয়ে নিয়ে তিনি প্রথমত: ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত: তার অবস্থানকে পোক্ত করার জন্যই সময় চেয়েছেন তিনি। যদি শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের দাবি মানতে রাজি না হন তবে কি করা হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানতে চাই আমরা।
তিনজনই এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন।
- Well Sir, if you don't have any idea what to do next then we shall think what needs to be done. বলে চলে এসেছিলাম আমরা। আজিজ পল্লীর এক বাসায় বৈঠকে বসলাম আমরা। বিষয়বস্তু: দাবি মানা না হলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। অন্যান্য ব্রিগেডের সাথে যোগাযোগ করে মতামত বিনিময় করা হচ্ছিল সবসময়। রাত প্রায় ১১টার দিকে খবর পেলাম জেনারেল শফিউল্লাহর সাদা ডাটসন কারে দু'জন লোক সিভিল ড্রেসে চাদর মুড়ি অবস্থায় ২নং গেইট দিয়ে বেরিয়ে ৩২নং ধানমন্ডির দিকে যাচ্ছে। একজন **young officer** -কে মোটর সাইকেল নিয়ে গাড়িকে ফলো করতে বলা হল। রাত প্রায় ১১:৩০ মিনিটে ঐ অফিসার ফিরে এসে জানাল গাড়িতে ছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ এবং কর্নেল সাফায়াত। তারা গিয়ে ঢুকেছিলেন

শেখ সাহেবের বাসায়। রাত প্রায় ১২:৩০ মিনিটের দিকে খবর আসতে লাগল শহরে রক্ষীবাহিনীর মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। দুইএ দুইএ চার; মিলে গেল হিসাব। শফিউল্লাহ এবং সাফায়াত শেখ সাহেবের একান্ত বিশ্বাসভাজন বিধায় ৩২নম্বরে গিয়ে আমাদের সন্ধ্যার আলোচনার সবকিছুই জানিয়ে এসেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে শহরে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে; আর্মির তরফ থেকে যেকোন **move** এর মোকাবেলা করার জন্য। নিজেদের প্রতি তার অনুকম্পা আরো বাড়াবার জন্যই ব্যক্তি পূঁজার এক ঘৃণ্য উদাহরণ! রাত আড়াইটার দিকে বিভিন্ন বর্ডার এলাকা থেকে খবর আসতে লাগল মধ্যরাত্রির পর থেকে ভারতীয় বাহিনীর অস্বাভাবিকভাবে তৎপরতা শুরু হয়েছে। তার মানে নিজের নিরাপত্তার জন্য শেখ মুজিব শুধুমাত্র তার অনুগত রক্ষীবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর তার তল্পিবাহক নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে স্বস্তি পাচ্ছেন না; তাই বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যও চেয়ে বসেছেন মৈত্রী চুক্তির আওতায়। আমরা কয়েকজন শহর ঘুরে দেখলাম খবরগুলো সত্যি। দুঃখ হল, পেশাগত নিজ যোগ্যতায় নয় শেখ মুজিবের বদন্যতায় যারা একলাফে মেজর থেকে জেনারেল বনে গেছেন তারা নিজেদের চামড়া পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন শেখ সাহেব এবং তার দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল; জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন তেমনি একজন। কিন্তু কথায় আছে **Exception is never an example.** ধিক্কার এসে গিয়েছিল আমাদের মনে এসমস্ত মেরুদন্ডহীন মতলববাজ সিনিয়র অফিসারদের চারিত্রিক দুর্বলতা জানার পর। পরদিন শফিউল্লাহর ডাক পড়ল গণভবনে। ফিরে এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। গত দু'দিনের তুলনায় আজ তাকে বেশি **confident** দেখাচ্ছিল,

-Well Dalim, the Prime minister has asked for time as you have been already told. Meanwhile, I am ordering a court of inquiry about the whole matter that has happened so far just for an official record. Once the court of inquiry is finished you will go back to Comilla

- Right Sir. বলে সেল্যুট করে বেরিয়ে এসেছিলাম তার অফিস কক্ষ থেকে। কি অদ্ভুত যুক্তি! দোষ করল গাজী গোলাম মোস্তফা আর **court of inquiry** হবে আমার! বর্তমান অবস্থায় চীফের হুকুম মেনে নিয়ে **court of inquiry** -র পরিণাম পর্যন্ত চুপচাপ থাকতে হবে সিদ্ধান্ত হল। **court of inquiry** শেষ করে কয়েকদিন পর কুমিল্লায় ফিরে এলাম।

রাষ্ট্রপতি আমাদের চাকুরী থেকে অবসর দিয়ে আমাদের প্রতি তার ন্যায় বিচার করলেন।

রাষ্ট্রপতি ৯নং আদেশ বলে ৮জন সামরিক অফিসারকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। নূর ও আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে।

মাসখানেক পর জুলাই মাসের শের্ষাধে এক সন্ধ্যায় আমার বাসায় একটা র্পাটি ছিল। নিমন্ত্রিত অতিথিরা প্রায় সবাই এসে গেছে। বাইরে ইলশেগুড়ির বৃষ্টি হচ্ছে। হুদা ভাবীও এসে গেছেন কিন্তু হুদা ভাইয়ের পাত্তা নেই। বেশ একটু দেরি করেই এলেন কর্নেল হুদা। ভীষণ শুকনো তার মুখ। অস্বাভাবিক গম্ভীর তিনি। এসে সবার সাথে কুশল বিনিময় করে এককোনায় গিয়ে বসলেন তিনি। বোঝা যাচ্ছিল, কারো সাথে কথাবার্তা বলার তেমন একটা ইচ্ছে নেই তার। সদা উচ্ছল হুদা ভাই এত নিরব কেন? ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকলো। এক ফাঁকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,
–কি হয়েছে হুদা ভাই? কোন অঘটন ঘটেনিতো?
–না কিছু না।
নিজেকে কিছুটা হালকা করে নেবার জন্য ড্রিংকসের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। নিম্মী অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। হঠাৎ হুদা ভাই নিম্মীকে ডেকে পাশে বসালেন। প্রশ্ন করলেন,
–আচ্ছা নিম্মী ধর এমন একটা খবর তুমি পেলে যার ফলে তোমার এই সুন্দর সাজানো সংসারটা ওলট–পালট হয়ে গেল, তোমাদের এই সুখ কেউ কেড়ে নিল তখন কি করবে?
নিম্মী অবাক বিস্ময়ে হুদা ভাইকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল,
–আজ আপনার কি হয়েছে হুদা ভাই? কী সব এলমেলো বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। বলেন না কি হয়েছে? আমিও এরি মধ্যে তাদের সাথে যোগ দিয়েছি।
–ডালিম ঢাকা থেকে কোন খবর পেয়েছ? জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল হুদা।
–নাতো। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই পেতাম। প্লিজ হুদা ভাই রহস্য বাদ দিয়ে বলেন না কি হয়েছে? ব্যাপার কি?
–যা হবার নয় তাই হয়েছে। **Presidential Order No-9 (PO-9)** প্রয়োগ করে আর্মি থেকে ৮জন অফিসারকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তুমি এবং নূরও রয়েছো এই ৮ জনের মাঝে। খবরটা অপ্রত্যাশিত; তাই হজম করতে কিছুটা সময় লাগল। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে নিম্মীকে ডেকে বললাম,
–জান, **take it easy.** নিজেকে সামলে নাও। **Don't get upset and spoil the party. Let this be over then we shall think about it. Now be brave as you have allways been and act like a good host ok?** মেয়ে মানুষ তার উপর ভীষণ স্পর্শকাতর এবং কোমল প্রকৃতি নিম্মীর। তবুও সেদিন অতিকষ্টে সব কিছুই সামলে নিয়েছিল সে। অতিথিদের কেউই কিছু বুঝতে পারেনি কি অঘটন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। খবরটা তখন পর্যন্ত কেউ জানত না। পার্টি শেষে একে একে অভ্যাগতদের সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। থেকে গেলেন শুধু হুদা ভাই ও ভাবী। ভাবীকে খবরটা দেয়া হল। খবরটা জেনে ভাবী ভেঙ্গে পড়লেন। আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি। নিম্মীও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না; ক্ষোভে–কান্নায় জড়িয়ে ধরল ভাবীকে। আমি ও হুদা ভাই দু'জনে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম। হুদা ভাই বললেন,
– **Come on now both of you hold yourselves, this is not the end of the world. Allah is there and He is great. Please stop crying and think what should be done.**
নীলু ভাবী কাঁদছেন আর হুদা ভাইকে বলে চলেছেন,
– **Gudu you must do something about this injustice. You have to do whatever nessesary. This is simply outrageous you must not take this lying noway get this very clear.**নিলু ভাবীর আন্তরিকতায় মন ভরে গেল।

- I got it Nilu I got it, please comedown. I promise you I shall go out of myway to redress this. Nimmi you too please stop crying, don't you have faith on your Huda Bhai? আমাকে বললেন,

-কাল তোমাকে নিয়ে আমি ঢাকায় যাব এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করব। নিম্মী তুমিও যাবে আমাদের সাথে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা থেকে ফোন এল। নূর বলল,

- Sir. we have been sacked under PO-9. We need your presence here as soon as possible. জবাব দিলাম,

-আমি এবং হুদা ভাই কালই আসছি। টেলিফোন রেখে দিলাম। পরদিন ব্রিগেডের সবাই খবরটা জেনে গেল। কর্নেল হুদা সকালেই CO's conference call করলেন। সেখানে তিনি বললেন,

-ডালিম এবং আমি ঢাকায় যাচ্ছি। I can assure you all that I personally shall do everything to redress this shocking injustice. এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমার অসন্তোষও কম নয়।

ঢাকায় এলাম আমরা। আর্মি হেডকোয়াটার্স এ চরম উত্তেজনা। শফিউল্লাহ অফিসে নেই। তিনি নাকি অসুস্থ। জেনারেল জিয়া আমি এসেছি জানতে পেরে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। তিনি সিট থেকে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্বল্পভাষী লোক। বললেন,

- Have faith in Allah. He does everything for the better. This is just the beginning and I am sure manymore heads will roll.

-দোয়া করবেন স্যার। ঠিকই বলেছেন সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে। বললাম আমি।

-We must keep-in touch and you can count on me for everything just as before. For any personal need my doors are always open to you.

-Thank you very much Sir, You are most kind. But you must remain alert as you are our last hope. Future will say what is there in our common destiny.

MS branch থেকে PO-9 এর লিখিত অর্ডারটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি ও নূর সেনা সদর থেকে। Retirement order টা যখন হাতে নিচ্ছিলাম তখন মনে পড়েছিল শেখ সাহেব স্বস্নেহে নিম্মীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কথা দিয়েছিলেন সুবিচার করবেন তিনি। সেই সুবিচারের ফলেই আজ আমি চাকুরিচ্যুত হলাম বিনা কারণে!

সেদিনই সন্ধ্যায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে কর্নেল হুদা গিয়ে হাজির হলেন ৩২নং ধানমন্ডিতে। অতি পরিচিত সবকিছুই। কিন্তু এবারের আসাটা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির তাই পরিবেশটা কিছুটা অস্বস্তিকর। রেহানা, কামাল সবাই কেমন যেন বিব্রত! পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য বললাম,

-কি কামাল বিয়ের দাওয়াত পাবোতো? আমার প্রশ্নে লজ্জা পেয়ে কামাল উত্তর দিল,

-কি যে বলেন বস! আমি নিজে গিয়ে আপনাকে ও নিম্মীকে দাওয়াত করে আসব। আপনাদের ছাড়া বিয়েই হবে না। রেহানা চা-নাস্তা নিয়ে এল। হুদা ভাই চুপ করে বসে সবকিছু দেখছিলেন। বাসায় ফিরে এলেন শেখ সাহেব। ডাক পড়ল আমাদের তিন তলার অতিপরিচিত ঘরেই। একাই বসে ছিলেন শেখ সাহেব। ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানাবার পর কর্নেল হুদা বললেন,

-এতবড় অন্যায়কে মেনে নিয়ে চাকুরি করার ইচ্ছে আমারও নেই স্যার। বলেই পকেট থেকে একটা পদত্যাগপত্র বের করে সামনের টেবিলের উপর রেখে তিনি বললেন,

-আমার এই পদত্যাগপত্রের Official copy through proper channel শীঘ্রই আপনার কাছে পৌঁছাবে। তার এধরণের আকস্মিক উপস্থাপনায় কিছুটা বিব্রত হয়েই শেখ সাহেব বললেন,

-তোমরা সবকিছুই একতরফাভাবে দেখ। আমার দিকটা একটুও চিন্তা কর না। একদিকে আমার পার্টি আর অন্যদিকে ওরা। আমি কি করুম? পার্টির কাছে আমি বানধা। পার্টি ছাড়াতো আমার চলব না। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন,

-তুই আর নূর কাইল আমার সাথে রাইতে বাসায় দেখা করবি।

শেখ সাহেবের সাথে কথা বলার সময় হুদা ভাইয়ের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। পরদিন জেনারেল শফিউল্লাহর অফিসে আমার ডাক পড়ল। চীফ আমাকে নির্দেশ দিলেন কুমিল্লায় আমার

আর ফিরে যাওয়া চলবে না। নিম্মীকে পাঠিয়ে জিনিষপত্র সব নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করতে হবে। কর্নেল হুদা এই নির্দেশের জোর প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু শফিউল্লাহ তার সিদ্ধান্ত বদলালেন না। কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না তিনি। কুমিল্লায় ফিরে আমি যদি আবার কোন অঘটন ঘটিয়ে বসি! এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পর যে আর্মি গঠন প্রক্রিয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম রাতদিন; সেই আর্মি থেকে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী বিদায় নেয়ার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল আমাকে। একজন সৈনিকের জন্য এই অবমাননা সহ্য করা খুবই কষ্টকর। আমি ঢাকায় রয়ে গেলাম। হুদা ভাই নিম্মী ও খালাম্মাকে নিয়ে ফিরে গেলেন কুমিল্লায়।

আমাকে কুমিল্লায় ফিরতে না দেয়ায় অফিসার এবং সৈনিকরা অসন্তোষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। একদিন দুই ট্রাক সৈনিক কুমিল্লা থেকে আমাদের মালিবাগের বাসায় এসে হাজির। আমাকে ওরা নিয়ে যেতে এসেছে। সরকার অন্যায়ভাবে ক্ষমতাবলে আমাকে চাকুরিচ্যুত করেছে; তার উপর যে রেজিমেন্ট আমি শুরু থেকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছি সেই ইউনিটের তরফ থেকে আমাকে বিদায় সম্বর্ধনাও জানাতে পারবে না ইউনিটের সদস্যরা; সেটা কিছুতেই হতে দেবে না তারা। সব বাধা উপেক্ষা করে তারা আমাকে নিয়েই যাবে। পরিণামে যা কিছুই ঘটুক না কেন; তার মোকাবেলা করা হবে একত্রিতভাবে; সে সিদ্ধান্তই নেয়া হয়েছে ইউনিটে। **Emotionally charged** অবস্থায় পরিণামের বিষয়টি উপেক্ষা করে যে পদক্ষেপ তারা নিতে প্রস্তুত হয়েছে তার ফল তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে সেটা তারা ঠিক বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পারছিলাম। তাই অনেক কষ্টে সবাইকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার যুক্তিগুলো মেনে নিয়ে অনেক ব্যাথা বুকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল তারা। ফিরে যাবার আগে আমার প্রিয় সহযোদ্ধারা বলেছিল, "স্যার আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আমরা সবসময় আপনার সাথে আছি; একথাটা ভুলবেন না কখনো। প্রয়োজনে ডাক দিয়ে দেখবেন আমরা সব বাধা পেরিয়ে আপনার পাশে এসে দাড়াব।" একজন কমান্ডার হিসাবে অধিনস্ত সৈনিকদের কাছ থেকে এ ধরণের র্দুলভ সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এর বেশি আর কি লাভ করা সম্ভব হত চাকুরিতে থাকলেও। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদভারে অনেক জেনারেল এবং কমান্ডার রয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাদের কতজনের ভাগ্যে এধরণের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জুটেছে? আবেগ এবং আত্মতৃপ্তির অনাবিল আনন্দে সেদিন নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি; খুশীর জোয়ার নেমে এসেছিল দু'চোখ বেয়ে। মনে হয়েছিল আমার সৈনিক জীবনের যবনিকাপাত অতি আকস্মিকভাবে ঘটানো হলেও স্বল্প পরিসরের এ জীবন আমার সার্থক হয়েছে। শুধু কুমিল্লা থেকেই নয়; দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকেও অফিসর-সৈনিকরা সুযোগ-সুবিধামত আসতে থাকলো সমবেদনা জানাবার জন্য। সবার একই আক্ষেপ,কেন এমন অবিচার; এতবড় অন্যায়??? জবাবে সবাইকে বলেছি, "স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। তারা ক্ষমতার দম্ভে ভুলে যায় ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়; প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই। আল্লাহতা'য়ালাই সব ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছাতেই যেকোন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে থাকে কিন্তু তার দেয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তিনিই আবার শাস্তিস্বরূপ সে ক্ষমতা কেড়ে নেন। সব অত্যাচারীর ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছে। আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন; এ ঈমানের জোর আমার আছে। আমি তোমাদের দোয়া চাই আর কিছুই নয়।"

ছোট দেশ আমাদের। সেনাবাহিনী আরো ছোট। এ সংগঠনে সবাই সবার খবর রাখে। প্রত্যেকটি অফিসার কে কি চরিত্রের; কার কতটুকু যোগ্যতা এসমস্ত খবরা-খবর সৈনিকরা রাখে। পদাধিকারে প্রাপ্য মর্য্যাদা তারা সবাইকেই দিয়ে থাকে নিয়মাফিক। কিন্তু তাদের মন জয় করা শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা লাভ করতে পেরেছে শুধুমাত্র পরীক্ষিত সৌভাগ্যবানরাই। নীতিগতভাবে পদাধিকার বলে যে সম্মান লাভ করা যায় তার চেয়ে অর্জিত সম্মানই আমার কাছে বেশি মূল্যবান; তাই চাকুরি জীবনে অধিনস্থ সবাইকে সে ধরণের সম্মানই অর্জন করার জন্য অনুপ্রানিত করার চেষ্টা করেছি সবসময়। আমার সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

হালে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন সফরকালে সেখানে রেডিওতে আমিনুল হক বাদশাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘‘আমার বাবা সেনাবাহিনী গড়েছিলেন বলেই মেজর’রা জেনারেল হতে পেরেছিলেন।’’ একটা গুরত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি। এটা অতি সত্য কথা যে, মেজর থেকে যাদের জেনারেল বানানো হয়েছিল তাদের অনেকেরই জেনারেল হবার যোগ্যতা ছিল না। কিন্তু তবুও তাদের জেনারেল বানানো হয়েছিল। এর কারণ ছিল শেখ মুজিব চেয়েছিলেন অযোগ্য নেতৃত্বের অধিনে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রাখতে এবং ঐ সমস্ত অযোগ্য ‘খয়ের খাঁ’ টাইপের জেনারেলদের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে তার ঠেঙ্গারে বাহিনীতে পরিণত করতে। কিন্তু সেটা ছিল তার দিবাস্বপ্ন মাত্র। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের উপর ঐ সমস্ত ‘জী হুজুর!’ জেনারেলরা কোন প্রভাবই বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

নিম্মী ও খালাম্মা গিয়েছিলেন কুমিল্লায়; সংসার গুটিয়ে আনতে। বাসার সব জিনিষপত্র ট্রাকে করে বাই রোড পাঠাবার বন্দোবস্ত করে তারা বাই এয়ার ঢাকায় ফিরবেন। হঠাৎ করেই ব্রিগেড গোয়েন্দা ইউনিট খবর পেলো কুমিল্লা বিমান বন্দর থেকে আওয়ামী লীগের গুন্ডারা নিম্মীকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করেছে। খবরটা পেয়েই কর্নেল হুদা কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। নিরাপত্তার সব দায়িত্ব দেয়া হল ফার্ষ্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের মেজর বজলুল হুদা এবং ক্যাপ্টেন হাইকে। কর্নেল হুদা নিজে তার ফ্ল্যাগ কারে নিম্মী এবং খালাম্মাকে সঙ্গে করে এয়ারর্পোটে এসে তাদের প্লেনে তুলে দিয়েছিলেন। প্লেন টেক অফ না করা পর্যন্ত তিনি এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। এভাবেই আমার আর্মি ক্যারিয়ারের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

ইউনির্ফম ত্যাগে বাধ্য হবার পর জীবিকা অর্জনে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি

মেজর নূর এবং আমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বপনের সাথে ব্যবসায় যোগদান করি।

আমার ছোট ভাই স্বপনের সাথেই ব্যবসা করব ঠিক করলাম। সে ব্যবসাতে অভিজ্ঞ। এমবিএ-তে ভালো রেজাল্ট করার পর থেকেই ব্যবসা করছে স্বপন। কর্নেল আকবর ও মেজর শাহরিয়ার ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছায় চাকুরি ছেড়ে দিয়েছে আমরা চাকুরিচ্যুত হওয়ার পর। মেজর শাহরিয়ার 'শ্যেরী এন্টারপ্রাইজ' নামে কোম্পানী খুলে ব্যবসা শুরু করল। কর্নেল আকবর আমাদের সাথে যোগ দিবেন ঠিক করলেন। স্বপন, কর্নেল আকবর, মেজর নূর এবং আমার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে গঠন করা হল **'SANS INTERNATIONAL'**. চাকুরিচ্যুত হওয়ায় বাধ্যবাধকতার ঝামেলা অনেক কমে গেল। অবাধে সব জায়গায় ইচ্ছামত যোগাযোগের সুযোগ পেলাম আমরা। সরকার ও সরকারি দল আমাদের প্রতি বিরূপ থাকলেও অনেক হিতৈষী এবং সুজন ব্যবসায় আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে ঝুঁকি নিয়েও অনেকে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাদের সেই সাহায্য ও আন্তরিক সহযোগিতার ঋণ কখনোই শোধ করার নয়। পরিচয় নেই এমন অনেকেও সেই দুর্দিনে নাম শুনেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহানুভূতির সাথে। ছোটখাটো ইম্পোর্ট এবং সাপ্লাই এর ব্যবসা আমাদের অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। টাকা-পয়সার আমদানি হচ্ছিল ভালোই। আইআরডিপিতে সাপ্লাই কন্ট্রাকটার হিসাবে দেশের প্রায় সব থানাতেই কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। এতে করে সব মহলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার বিশেষ সুবিধা হয়েছিল আমাদের। শহর-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে সর্বস্তরের লোকজনদের সাথে মিশে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মনোভাব বোঝার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। বুঝতে পারছিলাম সরকারের অপশাসন আর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে দেশের সাধারণ মানুষ। যেখানেই গেছি পরিচয় জেনে লোকজন সম্মান দেখিয়েছেন; শ্রদ্ধার সাথে নিঃস্বার্থভাবে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করেছেন আমাদের কাজে। এভাবেই কাটছিল আমাদের সময়।

আমাদের অন্তিম বৈঠক

শেখ সাহেব নূর এবং আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততায় সেটা সম্ভব হয়নি। আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া হলো। আমরা গেলাম তার সাথে দেখা করতে।

গেলাম আমি ও নূর ৩২নম্বরেই দেখা করতে। সালাম দোয়া বিনিময়ের পর শেখ সাহেবই শুরু করলেন,
-দেখ্ আমার কিছুই করার ছিল না। নেহায়েত অপারগ হয়েই তোদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আমাকে। জানি আমার এই সিদ্ধান্তে মনঃক্ষুন্ন হইছস তোরা; হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি তোদের জন্য কিছু একটা করতে চাই। বিদেশে দূতাবাসে চাকরি করতে চাইলে সেই ব্যবস্থা কইরা দিতে পারি। ব্যবসা করতে চাইলে নাসেররে কইয়া সে ব্যবস্থাও কইরা দিতে পারি; ওর অনেক ধরণের ব্যবসা আছে। তার সাথেও তোরা যোগ দিতে পারছ।
-চাচা আমরা সৈনিক মানুষ। সেনাবাহিনীর চাকরি স্বেচ্ছায় নিয়েছিলাম টাকা-পয়সার লোভে নয়; সম্মান এবং দেশের সেবা করার জন্যই। সেটাই যখন আপনার বিচারে হারাতে হয়েছে তখন আপনার কাছে আমাদের আর অন্য কিছুই চাওয়ার নাই। এরপরও আপনি আমাদের জন্য যদি কিছু করতে চান সেটা আপনার মহানুভবতা। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন সেটাই যথেষ্ট। রিজিকের মালিক আল্লাহ। খেয়েপড়ে বাচাঁর মত কিছু একটা করতে পারব আপনাদের দোয়ায় ইনশাল্লাহ। জানি না আর দেখা হওয়ার সুযোগ হবে কিনা? বেয়াদবী নেবেন না চাচা, একটা কথা আপনাকে বলে যাই। আপনার আশেপাশে যারাই সর্বক্ষণ আপনাকে ঘিরে রাখছে তাদের বেশিরভাগই মতলববাজ। দেশের অবস্থা এবং জনগণ সম্পর্কে তারা আপনাকে সঠিক কথা বলে না। যা শুনলে আপনি খুশী হবেন চাটুকাররা সেটাই বলে থাকে মতলব হাসিল করার জন্য। খোদা না করুক তেমন দুর্দিন যদি কখনো আসে তবে এদের কেউই আপনার সাথে থাকবে না; চলে যাবে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। তখন সেই অবস্থার জন্য সব দায়দায়িত্ব আপনার উপরই আরোপ করা হবে এবং অবস্থার মোকাবেলাও করতে হবে আপনাকেই। আপনি সবসময় বলে থাকেন যে দেশের জনগণকে আপনি ভালো করে চেনেন; কিন্তু আজ আমি বলে যাচ্ছি জনগণ থেকে বর্তমানে আপনি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন কিংবা আপনাকে করা হচ্ছে। আপনি আমাদের স্নেহ করেন। আমাদের চাকুরিচ্যুত করে আপনার কতটুকু লাভ হয়েছে সেটা আপনিই ভালো বোঝেন; তবে আমরা কিন্তু বরাবরই আন্তরিকভাবে আপনার ভালোই চেয়েছি। আল্লাহপাক আপনাকে অনেক দিয়েছেন। আপনারতো আর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই থাকতে পারে না। 'চাটার দল' ছেড়ে দেশ ও জাতির নেতা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত আপনার। তারই মধ্যে রয়েছে আপনার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ত্যাগ ও পরিশ্রমের সার্থকতা।

শেখ সাহেব আমার কথাগুলো চুপচাপ শুনছিলেন আর পাইপে মৃদু টান দিচ্ছিলেন। তিনি কিছু বলছেন না দেখে আমি বললাম,
-আমরা তাহলে এবার আসি? তিনি অনুমতি দিলেন। আমরা বেরিয়ে এলাম ৩২ নম্বর থেকে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই কথাগুলি বলেছিলাম তাকে; ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি বলেই। এর কতটুকু তিনি বুঝেছিলেন জানি না।

আর্মি এবং রক্ষীবাহিনীর প্রতি শেখ মুজিবের মনোভাব

জেনারেল শফিউল্লাহর ১৯৮৭ সালে ২৮শে আগষ্ট লন্ডনের বাংলা সাপ্তাহিক জনমত-কে দেয়া সাক্ষাৎকার যেটা পরে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে স্থানীয় দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে শেখ মুজিবের সেনাবাহিনী এবং রক্ষীবাহিনীর প্রতি তার মনোভাবের বিশদ প্রতিফলন ঘটে।

প্রশ্নঃ আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক নাকি ততটা ভালো ছিল না। কথাটা কি সত্য বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর আস্থা ছিল। কিন্তু পুরো সামরিক বাহিনীর উপর তাদের আস্থা ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

প্রশ্নঃ স্বাধীনতার পর আপনাকে কেন চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হল?

উত্তরঃ এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ওসমানী সাহেবের কোন সিদ্ধান্ত নয়।

প্রশ্নঃ রক্ষীবাহিনী গঠন করার আগে আওয়ামী লীগ সরকার এ ব্যাপারে কি আপনার সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা করেছিল?

উত্তরঃ না। তবে গঠন করার পর আমাকে বলা হয়েছিল রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসাবে। তবে লোকমুখে আমি শুনেছি যে, রক্ষীবাহিনী গঠন করা হচ্ছে আর্মড ফোর্সের জায়গা পূরণের জন্য।

প্রশ্নঃ সামরিক বাহিনীর সাথে রক্ষীবাহিনীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তরঃ সম্পর্ক ভালো ছিল না। তার কতগুলো কারণ ছিল। তখন গুজব ছড়িয়েছিল যে, রক্ষীবাহিনীকে আর্মির জায়গায় বসানো হবে। নতুন বাহিনী হিসাবে রক্ষীবাহিনীকে তখন সবকিছুই নতুন জিনিষপত্র দিয়ে সাজানো হচ্ছিল। এদিকে আর্মি দেখছে তাদের সেই পুরাতন অবস্থা। এগুলো দেখে আর্মড ফোর্সের অনেকের মনে আঘাত লাগে। যার ফলে সম্পর্কটা খারাপ রূপ নেয়। তবে এ ব্যাপারে সরকার একটা ভুল করেছিলেন, তা হল রক্ষীবাহিনীকে **'power of arrest and search'** দেওয়া। এতে সামরিক বাহিনীর অনেকেই ক্ষুব্ধ এবং চিন্তিত হন। শুধু তাই নয়; রক্ষীবাহিনী এই সময় সেনাবাহিনীর অনেক অফিসারকে লাঞ্ছনা পর্যন্ত করে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা সেনাবাহিনীর চেয়েও বেশি।

প্রশ্নঃ শেখ মুজিবর রহমান সামরিক বাহিনীর উন্নতির পক্ষে ছিলেন না, এ কথা কি সত্য?

উত্তরঃ হ্যাঁ। আমি বলবো একথা সত্য।

প্রশ্নঃ গাজী গোলাম মোস্তফার সাথে লেডিস ক্লাবে মেজর ডালিমের অপ্রীতিকর ঘটনার পর সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ হিসাবে কি কোন কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তরঃ যখন গোলমালের খবর আমি জানতে পারি তখন ডালিমের পক্ষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই এর একটা বিচারের জন্য। বঙ্গবন্ধু আমার উপর রেগে গেলেন। তখন আমি বললাম, 'বঙ্গবন্ধু আমি যদি আমার অফিসারদের জন্য না বলি তাহলে কে বলবে? গাজী গোলাম মোস্তফার এই ঘটনা আপনি তদন্ত করে দেখুন। আপনি যদি এ ব্যাপারে সাহায্য চান তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। যেহেতু ওরা গাজীর বিরুদ্ধে এবং আমিও তাদের পক্ষে, তাই গাজীর বিরুদ্ধেই বলেছি। তাই তিনি খুব খুশী হননি। তিনি শুধু বললেন, 'শফিউল্লাহ, আপনি জানেন কি যে আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন? (ইংরেজি ভাষায়) আমি বললাম, 'আমি জানি স্যার। আমি আমার জন্য কথা

বলছি না; আমি কথা বলছি আপনার জন্য স্যার। মানুষ আপনাকে সত্য বলেনি। ঐ সময় জিয়া ও সাফায়াত জামিলও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্নঃ তারপর কি হল?

উত্তরঃ তারপর আমরা ওখান থেকে কোন বিচার না পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হয়ে চলে আসি। পরে দেখা গেল সরকার মেজর ডালিমকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করলেন।

বহুদলীয় গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে বাকশালী স্বৈরশাসন কায়েম এবং গণপ্রতিরোধ

কারা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা?

’৭১ এর চেতনা, আশা, স্বপ্ন প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অন্তরে ছিল জলন্ত শিখার মত। তারা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পূনর্গঠনে অন্যান্য অবদান রাখতে পারতেন। তারা পারতেন হারানো গর্ব এবং সম্মান ফিরিয়ে আনতে পুরো জাতির জন্য ঠিক একইভাবে যেভাবে তারা স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে।

যে আশা-আকাংখা এবং স্বপ্ন নিয়ে জানবাজী রেখে একদিন দেশের স্বাধীনতার জন্য ঝাপিঁয়ে পড়েছিলেন সে স্বপ্ন আজো বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার বুকে তুষের আগুনের মতই জ্বলছে। দেশের মঙ্গলের জন্য সুযোগ পেলে আজো তারা বিশেষ অবদান রাখতে উদগ্রীব। তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আবার জনগণের সাথে সঙ্গবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন তারা। স্বাধীনতার মত সার্বিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেন স্বার্থপর জাতীয় বেঈমানদের পরাজিত করে। গড়ে তুলতে পারেন সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ। জাতিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন তাদের হারানো মর্যাদা ও গৌরব।
কারা এই মুক্তিযোদ্ধা? কি ছিল তাদের স্বপ্ন? কি হল তাদের পরিণাম? তাদের বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করা হয়েছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাঠকদের কাছে তুলে ধরবার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১৯৭১ সালে যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধ করেছিল তারা সবাই ছিলেন বাংলাদেশের খেটে খাওয়া জনগণের সন্তান। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের ছেলে মেয়েরাই সেদিন দেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। এর পেছনে তাদের কোন হীন স্বার্থ ছিল না। ছিল একটি মাত্র স্বপ্ন। হানাদারদের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শোষণহীন আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ। তাদের এ গভীর দেশপ্রেমই ছিল তাদের ত্যাগের উৎস। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ তাদের সেই নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও প্রচন্ড সাহসের ইতিহাস। তাদের সেই বীরত্ব ও ত্যাগের ফলেই স্বাধীন হল বাংলাদেশ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী মানুষের ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাঙ্খিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল না স্বাধীন বাংলাদেশে। অথচ তখনকার নেতৃত্ব যদি তাদের বিশ্বাস করে তাদের দুর্বার কর্মক্ষমতা ও আত্মত্যাগের অঙ্গীকারকে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে কাজে লাগাতে চাইতেন তবে তারা নিশ্চয়ই অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারতেন। কিন্তু তেমনটি হয়নি। তখনকার সরকার যে শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের অবিশ্বাসই করেছিল তা নয়; তাদের উপর চালানো হল নির্যাতনের ষ্টিমরোলার। একটি সশস্ত্র সংগ্রামের বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল বাংলাদেশ, নব চেতনায় জন্ম নিল একটি জাতি। কিন্তু মাত্র স্বল্প সময়ের ব্যবধানে জাতির ভাগ্যে নেমে এল চরম বিপর্যয়। দারিদ্র, হতাশা, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, নীতিহীনতা, আদর্শের পরাজয় এবং মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অবজ্ঞা এবং লাঞ্ছনা। পৃথিবীর ইতিহাসে মুক্তিকামী মানুষের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও রক্তদানের প্রতি এমন অবমাননা এবং অসম্মান বোধ হয় অন্য কোথাও দেখানো হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সর্বস্তরের জনগণ যুদ্ধ করল তবুও ঘৃণ্য অতীতই আবার ফিরে এল। মানুষের কাম্য জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হল না। জাতীয় পর্যায়ে বেঈমান ও শোষকের দলই ক্রমে দেশের কর্ণধার হয়ে বসল।

মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ করে তাকেই বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তি বলতে শুধুমাত্র ভৌগলিক স্বাধীনতা বোঝায় না। মুক্তি বলতে বোঝায়- সেই সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ তার সম্মান নিয়ে মাথা উচুঁ করে বেঁচে থাকতে পারে আপন গর্বে, দাস বা ভিক্ষুকের মত নয়। মানুষ তখনই প্রকৃত অর্থে মুক্ত হয় যখন সে তার মেধা, প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতা প্রকাশের সমান অধিকার লাভ করে। সুযোগ পায় তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা প্রকাশের এবং নিজ প্রজ্ঞা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তার ভাগ্যের উন্নতি করার। আর্থিক ও সামাজিক অধিকারে বৈষম্য থাকলে মানুষ মুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। যে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে, দু'বেলা ভাত পায় না, সে দেশের মানুষ মুক্ত কিংবা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে এ ধরণের উচ্চবাচ্য করা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেকেই বলেন, '৭১ এর যুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। আমি বলি ভারতীয় বাহিনী কেন তার সাথে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীও যদি যোগ দিত তাহলেও '৭১ এর যুদ্ধে তাদের পক্ষে পাকিস্তানকে পরাজিত করা সম্ভব হত না। কারণ জয় পরাজয় নির্ভর করে জনগণের সমর্থনের উপর। অল্প কিছু লোক এবং গোষ্ঠি ব্যতিত পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণ মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছিল বলেই দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু এই জনগণকেই তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ সরকার।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করার হুকুম মোতাবেক সমস্ত অস্ত্র জমা নেবার পর দু/তিন দিনের নোটিশে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার হাতে ৫০ টাকা করে পথ খরচা দিয়ে খোদা হাফেজ জানায় আওয়ামী লীগ সরকার। সরকার অঙ্গীকার করল মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যারা এ সার্টিফিকেট পাবে তাদের পূর্ণবাসনের জন্য চেষ্টা করবে সরকার। পরবর্তিকালে এই সার্টিফিকেট সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ না করে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগের এমপি ও নেতাদের মাধ্যমে বিলি করা হয় তাদের পছন্দের লোকদের মাঝে। যদিও এদের অধিকাংশের সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক ছিল না। যুদ্ধাপরাধী এবং দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে মাফ করে দেয় আওয়ামী লীগ সরকার। ফলে অনেক রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনীর সদস্যরা নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে সার্টিফিকেট দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বনে ঘুরে বেড়াতে থাকে সমাজের সর্বত্র। দেশদ্রোহী এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের আওয়ামী সরকার ক্ষমা করেছিল মহত্বের করণে নয় বরং অভিন্ন শ্রেণী স্বার্থে এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তাদের মদদ হাসিল করে নিজেদের হাত শক্তিশালী করতে। যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লাখ। কিন্তু ১২ থেকে ২০ লাখ সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ডজন মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে ১১জনই ভুয়াঁ। অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবমুর্তি নষ্ট করার জন্য এবং স্বাধীনতা বিরোধী দালাল চক্রকে পূনর্বাসিত করার জন্যই এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। দেশে ভুয়াঁ মুক্তিযোদ্ধাদের ভীড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রাপ্য কৃতিত্ব ও স্বীকৃতি পাবার আগেই হারিয়ে যায়।

যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে হাতিয়ার নিয়ে নিলেও সরকার যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে যে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল তাদের নিরস্ত্র করা থেকে বিরত থাকে। উপরন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের ছত্রছায়ায় ঐ বাহিনীর সদস্যরা স্বাধীনতার পরমুহুর্ত থেকেই লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাজানী, হত্যা, লাইসেন্স পারমিটবাজীতে মেতে উঠে। ভারতীয় মারোয়াড়ীদের সাথে হাত মিলিয়ে চোরাচালানেও তারাই লিপ্ত হয়। কালোবাজারী এবং মজুতদারীদের এরাই প্রটেকশন দিয়ে রাখে। পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দলীয় লুটপাটও করা হয় এই বিশেষ বাহিনীর যোগসাজসে। মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ভাঙ্গিয়ে ক্ষমতাসীন দলের সহযোগিতায় যারা সর্বপ্রকার অসামাজিক কাজ ও লুটপাট করেছিল তাদের পাপের বোঝা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের আজও টানতে হচ্ছে। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে বিনা কারণে প্রাণ দিতে হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে এখনো বিনা বিচারে কারাবন্দী হয়ে থাকতে

হচ্ছে। সরকারের ক্ষমা প্রাপ্ত লেলিয়ে দেয়া দালালরা ছাড়া পাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে লাগে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। দালালরা সবাই ছিল যার যার নিজ এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি। স্থানীয় প্রশাসন, থানা ইত্যাদির উপর এদের প্রভাব ছিল অসীম। স্বাধীন দেশের নতুন সরকার প্রশাসনিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন না করায় তাদের প্রভাবেও কোন তারতম্য ঘটেনি ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন হয়ে উঠে সঙ্গীন ও দুঃর্বিষহ।

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে দেখা যায়, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে যে সমস্ত দেশ এবং জাতি স্বাধীন হয়েছে ঐ সমস্ত সদ্য স্বাধীন দেশে জাতীয় পুর্নঃগঠন প্রক্রিয়ায় মুক্তিযোদ্ধারাই অগ্রণী ভূমিকায় থেকেছেন। নীতি নির্ধারণ করা থেকে নীতি বাস্তবায়ন করার প্রতিটি ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ অবদান রেখেছেন জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। কিন্তু আমাদের বেলায় হল ঠিক তার বিপরীত। যে চেতনা ও সংকল্প একটা মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তুলে আমাদের ক্ষেত্রে তার অভাব ছিল গোড়া থেকেই। যুদ্ধের জন্য আমরা মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। যুদ্ধটা ছিল আমাদের উপর আরোপিত। '৭১ এর ২৫শে মার্চ রাতে পাক বাহিনীর আচমকা আক্রমণের আগ পর্যন্ত বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো এবং নেতারা সবাই রাজনৈতিক সমাধানের রাস্তাই খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিলেন। এর ফলে যে কোন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যথা:- সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত নীতি আদর্শ, সংগঠন, সামরিক প্রস্তুতি এবং বিচক্ষণ নেতৃত্ব এর প্রায় সবকয়টিই ছিল অনুপস্থিত। ফলে যে নেতার নামে সংগ্রাম তিনি শুরুতেই ধরা দেন শত্রুর হাতে। আর তার সহযোগিরা নিরস্ত্র জাতিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে আশ্রয় নেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও যে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল সেটা ছিল প্রধানত: আত্মরক্ষার তাগিদে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে। তবে যারা এ ধরণের প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের সাহস ও সংকল্প ছিল অকৃত্রিম। কিন্তু যুদ্ধটা যে আকস্মিক ছিল এবং সমগ্র জাতিকে সে আকস্মিক ঘটনার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে জড়িত হয়ে পড়তে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সূত্রহীন এই আকস্মিকতার একটা মহান যুদ্ধকে সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে নেবার জন্য যে রাজনৈতিক আদর্শের প্রয়োজন সে আদর্শ গড়ে উঠার সুযোগ আমরা পাইনি। যুদ্ধের নেতৃত্ব যারা কব্জা করে নেয় তাদেরও এটা কাম্য ছিল না। দেশের আপামর জনসাধারণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরোধিতা করার জন্যই আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু জনগণের সে আশা পূরণ করা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সেটা হত তাদের শ্রেণী স্বার্থের পরিপন্থী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতারণার শিকারে পরিণত হয় মূলতঃ একারণেই। কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধে সহায়তা করেছেন তারা লক্ষ্যহীন ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছেন তাদের বিপুল অংশই ছিলেন অরাজনৈতিক ব্যক্তি। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, মা-বোন ও দেশবাসীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধের আকাঙ্খাই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল যুদ্ধে যোগ দিতে। অবশ্য আত্মরক্ষার তাগিদেও অনেকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে বেশিরভাগ লোকই স্বেচ্ছায়, আত্মত্যাগের মহৎ মনোভাব নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন করা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার কিশোর-যুবক বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধ করে বিভিন্ন সেক্টরে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা তাদের কর্মীদের নিয়ে ভারতের সহায়তায় নিজেদের নিজস্ব বাহিনী গঠন করে তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে না পাঠিয়ে তাদের অতি সযত্নে সংরক্ষিত করে রাখে স্বাধীনতা উত্তরকালে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। প্রকৃতপক্ষে ন'মাসের আগাগোড়া যারা যুদ্ধ করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল অরাজনৈতিক সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়ে। তারা ছিল সরলমনা। তাই যুদ্ধ শেষে বিনা দ্বিধায় তারা তাদের অস্ত্র জমা দিয়ে দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশে অস্ত্রের দাপট, পারমিটবাজী, লুটতরাজ, হাইজ্যাক, গুম, খুন, ধর্ষণ ও অন্যান্য দুঃষ্কর্মে এসব নিবেদিত প্রাণ ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সামান্য। রাজনৈতিক চেতনার অভাবে শক্তি থাকা সত্ত্বেও এরা সংগঠিত হতে পারেননি। বাংলাদেশের বিশাল জনসমুদ্র থেকে এসে তারা আবার জনসমুদ্রেই মিশে যান। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে সুষম আর্থসামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করার মত শক্তি তাদের ছিল। এটা আঁচ করতে পেরেই আওয়ামী

লীগ সরকার শংকিত হয়ে পড়ে এবং দেশে ফিরে প্রথমেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। একই সাথে সুখী ভবিষ্যতের কথা বলে তাদেরকে ভাওতা দেয়। এভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের চুড়ান্ত বিজয়ের পর যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পুর্নগঠনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং সেই সঙ্গে সূর্য্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সমাজে সসম্মানে পূর্ণবাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ইস্কাটন লেডিস ক্লাবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংসদের আহ্বানে দ্রুত দেশের প্রতিটি থানায় এবং ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অঙ্গ সংগঠন গড়ে উঠে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে এই সংগঠনের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন হয় এবং ঐ অধিবেশনে একটি গঠনতন্ত্র এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হয়। এই কমিটির লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশের তৎকালীন গণবিরোধী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন সরকার এবং ধোকাবাজীর রাজনীতির হাতছানি মারাত্মক অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। সরকারের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে কয়েকজন কাউন্সিল সদস্য সরকারি প্ররোচণায় সংসদের গঠনতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সংসদকে আওয়ামী সরকারের লেজুড়ে পরিণত করার উদ্যোগ নেন। জাতীয় নির্বাহী পরিষদের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া সত্ত্বেও নতুন নির্বাচনের বিধানকে আমল না দিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঐ চক্র এক কোরাম সভায় গঠনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে বৈধ জাতীয় নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি পরে ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের এক সভায় জনধিকৃত বাকশালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের যোগদানের কথা ঘোষণা করে। সংসদের আদর্শ জলাঞ্জলী দিয়ে সংসদের গঠনতন্ত্রের অবমাননার দায়ে জনাব নঈম জাহাঙ্গীর ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পচাঁত্তরের মার্চ মাসেই ঢাকা মুন্সেফ কোর্টে ঐ অবৈধ পরিষদ গঠনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। কোর্ট ইনজাংশন জারি করে অবৈধ পরিষদের গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। ফলে সংসদ বাকশালের রাহুগ্রাস থেকে সাময়িকভাবে বেচে যায়। ইনজাংশন জারি করলেও কোর্ট সরকারের রোষ এড়াবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মামলার রায় প্রদান স্থগিত রাখে।

ঐক্য প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি

স্বৈরাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্য জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য ছিল অপরিহার্য। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও সেই ঐক্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

সরকারি দল ও তাদের পেটোয়া বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো তাদের সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সর্বহারা পার্টি এবং জাসদের কর্মীরাই সরকার বিরোধিতায় মারাত্মকভাবে তৎপর। অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রগতিশীল সংগঠনগুলো তাদের সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়ছে। জনগণ সাধারণভাবে আওয়ামী ঐক্যজোটের বিরুদ্ধে। ঐক্যজোটের স্বৈরাচারী নির্যাতনে জীবন ও জীবিকার তাগিদে সবাই দিশেহারা। জাসদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, লেনিনবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি, সর্বহারা পার্টি, জাতীয় লীগ ইত্যাদি দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং তাদের গোপন সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে। তাদের মধ্যে সরকার বিরোধিতার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে ঐক্যমতও রয়েছে। জনগণও আজ পিছিয়ে নেই। তারাও আজ আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরপরও কোন একটি দলের পক্ষেই পর্যাপ্ত পরিমাণের শক্তি এবং প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে না সরকারি নিষ্পেষণের কারণে। ফলে জনগণ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের পেছনে দাড়াতে ভরসা পাচ্ছে না। তারা এটাও লক্ষ্য করছে যে, বিরোধী দলগুলো মোটামুটিভাবে সরকার বিরোধী একই রকমের বক্তব্য রাখছে; একইভাবে সরকারের বিরোধিতা করছে কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না। দলগুলোর মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য না থাকায় এবং তাদের বক্তব্য এবং মতামতের মধ্যে একটা মৌলিক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়ায় তারা চাইছিল সব বিরোধী দল এবং সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হোক। এ ব্যাপারে কিছু নির্দলীয়, রাজনৈতিকভাবে সচেতন, দেশপ্রেমিক ব্যক্তি নিজেরা উদ্যোগ নিয়েছিল ঐধরণের একটা ঐক্য প্রচেষ্টার। লেখকেরও এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বিরোধী দলগুলোর কোনটাই সরকারের নির্যাতন এবং দমন নীতির মুখে এককভাবে দাড়াতে পারবে না; এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত ছিল না। গণআন্দোলন এবং সরকার বিরোধী সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে পর্যায়ক্রমে; এ ব্যাপারেও ঐক্যমত ছিল। এই দু'টো মূল বিষয়ই ছিল ঐক্য প্রচেষ্টার ভিত্তি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং আগামী দিনগুলোতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে কারো পক্ষেই শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না বরং দলগুলোর বিলুপ্তি ঘটারই সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; এ বিষয়টিও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। তাছাড়া সরকার যেভাবে দেশে প্রকাশ্য রাজনীতির পরিধি ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত করে আনছে তাতে করে অচিরেই আগামীতে দেশে একদলীয় শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে। সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে সরকার বিরোধী কিছু করতে গেলে তাতে শক্তিক্ষয়ই ঘটবে কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। গোপনে বৈঠকের পর বৈঠক চললো। আলোচনাকালে বোঝা গেল ঐক্যের পক্ষে যারা; তারা শীর্ষ নেতাদের জন্য তেমনভাবে তাদের মতামতও প্রকাশ করতে পারছিলেন না। সারকথা, বুঝতে পারা যাচ্ছিল ঐক্যের পথে মূল বাধা নেতারা। আবিষ্কার করতে পারলাম এর কারণও রয়েছে অনেক:- নেতৃত্বের কোন্দল, অতীতের তিক্ততা, অবিশ্বাস, নেতাদের বিভিন্ন দুর্বলতা এবং নীতিগত ভুলের জন্য অতীতের ব্যর্থতা। এসব জটিল সমস্যাগুলোর উর্ধ্বে উঠার মত মানসিকতা নেতাদের মাঝে নেই। তার উপর ঐক্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে নেতৃত্বের কোন পদে কে থাকবেন; সেই প্রশ্নটি। নেতাদের সবাই যার যার হাতে সাড়ে তিন হাত! সবাই নিজেকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করছেন। এ ধরণের মনোভাব এবং পরিস্থিতিতে কোন ঐক্য গড়ে তোলা অসম্ভবই নয় অবাস্তবও বটে। তাই আমরা সেই উদ্যোগ থেকে সরে দাড়াব ভেবেছিলাম এক সময়। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হল ভেঙ্গে পরলে চলবে না; ধৈর্য্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সব নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ থাকলেও তাদের প্রত্যেকেই আমাদের আন্তরিকতার তারিফ করেছিলেন। পরিশেষে আমাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একদিন কর্নেল আকবর এসে বললেন যে, এদের নিয়ে কোন ঐক্য গড়ে

তোলা কিছুতেই সম্ভব নয় বলেই তিনি, কাজী জাফর, মেনন এবং রনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার। এই দলে আমাকে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে যোগদানের প্রস্তাব দিলেন তিনি। জবাবে আমি বলেছিলাম, "এত তাড়াতাড়ি হতাশ হলেতো চলবে না; ঐক্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যেখানে পুরনো দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে তাদের অস্তিত্বই বজিয়ে রাখতে পারবে না বলে মনে করা হচ্ছে সেখানে আর একটি নতুন দল করে লাভটা কি হবে? এরপরও আপনারা দল করতে চান ভালো কথা; তবে আমার জন্য এই মুহূর্তে র্নিদলীয় থাকাটাই উচিত হবে বলে মনে করি। আপনাদের দলে যোগ না দিলেও সময়মত আমরা সবাই একত্রিত হব কোন বৃহত্তর স্বার্থে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" এর অল্প কয়েকদিন পরেই United People's Party (UPP) আত্মপ্রকাশ করে। কর্নেল আকবর সেই পার্টিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন। এরপরও আমাদের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে।

সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে বিয়ে হলো শেখ ভাত্রিদ্বয়ের!

যখন হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরছে তখন শেখ কামাল এবং শেখ জামালের বিয়ে হলো সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর একদিন শেখ কামাল এবং শেখ রেহানা সত্যিই এল আমাদের মালিবাগের বাসায় বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাতে। দুই ভাইয়ের একই সাথে বিয়ে। শেখ জামাল ইতিমধ্যে যুগোস্লাভিয়ায় গিয়েছিল সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে কিন্তু ওখানকার পরিবেশ ভালো না লাগায় পরে কিছুদিন স্যান্ডহার্টসে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে কমিশন্ড অফিসার হিসাবে যোগ দিয়েছে জেনারেল শফিউল্লাহর নিজস্ব ইউনিট ২য় ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে কিছুটা নিয়ম বর্হিঃভুতভাবেই। বিয়ে হয়েছিল নতুন গণভবনে। বিশাল আয়োজন। অগুনিত অতিথির ভীড়। মনে হচ্ছিল পুরো ঢাকা শহরটাই এসে উপস্থিত হয়েছে বিয়েতে। বর্নাঢ্য জাকজমক পরিবেশে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। বিয়ের মন্ডপে কামাল-জামাল দুই ভাই সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে বর সেজে বসেছিল। বিয়ের পরদিন প্রায় সবগুলো দৈনিক পত্রিকায় বড় করে ছাপানো হল প্রধানমন্ত্রীর দুই ছেলের সোনার মুকুট মাথায় পড়ে বিয়ের খবর। একই পাতায় ছাপানো হয়েছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট, হাড্ডিসার মুমুর্ষ মানুষ নামি কঙ্কালের ছবি এবং দুর্ভিক্ষের খবর। ১৯৭২ সালে কোন এক বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, "কবে যে বাংলাদেশের মেয়েরা স্বর্নালঙ্কার বাদ দিয়ে বেলী ফুলের মালা পড়ে বিয়ে করবে!" তার এই খায়েশটাও বেশ ফলাও করে বেরিয়েছিল খবরের কাগজগুলোতে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের কথা আর কাজের মধ্যে কত তফাৎ! বিয়ের ব্যাপারটা হয়তো বা ছোট কিন্তু এ বিষয়টি বেশ আলোচিত হয়েছিল সব মহলেই।

সিরাজ সিকদারের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল

ঢাকার তদানীন্তন পুলিশ সুপার মাহবুব সরল বিশ্বাসে বন্ধু হিসেবে আমাকে হুশিঁয়ার করে দিয়েছিল এবং বলেছিল, সিরাজ সিকদার খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে।

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে আমার ছোট ভাই স্বপনের বিয়ে ঠিক হল আমারই ফুপাতো বোন গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামালুদ্দিনের কন্যা মুন্নির সাথে। এয়ারফোর্স মেসে রিসেপসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইখানে এসপি মাহবুব এক ফাঁকে আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল,
– ডালিম বন্ধু হিসাবে একটা কথা বলছি কিছু মনে করিস না। ওর কথার ধরণ দেখে বললাম,
– ভনিতা ছেড়ে আসল ব্যাপারটা কি বলে ফেলতো।
– দেখ্, আমি চাইনা তোর কোন বিপদ হোক। বন্ধু হিসাবে তোকে সাবধান হতে অনুরোধ করছি। **Please be careful.** কিছুদিনের মধ্যেই সিরাজ সিকদার ধরা পড়বে। **This is certain. But I don't care about it, what is bothering me is that during interrogation of one of his close associate your name has also come up This is certain. But I don't care about it, what is bothering me is that during interrogation of one of his close associate your name has also come up.** তার এক **close comrade** এর নোটবুকে তোর নাম পাওয়া গেছে।
– কারো নোটবুকে আমার নাম পাওয়া গেলে আমি কি করতে পারি? প্রশ্ন করলাম আমি।
– **Well you are matured enough.** আমি বলছি **please be very very careful about your movements and be causcious about the people you meet that is what is needed. I am pretty serious, do you understand?** আমাদের দু'জনকে একসাথে দেখতে পেয়ে একজন বেয়ারা এসে জানাল খাবার দেয়া হয়েছে। দু'জনেই খাবারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। খাচ্ছিলাম আর মাহবুবের কথাগুলোর বিষয়ে ভাবছিলাম। যতটুকু সম্ভব স্পষ্ট ঈঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে মাহবুব। আরো সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হবে আমাকে। সরকারের বিশেষ মহলের সুনজরে পরে গেছি। অতএব সাবধান! খুব সাবধান হতে হবে আমাকে। খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে সিরাজ সিকদার; এ কথাটা এত জোর দিয়ে কি করে বলতে পারলো মাহবুব? তবে সরকার নিশ্চয়ই কোন ফাঁদ পেতেছে; যে ফাঁদ বুঝতে না পেরে সিরাজ সিকদার ধরা পড়বে। নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে মাহবুবের মত লোক এত দৃঢ়তার সাথে কথাটা বলতো না। সংবাদটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশ্লিষ্ট মহলে পৌঁছে দিতে হবে। সাবধানের মার নেই। পরদিনই খবরটা জায়গামত পৌঁছে দিয়ে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। জবাব পাওয়া গিয়েছিল তেমন কোন আশঙ্কার কারণ নেই।

মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকায় টয়েনবি র্সাকুলার রোডের উপর আমাদের **SANS International** এর অফিস। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে নিত্য নানা ধরণের লোক আসা–যাওয়া করছে। বিভিন্ন ধরণের লোকজন আসতো আমাদের অফিসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীরাও আসতো জনতার স্রোতে মিশে। সে অবস্থায় কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির নোটবুকে আমার নাম পাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু যেটা ভাবনার বিষয় সেটা হল, সর্বহারা পার্টির গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তির নোটবুকে আমার নাম পাওয়া গেছে; সেটাই আশঙ্কার বিষয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও আমার যোগাযোগ রয়েছে সে বিষয়ে কিন্তু মাহবুব কিছুই বলল না। তবে কি বুঝে নিতে হবে সর্বহারা দলের সদস্যদের সাথে আমিও সরকারের **priority target** -তে পরিণত হয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হল। সবাই মত প্রকাশ করল মাহবুবের ঈঙ্গিতকে হালকাভাবে দেখা ঠিক হবে না। উপযুক্ত নিরাপত্তার সাথেই আমাকে চলাফেরা করতে হবে। তবে জীবনের স্বাভাবিকতাও বজিয়ে রাখতে হবে। যেকোন অস্বাভাবিক আচরণ সরকারি মহলকে আরো সন্দিহান করে তুলবে।

চাকুরীচ্যুত হওয়ার পরও জনাব তাজুদ্দিন আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

যদিও তাজুদ্দিন আহমদের নীতিসমূহ আমরা যুদ্ধকালীন সময় সমর্থন করিনি তবুও তার কিছু ব্যক্তিগত গুনাবলীর জন্য আমরা তাকে সম্মান করতাম। তার চাকুরিচ্যুতির খবর জানামাত্র আমি সেদিন সন্ধ্যায় তার সরকারি বাসভবনে দেখা করতে যাই।

তিনি বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য গোছগাছ করছিলেন। বাড়ির লনে বসেই আলাপ হল। আলাপ শেষে বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক তখন তিনি হঠাৎ করে জানতে চাইলেন, ভবিষ্যতে যোগাযোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাঁর সাথে দেখা করব কিনা? জবাবে বলেছিলাম, আমার তরফ থেকে কোন বাধা নেই। ঠিক হল যোগাযোগ হবে গোপনে।

একদিন অফিসে বসে আছি হঠাৎ আমার চাচা শ্বশুড় জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি-লেখক-সাংবাদিক এবং পাকিস্তান আমলে দৈনিক পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ টুডের মালিক) এসে হাজির। অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে দেখে স্বসম্ভ্রমে উঠে দাড়িয়ে তাকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,
-কাক্কু, আপনি হঠাৎ কি মনে করে? খবর দিলেইতো পারতেন আমি নিজে গিয়ে দেখা করে আসতাম।
-বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। তাজুদ্দিন তোমার সাথে জরুরীভাবে দেখা করতে চায়। সম্পর্কে কাক্কু এবং তাজুদ্দিন সাহেব ভায়রা ভাই।
-কোথায়? জানতে চাইলাম।
-তাঁতিবাজারে।
-লাঞ্চের পর আগামীকাল আমি আর নূর আসব। তিনি চলে গেলেন। পরদিন সময়মত গিয়ে পৌঁছতেই দেখি জনাব তাজুদ্দিন অপেক্ষা করছেন। আমরা দুইজনই তার বিশেষ পরিচিত। দোতালার একটি নিভৃত কক্ষে আমাদের বৈঠক শুরু হল কুশলাদি বিনিময়ের পর।
-দেশের অবস্থা সম্পর্কে কি মনে করছেন? প্রশ্ন করলেন তিনি।
-যে দেশ বানিয়েছেন তার সর্ম্পকে ভাবনার কি কোন অন্ত আছে?
-দেশতো আপনারাই স্বাধীন করেছেন।
-তাই কি? আমরাতো এভাবে দেশ স্বাধীন করতে চাইনি সেটা আপনার চেয়ে বেশি আর কারো জানার কথা নয়। চুপ করে ছিলেন তিনি। আমি বললাম,
-তাজুদ্দিন সাহেব '৭১ এর আমাদের যুক্তিগুলোর সত্যতাই কি ক্রমান্বয়ে এই বাংলাদেশে সত্যে পরিণত হচ্ছে না? যাক অতীত নিয়ে আলোচনা না করে বলেন কেন ডেকে পাঠিয়েছেন? সরাসরি প্রশ্ন করলাম তাকে।
-দেশটাকে বাচাঁতে হবে।
-অবশ্যই। তবে কি করে?
-জনগণের মুক্তি আনা সম্ভব সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই।
-এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। সারাজীবন আপনারা বুর্জুয়া রাজনীতি করে এসে এখন সমাজতন্ত্র করবেন সেটা কি করে সম্ভব? আর জনগণই তা বিশ্বাস করবে কেন? আওয়ামী লীগতো একটা বুর্জুয়া সংগঠন। শেখ মুজিব কেন, কেউই এ দলের মাধ্যমে প্রকৃত সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে পারবে না। আপনিও এ সত্য এতদিনে নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হল বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে সমাজতন্ত্রের নামে আপনারা যে বিভীষিকা তুলে ধরেছেন তাতে আগামী ৫০ বৎসরেও সমাজতন্ত্রের কথা শুনলেই এদেশের লোক আতঁকে উঠবে। তাছাড়া গ্রামে-গঞ্জে সাধারণভাবে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার আলোকে বলব আমাদের জনগণ সাম্প্রদায়িক

নয় এটা ঠিক; তবে তারা সমভাবেই ধর্মভীরু। আপনারা আপনাদের রাষ্ট্রীয় চার নীতির কোনটাই গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেননি আপামর জনসাধারণের কাছে। বাংলাদেশ বলতে ঢাকা, চিটাগাং বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি ৬৪ হাজার গ্রাম যেখানে বাস করে ৯৫% লোকজন। সমাজতন্ত্রের তত্ব এ দেশের গণমানুষের কতটুকু উপকার করবে তা জানি না তবে অল্প বিদ্যায় যতটুকু বুঝি এ দেশের লোকজনকে নজর আন্দাজ করার অবকাশ নেই। উপর থেকে তাদের উপর জোর করে কিছুই চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষ রক্ত মাংসের গড়া। তার জৈবিক এবং বাচাঁর চাহিদার পাশাপাশি মনের এবং আত্মিক চাহিদাও রয়েছে। মানুষ মেশিন নয়। এ সত্য বাদ দিয়ে কিছু করলে সেটা হবে নেহায়েত ক্ষণস্থায়ী। থাক, তা আপনি বলুন আপনার রাজনৈতিক পরিকল্পনা কি? আপনি একজন সুশিক্ষিত সৎ ব্যক্তি। আপনার রাজনৈতিক দর্শনের সাথে একমত না হলেও এতটুকু আস্থা রাখতে পারেন, আমরা আপনাকে একজন ভাল মানুষ বলেই মনে করি। আর একটা কথা আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত আমাদের জন্য যদি কিছু করে থাকে তবে সেটা তার স্বার্থেই সে করেছে। তবুও আমরা তাকে কৃতজ্ঞতা জানাব জাতি হিসাবে। কিন্তু ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কি করে আমাদের সহায়ক শক্তি হতে পারে? সেটাতো তাদের নিজস্ব স্বার্থের পরিপন্থী। এদের প্রতি আপনি দুর্বল এ কথা সবাই জানে। এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকেই আপনার অভিমত আমরা জানতে চাই। আর সমাজতন্ত্রের দর্শন অনুযায়ী এটা কায়েম করা যায় শুধুমাত্র সর্বহারা দলের নেতৃত্বে। আপনার দল কোনটি সেটাও আমাদের জানা দরকার। গম্ভীরভাবে আমার বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন জনাব তাজুদ্দিন। রাজনীতি নিয়ে এটাই ছিল আমাদের প্রথম বিশদ আলোচনা।

-রাজনৈতিকভাবে আপনারা সবাই কি এতটা সচেতন?

-সবাই বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন সেটা জানি না, তবে সেনাবাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ রাজনৈতিকভাবে অবশ্যই সচেতন।

-খুব খুশি হলাম জেনে। **I can see some silver lining over the dark clouds.** সমাজতন্ত্রের নীতিতে আমি বিশ্বাসী। তবে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন পদ্ধতি সব দেশেই সেদেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেই বের করতে হয়। ভারত একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। তাদের দেশের অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের যে প্রভাব রয়েছে সেটা অবশ্যই সোভিয়েত মডেলের নয়। গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী দেশ ভারত নীতিগতভাবে আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলায়ও এ কথাই বলা চলে। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব রকম সাহায্য করে চলেছে। রুশ বিরোধিতার মূলে কাজ করছে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাদের এ চক্রান্ত কি দেশের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনবে?

-দেখেন স্যার, আমি সে সমস্ত মানুষের মনোভাব আপনাকে জানিয়েছি যারা সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ দু'টো শব্দ ঠিকমত উচ্চারণও করতে পারে না; বোঝাতো দূরের কথা। এ সমস্ত আলোচনাতো শহুরে তথাকথিত বুদ্ধিজীবি সমাজের মাঝেই সীমিত। তারা জনগণের ১ কিংবা ২%ও নন। আমরা মনে করি ভারত প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক দেশ নয়। গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে সেখানে গত ২৫ বছর ধরে চলেছে এক পার্টির তথা এক পরিবারের শাসন। শ্রীমতি ইন্দীরা গান্ধী 'অখন্ড ভারত' নীতির বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অনেকেই তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু আজ কিছুতেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ হিসাবে **viable** হয়ে উঠুক সেটা ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার কোনমতেই সমর্থন করতে পারে না। পরিবর্তে তারা চেষ্টা করবে আমাদের অর্থনীতিকে ভারতের অর্থনীতির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আমাদের উপর তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে। মানে আমাদের অবস্থা হতে হবে ভুটান বা সিকিমের মত। এতে করে ভারতের অভ্যন্তরে কেন্দ্রিয় শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অঙ্গার আজ জ্বলে উঠেছে তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া যাবে যে, স্বাধীন সত্বা হিসেবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপমহাদেশের কোন জাতির পক্ষেই আজ স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। ভারতের আজ্ঞাধীন হয়েই বেচে থাকতে হবে তাদের। বাংলাদেশকে সব ব্যাপারে তাদের উপর নির্ভরশীল

করে তুলতে পারলে ঐ সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাটা পড়বে। আর আমরা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বিশ্বের বুকে দাড়াতে সক্ষম হই তবে সেই সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অঙ্গার দাবানলে পরিণত হয়ে ভারতকে টুকরা টুকরা করে ফেলবে অল্প সময়ের মধ্যেই। 'অখন্ড ভারতের' স্বপ্ন কর্পুরের মত উড়ে যাবে। যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলগুলো আজ ভারতীয় কেন্দ্রিয় দুঃশাসনের নিষ্পেষনে জর্জরিত সেখানে তাদের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হলে আমাদের অবস্থা কি হবে? বরং অধুনাকালে ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা তৈরি আজকের ভারত যদি সনাতন রূপ পরিগ্রহ করে তবেই আমাদের লাভ। শুধু আমাদেরই নয় এ ভূ-খন্ডের বিভিন্ন জাতিসত্বারও লাভ। বর্হিঃশক্তির শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য উপমহাদেশের স্বাধীন রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে অখন্ড ভারত সৃষ্টি করার ফলেই আজ বিকশিত হচ্ছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো। এই দ্বন্দ্বের অবসানের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব এ অঞ্চলে সত্যিকারের স্থিতিশীলতা অর্জন করা। এর কোন বিকল্প নেই। ভারত একটি বহুজাতিক দেশ সেটাই বাস্তবতা। আমার বক্তব্য শুনে জনাব তাজুদ্দিন বললেন,

-ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

তার রাজনৈতিক দল হিসাবে জাসদের প্রতি ঈঙ্গিত করলেন তিনি। জবাবে আমি বলেছিলাম,

-জাসদ অবশ্যই আজ সরকার বিরোধী সংগ্রামে একটি অগ্রণী ভূমিকায় আছে। তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথাও বলছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসা এ দল সৃষ্টিকারীরা সত্যিই কি সমাজতন্ত্রী? তাদের নেতৃত্বের প্রায় সবারই আগমন ঘটেছে বুর্জুয়া কিংবা পেটি বুর্জুয়া শ্রেণী থেকে। কতটুকু তারা নিজেদের **De-class** করতে সক্ষম হয়েছে সেটা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। ঠিক এই মুহূর্তে জাসদকে একটি সর্বহারার দল হিসাবে চিহ্নিত করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এভাবেই সেদিনের বৈঠক শেষ হয়। ভবিষ্যতে আবার আলোচনায় বসবো ঠিক করে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। তত্ত্বগত দিক থেকে জাসদের নেতৃবৃন্দেরও একটি অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ বলে মনে করত। তাদের ধারণা অনেকটা জনাব তাজুদ্দিনের মতই। মানে রুশ এবং ভারত বাংলাদেশের গণমুক্তি এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি। কিন্তু জাসদের সাধারণ সদস্যদের বৃহৎ অংশই ছিলেন ভারত বিরোধী। পরবর্তিকালে জাসদের অবক্ষয়ের জন্য অন্যান্য কারণের সাথে এই দ্বন্দ্বটিকেও একটি প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা চলে। নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ভারত নীতি নিয়ে দ্বিমত ছিল সেটাও আমরা জানতাম। সেদিন জাসদের সাথে জনাব তাজুদ্দিনের সম্পর্কের কথা জেনে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে দেখা দেয়। তবে কি জাসদ সত্যিই ভারতের 'বি' টিম? তাই যদি না হবে, তবে কোন যুক্তিতে জাসদ জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্ব মেনে নেবে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে হবে। নারায়ণগঞ্জে কর্নেল তাহেরের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম একদিন। তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করার ফাকে জেনে নেবার চেষ্টা করলাম জনাব তাজুদ্দিনের সাথে জাসদের সম্পর্ক কি? তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানালেন যে, জনাব তাজুদ্দিনের সাথে জাসদের কোন সম্পর্ক নেই। এতে ঘটনা আরো ঘোলাটে হয়ে উঠল। হয়তো কর্নেল তাহের এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না কিংবা জাসদের হাইকমান্ডের সাথে কোন গোপন বিশেষ মাধ্যমের সাহায্যে জনাব তাজুদ্দিন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন যা জাসদ নেতৃবর্গের অনেকের কাছ থেকেই গোপন রাখা হয়েছে। আমাদেরই আর একজন জাসদের জনাব শাহজাহানের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। জনাব শাহজাহানও একই জবাব দিয়েছিলেন, জাসদের সাথে জনাব তাজুদ্দিনের পার্টিগত কোন সম্পর্ক নেই।

কয়েকদিন পর জনাব তাজুদ্দিনের সাথে আমাদের দ্বিতীয় বৈঠক হয়। সে বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা হয়। আমি গত বৈঠকের জের টেনে বলেছিলাম,

- বাংলাদেশের তিনটি জিনিস ভারত কখনো মেনে নিতে পারবে না:-

১. বাংলাদেশে স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে উঠুক।
২. বাংলাদেশে একটি ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হোক।
৩. পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা এক হয়ে একটা ভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হোক।

এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলে জনাব তাজুদ্দিন বলেন,
-ভারত উপমহাদেশ তুলনামূলকভাবে একটা পরাশক্তি; এ সত্যকে পরিহার করলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যই ভারতের সাথে একটা সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজিয়ে চলতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি নেপালকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,
-নেপালের সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বহুলাংশে নেপাল অর্থনৈতিক বিষয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল তাই বলে নেপালের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপরতো ভারত হস্তক্ষেপ করেনি। জবাবে আমি বলেছিলাম,
-নেপাল একটি হিন্দু রাষ্ট্র। আমার জানামতে নেপালের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব অত্যন্ত প্রচন্ড। কিন্তু নেপাল ও বাংলাদেশ কি এক? বাংলাদেশ ১০কোটি মুসলমানের দেশ। এটাওতো একটা বাস্তব সত্য। এ জাতি সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে পাকিস্তানের শোষকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য; দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়ার জন্য নয়। অস্তিত্ব হবে সম্পূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থে স্বাধীন স্বকীয়তায়। সেটাই এদেশের জনগণের আশা ও অঙ্গীকার। জনগণের এ চেতনাকে সাংগঠনিক রূপ দিতে পারলে ভারত যত বড় শক্তিধর হোক না কেন; আমাদেরকে সিকিম বানাতে পারবে কি? ১০কোটি লোককে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলে তাদের সংগঠিত করে যেকোন বর্হিশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে একটি দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিণত করে গড়ে তোলা অবশ্যই সম্ভব এবং সে চেষ্টাই কি করা উচিত নয় প্রতিটি দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিকের?

এর জবাবে জনাব তাজুদ্দিন সাহেব কিছু বলেননি। তার সাথে দু'দিনের আলোচনায় একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল ভারত সম্পর্কে তার একটা বিশেষ দুর্বলতা কিংবা বাধ্যবাধকতা রয়েছে যার বাইরে তিনি যেতে পারছেন না। এই দুর্বলতা কিংবা বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে তিনি কখনোই আমাদের কিছু বলেননি। পরবর্তী বৈঠকগুলোতে আমরাও তাকে আর বিব্রত করিনি ভারত সম্পর্ক উত্থাপন করে।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বস্থানীয় অনেক নেতাই ছিলেন মুজিব বিরোধী

সেনা পরিষদের নেতাদের সাথে অনেক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতাই মুজিবের শাসন পদ্ধতিতে হতাশ এবং বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। শাসনকার্যে ব্যার্থতা এবং গণবিচ্ছিন্নতার জন্য তারা যুবনেতাদেরকেই দায়ী করতেন। কিন্তু ঐ সমস্ত যুবনেতাদের দাপটের মুখে মনোভাব প্রকাশ করার সুযোগ কিংবা সাহস কোনটাই তাদের ছিল না। জনাব তাজুদ্দিনের পর তারা আরো অসহায় বোধ করতে থাকেন।

অন্যান্যদের মধ্যে খন্দোকার মোশতাক আহমদ, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, জনাব এ আর মল্লিক, জনাব এম আর সিদ্দিকী, জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, জনাব রিয়াজউদ্দিন ভোলা মিয়া, জনাব আব্দুল মালেক উকিল, জনাব ফণীভূষন মজুমদার, জনাব মনোরঞ্জন ধর, জনাব ফরিদ গাজী, জনাব আব্দুল মান্নান প্রমুখ সেনা পরিষদের নেতাদের সাথে ব্যাক্তিগত পর্য্যায়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

শেখ মুজিবকে কি করে 'জাতির পিতা' কিংবা 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যা দেয়া যায়?

শেখ মুজিবের 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ফিরিয়ে নেয়া হয়।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ধরণের খেতাব অযৌক্তিক বলেই প্রমাণিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু' উপাধি এবং তার আজীবন ডাকসুর সদস্যপদও বাতিল করা হয়েছিল স্বাধীনতার পরপরই। ৩রা জানুয়ারী পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত এক সভায় ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ঘোষণা করেন, "দরকার হলে আরো রক্ত দেব। তবুও সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সরকারকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবই।" ঐ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি সেলিম ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ থেকে শেখ মুজিবর রহমানকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। এবং সদস্যপদ বই থেকে সংশ্লিষ্ট পাতাটি জনসভায় ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেন।

রাজনীতির পরিহাস, ১৯৭২ সালের ৬ই মে এই ছাত্রনেতাই শেখ মুজিবর রহমানকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। জনাব সেলিম ডাকসুর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে প্রদত্ত 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিও প্রত্যাহার করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন, "সংবাদপত্র, টিভি ও বেতারে শেখ মুজিবের 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ব্যবহার করা চলবে না।" তিনি বাড়িতে, অফিস-আদালতে ও দোকানে টানানো শেখ মুজিবর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলারও আহ্বান জানান। একই দিনে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মনি সিং বলেন, "বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অযোগ্য।" ২রা জানুয়ারী শেখ মুজিবর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি এক বিবৃতিতে বলেন, "পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী যুবলীগ ও বহু দেশপ্রেমিক গ্রুপ সহ জনগণের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিন্দা প্রকাশ করছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি জাতি আজ যখন ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য সরকারের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগকে অভিনন্দিত করছে এসময় জনগণকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করে দিয়ে এক শ্রেণীর অরাজকতা সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদের ধারক ও ভাসানীর পরিচালনায় উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টিকারী আলবদর, রাজাকার এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্টের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছে। এই বিশেষ অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো তথাকথিত বিরোধী দলের ছদ্মাবরণে এমন আচরণ প্রদর্শন করছে যা খুবই উস্কানিমূলক এবং তারা দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র করছে বলে ধরে নেয়া যায়। এসব শক্তি সমাজতান্ত্রিক রীতি নীতির প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দু'জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে প্রহার ও একজনকে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে। তারা মোজাফফর ন্যাপের অফিসের সামনে ছাত্রলীগের একটি মিছিলের উপরও হামলা চালিয়েছে। তারা তেঁজগাও শিল্প এলাকা ও ঢাকেশ্বরী কটন মিলে খোলা অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়েছে। এমনকি ন্যাপ সভাপতি মোজাফফর আহমদের মতো লোকও ব্যক্তিগতভাবে একটি সংবাদপত্র অফিসে হামলা চালাবার চেষ্টা করেছে।"

৩রা জানুয়ারী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি সম্পাদিত বাংলার বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ নিবন্ধে বলা হয়, "ঢাকায় ২রা জানুয়ারী পূর্ণ হরতাল পালনের নামে মোজাফফর ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া, মেনন ও মাহাবুবউল্লাহ গ্রুপদ্বয় এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বহিস্কৃত অংশের কর্মী নামধারী ফ্যাসিবাদী গুন্ডারা মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও চকবাজার এলাকায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের উপর নগ্ন হামলা চালায়। পাটুয়াটুলী এলাকায় মোজাফফর ন্যাপের গুন্ডারা ছাত্রলীগের আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব মীর জাহানকে অপহরণ করে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরদিন মুজিববাদী ছাত্রলীগ এই হত্যার প্রতিবাদে এক জঙ্গী মিছিল বের করে।"

৩রা জানুয়ারী কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে মুজিববাদী ছাত্রলীগ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ শহিদুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভনীয় উক্তি উচ্চারণের জন্য ন্যাপ মোজাফফর, জাসদ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের আগামী ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে জনতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য হুশিঁয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "যদি ক্ষমা না চাওয়া হয় তাহলে জনতা ৭ই জানুয়ারীর পর থেকে বাংলার মাটিতে ন্যাপ মোজাফফর, জাসদ ও ছাত্র ইউনিয়নের কোন জনসভা অনুষ্ঠিত হতে দেবে না।" তিনি আরো বলেন, "যেসব লোক মন্ত্রী হবার খায়েসে সর্বদলীয় সরকার গঠনের জন্য সরকারের কাছে শতবার তোষামোদ করছেন, তারা এবং তাদের ছত্রছায়ায় থেকে ছাত্র ইউনিয়ন আজ গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করার সাহস পাচ্ছেন।" তিনি ঘোষণা করেন, "আজ বৃহঃস্পতিবার ৪ঠা জানুয়ারী থেকে যে পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর নামের পূর্ণ মর্যাদা দেবে না সংগ্রামী জনতা বাংলার মাটিতে সেই পত্রিকার অস্তিত্ব রাখবে না।" তিনি আরো বলেন,"বঙ্গবন্ধুকে ডাকসুর আজীবন সদস্য করা হয়েছে ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে। সুতরাং সেখানে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অন্য কারো নেই। বর্তমান ডাকসু যেহেতু ছাত্রসমাজের মতবিরোধী কাজ করছে এবং তাদের আস্থা ও ভালোবাসা হারিয়েছে তাই এই ডাকুস বাতিল।" ছাত্রনেতারা এই তৎপরতাকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ইতিমধ্যে ডাকসু অফিসও তছনছ করে ফেলা হয়।

ঐ দিনই বাংলার বাণীতে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, শেখ মুজিবের ছবি নামিয়ে ফেলার দায়ে এক ব্যক্তির কান কেটে দেয়া হয়েছে। পরদিন ঐ একই পত্রিকা খবর ছাপে যে, একই কারণে রংপুরে দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের ধারকদের চার নীতির উপর তৈরি 'মুজিববাদ' ছিল একটা জগাখিচুড়ি।

ঐ সমস্ত স্ববিরোধী নীতিসমূহ জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সংক্ষেপে ঐ সমস্ত নীতিগুলোকে তুলে ধরা হল পাঠকদের সুবিধার্থে।

ভারতে দাসখত লিখে দিয়ে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র গলধঃকরণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগ সরকার স্ববিরোধী ঐ চার নীতিকে শাসনতন্ত্রের চার স্তম্ভে পরিণত করে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখিত গণবিরোধী নীতিগুলোর ককটেল ফর্মুলা দিয়ে দেশ শাসন করে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা ও সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টার ফলে দেশ ও জাতির অবস্থা কি হয়েছিল সেটা অনুধাবন করার জন্য নীতিগুলোর কিছুটা বিশ্লেষন দরকার। জনাব তোফায়েল আহ্মদের দাম্ভিক বক্তব্য, "সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র একসাথে কায়েম করে মুজিববাদকে বিশ্বের তৃতীয় রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।" এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী বলতে হয়, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দু'টো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দর্শন। গণতন্ত্রে মূল প্রেরনা এসেছে মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে। **"Man is born free and shall die free."** রাষ্ট্রকাঠামোর **Basic structure that is economics** এবং **super structure that is politics** এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের থাকবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, থাকবে তাদের মেধা ও কর্মশক্তির বিকাশের অবাধ পরিবেশ, থাকবে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। এ নীতির উপরই গড়ে উঠেছে পশ্চিমা দেশগুলোর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও তাদের কৃষ্টি এবং সভ্যতা। বিকশিত হয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। গণতান্ত্রিক সভ্যতার **anti thesis** হিসেবেই কার্ল মার্কস উপস্থাপন করেন সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক দর্শন। ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরনের **Transitionary phase** -কে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক অধ্যায়। সমাজতন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্য কেড়ে নেয়া হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা। জাতীয় পরিসরে চাপিয়ে দেয়া হয় একটি বিশেষ শ্রেণীর একনায়কত্ব। রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে উৎপাদন যন্ত্রগুলোর ভাগ্য বিধাতা হয়ে উঠেন দলীয় নেতারা। উৎপাদন শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের সব সম্ভবনা ও পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। **Incentive** হীন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের মাত্রা কমে যায়। অস্বাভাবিকভাবে মানুষকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালানো হয় যন্ত্রে। যান্ত্রিক জীবনের বিভীষিকার চাপে জনগণের কর্মস্পৃহা লোপ পায়। সাধারণ জনগণের শ্রমের ফলে অর্জিত সম্পদের ভোগী হয়ে উঠেন রাজনৈতিক পার্টির নেতারা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আমলাতন্ত্র। জনসাধারনের জীবনযাত্রার মান কমে যায় ক্রমান্বয়ে। ফলে ঘনীভূত হয়ে উঠে সামাজিক ক্ষোভ। তারই বর্হিপ্রকাশ সামাজিক বিপ্লবের স্রোতে ঠুনকো তাসের প্রাসাদের মত ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের নিঃসাড়তা আজ বিশ্ব পরিসরে প্রমাণিত হয়েছে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিপর্য্যয়ের ফলে। সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতারা আজ সমাজতন্ত্রের আদর্শকে আস্তাকুড়েঁ ফেলে দিয়ে গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির নীতিকে গ্রহণ করে অতীত ভুলেরই শুধু প্রায়শ্চিত্ত করছেন তা নয়; তারা এটাও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছেন গণতন্ত্রকে গ্রহণ করলে সমাজতন্ত্রকে বর্জন করাটা হয়ে উঠে অপরিহার্য। এ দু'য়ের সহাবস্থান বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। প্রতিটি মানুষ তার আপন স্বাতন্ত্রে বিকশিত। এ প্রাকৃতিক নিয়মকে মেনে নিয়ে গড়ে উঠেছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দর্শন। তাই আজও মানুষের কাছে আবেদন রয়েছে এ দর্শনের। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক নিয়মকে অস্বীকার করে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা এবং যন্ত্র হিসেবে মূল্যায়ন করার ফলেই সমাজতন্ত্র দর্শন হিসেবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেনি। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের জনগণ ও ঠিক

একই কারণে মেনে নেয়নি সমাজতন্ত্রের চাপিয়ে দেয়া নীতি। বিশ্বাস করেনি আওয়ামী লীগের জগাখিচুড়ী মুজিববাদী আদর্শের ভাওতাবাজী।

এবার আলোচনা করা যাক ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে। ধর্মনিরপেক্ষতার আক্ষরিক মানেটা আজ অব্দি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যদি বোঝানো হয় সব ধর্ম থেকে সমদূরত্ব বজিয়ে চলা, তাহলে সেটা হয়ে পড়ে ধর্মহীনতারই শামিল। বর্তমান আধুনিক বিশ্বেও প্রতিটি মানুষ কোন না কোন আদর্শ এবং বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই বেঁচে থাকে। তারা বাঁচার উৎপ্রেরনাও পেয়ে থাকে সে সমস্ত বিশ্বাস এবং আদর্শ থেকে। কেউ কি কোন আদর্শ কিংবা বিশ্বাস ছাড়া এ পৃথিবীতে জীবনধারণ করতে পারে? হয়তো বা পারে। তবে আমার জানা মতে তেমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাত আজঅব্দি আমি পাইনি। বিশ্বাস অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন:- ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবতাবাদ, এথিজম বা নিরশ্বরবাদ, এনিমিজম, পৌত্তলিকতাবাদ প্রভৃতি। যে যাই বিশ্বাস করুক না কেন সেটা ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার। প্রত্যেকের কাছে তার বিশ্বাস তার জীবন ধর্ম। রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা জণগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার অর্থ দাড়িয়েছিল জনগণকে তাদের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস থেকে জোর করে নিরপেক্ষ রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এ ধরণের প্রচেষ্টা অবশ্যই মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সরকারিভাবে শাসনতন্ত্রের স্তম্ভ হিসাবে গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়ের লোকের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাসের অবমাননা করেছিল। বাংলাদেশের ধর্মভীরু জনতা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের এ অবমাননা কিছুতেই মেনে নেয়নি। প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে এ দেশের মানুষ চিরকাল। তাছাড়া ধর্মীয় সহনশীলতার এক গৌরবময় ঐতিহ্য বাংলাদেশী জনগণ আদিকাল থেকে বহন করে এসেছে। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ধর্মীয় আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক হিংসাত্বক হানাহানি এমনকি ধর্মীয় যুদ্ধও হয়েছে। বর্তমান ভারতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায় শান্তিতে বসবাস করেছে যুগ যুগ ধরে, নির্ভয়ে, আপন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে। এটা ঐতিহাসিক সত্য এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গৌরব। এ গৌরবকে কলুশিত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়ে কায়েমী স্বার্থ এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে অনেকেই। কিন্তু তাদের সব চক্রান্তই ব্যর্থ করে দিয়েছে বাংলাদেশের সচেতন জনতা। বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়। ধর্ম বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই নয়, ধর্ম হচ্ছে তাদের জীবন আদর্শ (Way of Life)। তারা মনেপ্রানে ধার্মিক কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ইসলাম ধর্মের অনুশাসন তাই তারা পালন করে বিচার বিবেচনা করে। ইসলাম ধর্মে অন্য ধর্মালম্বীদের ধর্ম পালনের সম্পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে শুধু তাই নয়; সংখ্যালঘু ধর্মালম্বীদের প্রতি মুসলমানদের কিংবা মুসলমান রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব সে সম্পর্কেও পরিষ্কার নির্দেশ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। সে অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করা ছিল নিঃপ্রয়োজন। বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের জীবনধারার আলোকে প্রণীত হবে স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র এটাই ছিল জনতার আশা ও আকাঙ্খা।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই জাতীয় পরিচিতি এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে শোরগোল তুলল। কিন্তু তারা পূর্বতন ঐতিহাসিক বাংলাদেশের এই মানবগোষ্ঠির জাতীয়তার মূল ও ভিত্তি সম্পর্কে কিছুই বলল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সুযোগে অনেকেই আবার সরবে মেতে উঠল। তারা বলে বেড়াতে লাগল, "মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে রাজনীতি উপমহাদেশে সংগঠিত হয়েছিল এবং পরিণতিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল, সেই দ্বি-জাতি তত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে।" অর্থাৎ পক্ষান-রে তারা এটাই বলার চেষ্টা করল যে, ১৯৪৮ সালে ভারত বিভক্তি অন্যায়ভাবে করা হয়েছিল।

এ ধরণের উক্তি নেহায়েত অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ধরণের বক্তব্যে অখন্ড ভারতের প্রবক্তাদের প্রচারণারই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকালে কংগ্রেস অনুসৃত অখন্ড ভারত এবং মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ব এই বিষয় দুইটির একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে।

প্রাগঐতিহাসিক যুগ থেকেই এই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে স্বাধীনভাবে বসবাস করে এসেছে। শুধুমাত্র বহিরাগত বিজাতীয় শক্তিরাই তাদের শোষণ পাকাপোক্ত করার জন্য অস্ত্রের বলে দেশীও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই উপমহাদেশে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। বৈদিক যুগে আর্য্য ভাষীদের আগমনের কাল থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশবাদের শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস ঘাটলে এই সত্য অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

আদিকালের বর্ণ হিন্দুরা রামরাজ্য কায়েমের ধুঁয়া তুলে অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি আফগান এবং মুঘল শাসকরাও। একমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই আধুনিক উচ্চুতর মানের সমরাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বদৌলতে পুরো উপমহাদেশকে একটি প্রশাসনিক রাষ্ট্রের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। অতএব যুক্তিসঙ্গত কারণেই বলা যায় যে, একক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক।

উনিশের দশকে বৃটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির আন্দোলন যখন দানা বেধেঁ উঠছিল তখনই পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় দীক্ষিত বর্ণ হিন্দুদের নেতৃত্বে সৃষ্টি করা হয় কংগ্রেস পার্টি বৃটিশ প্ররোচণায়। মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতি সত্বার স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করে বৃটিশ সৃষ্ট **Indian Union** -কে অটুট রেখে স্বাধীনতার পর তাদের ক্ষমতায় বসানো। এর ফলে বর্ণ হিন্দুরা দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন অখন্ড ভারতে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা দেখতে পায়। তাদের প্রতি বৃটিশ সহযোগিতার কারণ ছিল মূলতঃ দু'টি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উপমহাদেশ দখল করতে হয়েছিল মুসলমানদের বিরোধিতার মুখে। ফলে মুসলমানরা হয়ে উঠে তাদের চোখের বালি। প্রতিহিংসার রোষানলে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের ঘৃনা ও সন্দেহ করতে থাকে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা বৃটিশদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের সাহায্যই করেছিল মুসলমানদের পরাস্ত করে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে। পুরস্কার স্বরূপ মুসলমানদের ধনসম্পদ হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে বৃটিশ অনুকম্পা ও মদদপুষ্ট হিন্দুরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়। মুসলমানরা হয়ে পরে নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন। সুদীর্ঘ দুই'শ বছরের বৃটিশ গোলামীর ইতিহাসে হিন্দু সম্প্রদায় বরাবরই ছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির সহযোগী মিত্রশক্তি আর মুসলমানরা পরিণত হয় নিগৃহ ও করুণার পাত্রে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ধ্যানধারণায় গড়ে উঠা উচ্চবিত্ত বর্ণ হিন্দু সমপ্রদায়ের আনুগত্য সম্পর্কে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠি ছিলেন নিশ্চিত (**Convinced**)। তাই তারা চেয়েছিলেন স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ঐ শ্রেণীকেই অধিষ্ঠিত করতে, যাতে করে সমগ্র উপমহাদেশে তাদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখা সম্ভব হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কংগ্রেসকে জাতীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি ছিল তাদের সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাবিদার বানাবার পূর্বশর্ত। সেটা অর্জন করার জন্য ধর্মীয় চেতনাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। অতি কৌশলে 'বন্দে মাতরম', 'ভারতমাতা', 'হিন্দুস্তান', 'জয় হিন্দ' ইত্যাদি শ্লোগান তুলে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ও আনুগত্য লাভ করে কংগ্রেসকে একমাত্র জাতীয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন 'নব্য চানক্যরা'। **but every action has an equal and opposite reaction.** বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলনের গায়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী কংগ্রেস যখন হিন্দু ধর্মের নামাবলী একতরফাভাবে চাপিয়ে দিল তখন সংখ্যালঘু জাতি-গোষ্ঠিগুলো নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে শংকিত হয়ে হয়ে উঠে।

এই অবস্থায় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্বায় বিভক্ত মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য ভিন্ন রাষ্ট্রের দাবিতে সোচ্চার হয়ে জোর আন্দোলন গড়ে তোলে। এই প্রেক্ষাপটেই কংগ্রেসের মোকাবিলায় মুসলমানদের দাবিকে রাজনৈতিক রূপ দেবার জন্যই গঠন করা হয়েছিল রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের অখন্ড ভারত তত্বের মোকাবিলায় মুসলিম লীগ প্রচার করেছিল দ্বি-জাতি তত্ব। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্তান এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান, এই দু'টো দাবিতে হিন্দু-মুসলমান এই দুই ধর্ম গোষ্ঠির মেরুকরণ ভয়াবহ সংঘাতের রূপ ধারণ করে। সংঘর্ষে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটে দু'পক্ষেই। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয়েছিল বৃটিশ সরকারকে। তর্কের খাতিরেও যদি ধরে নেয়া হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা দ্বি-জাতি তত্বকে খন্ডিত করেছে তবে যুক্তিগত কারণেই মেনে নিতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অখন্ড ভারত তত্বকেও খন্ডিত করেছে একইভাবে।

কিন্তু আমার মনে হয় ১৯৭১ সালে দ্বি-জাতি তত্বের অসাড়তা নয় বরং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে ভারত একটি বহুজাতিক দেশ। একই সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র বিশেষ একটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে কোন জাতিসত্বা গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে মূল ভূ-খন্ড, ভাষা, নৃ-তাত্বিক বৈশিষ্ট্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধও একইভাবে প্রভাব রাখে। নিদির্ষ্ট ভূ-খন্ডে ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠি, সমপ্রদায়, জাত, কুল নির্বিশেষে যখন কোন জনগোষ্ঠি এক সামগ্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তখনই জাতীয়তাবাদ প্রাণ পায়। জাতীয়তাবাদ মূলতঃ এক ধরণের অনুভূতি, এক ধরণের মানসিকতা, এক ধরণের জাগ্রত চেতনা, যার সৃষ্টি হয় জনসমষ্টির প্রবাহমান ঐতিহাসিক জীবনধারায়। জাতীয় সংগ্রামের ধারায় গতিশীলতা অর্জন করার জন্য কখন কোন উপাদানটা বিশেষ ভূমিকা রাখবে সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সময়, বাস্তব পরিস্থিতি, জনগণের প্রত্যাশা এবং নেতাদের উপর।

অতীত সম্পর্কে গৌরববোধ, বর্তমানের উপভোগ বা বঞ্চনা আর ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করে এবং জনমনে গড়ে তোলে ঐক্যবদ্ধ সুরের মূর্চ্ছনা। এ ধরণের ঐক্যবদ্ধ চেতনা যখন কোন জনসমষ্টিকে একত্রিত করে তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। সামগ্রিক সত্বা হিসাবে তা বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয় আর তারই ফলে একটি জাতি সবরকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আদর্শিক ও দৈহিকভাবে প্রস্তুত হয়।

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে এখনও প্রচুর বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ বিভ্রান্তিকে আরো জটিল করে তুলেছেন তাদের ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য। এ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বুদ্ধিজীবিদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন তাও প্রায় অনুপস্থিত। পরিষ্কারভাবে সত্যকে আমাদের জানতে হবে। আমাদের জাতীয়তাবাদ কি? বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ? না বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ?

প্রাচীন বঙ্গ অববাহিকা ও তৎসংলগ্ন ভূ-ভাগ যে ভারতীয় উপমহাদেশে একটি প্রাচীন এবং সুপরিচিত স্ব-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল অঞ্চল ছিল তার অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বিধৃত রয়েছে। (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০-১০০০ সালের মধ্যে) ঐতরেয় অরণ্যকে বঙ্গের কথা রয়েছে। মহাভারত ও হরিবংশেও দেখা যায় বঙ্গ প্রসঙ্গ। সুতরাং বঙ্গ জনপদকে নেহায়েত অর্বাচীন বলে আখ্যায়িত করার কোন কারণ নেই। রামায়নেও বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন জনপদ হিসেবে বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। এ দেশের দু'কুল পাত্রোর্ন ক্ষৌম কার্পাসিক বস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল বলেও কৌটিল্য বয়ান করেছেন। বরাহ মিহির (৫০০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে) তার বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলীয় দেশ অর্থাৎ বঙ্গ দেশ, পরবর্তিকালে বাংলাদেশের অর্ন্তগত যে কয়টি জনপদের নাম করেছেন সেগুলো হল: হরিকল, গৌতক, পৌন্ড্র, বঙ্গ, বর্ধমান, তাম্রলিপ্তি, সমতট

ও উপবঙ্গ। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোর, খুলনা সংলগ্ন দক্ষিন বঙ্গের কিছু অংশকে উপ-বঙ্গরূপে শনাক্ত করেছেন। এ ছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের আর একটি প্রাচীন জনপদ সুহেম্নর কথাও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের এবং আদিকালের বঙ্গ দেশের পশ্চিম এলাকার নাম ছিল সুহম্ন, অঙ্গ, বর্তমান মিথিলা ও কলিঙ্গ উড়িষ্যা প্রদেশের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের তথা বঙ্গ দেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

হিম যুগের পর থেকে বাংলাদেশ কখনও জনশূন্য থাকেনি। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মানবগোষ্ঠির মতো বাংলাদেশেও আদিম মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছিল। কারণ, এখানেও প্রত্ন ও নব্য প্রস্তর এবং তাম্র যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোদ, বাউড়ী, কোল, ভীল, মুন্ডা, সাওঁতাল, সাবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চন্ডাল, রাজবংশী সমুদয় অন্তজ জাতির সমষ্টিই বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। ভাষার ও আকৃতির মূলগত ঐক্য হতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় জাতি একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠির বংশধর। এই মানবগোষ্ঠির সাথে অষ্ট্রেলিয়ার অদিবাসীদের চেহারার এবং ভাষার মিল পাওয়া গিয়েছিল বলে এদের বলা হয় অস্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অষ্ট্রিক।

বাংলাদেশের দোরগোড়ায় রাজমহল পাহাড়। সেখানে বন-জঙ্গলের অধিবাসী পাহাড়ীদের ছোট্ট-খাট্টো গড়ন, চেহারা, গায়ের রং মিশমিশে কালো, নাক থেবড়া। বেদ এবং নিষাদে যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে হুবহু মেলে সিংহলের ভেড্ডাদের। ফলে এদের নৃ-তাত্বিক নাম হয় ভেড্ডিড। নিষাদ জাতি বলেও তারা আখ্যায়িত হয়েছে। প্রাচীন বাংলাদেশের নানা জায়গায় নানারকম পরিবেশে এবং জল হাওয়ায় নানান দলে ভাগ হয়ে মানুষ বসবাস করত। পরে তাদের রক্তে বহিরাগতদের নানা রক্তের ধারা এসে মিশেছে। বাচঁবার আলাদা আলাদা ধরণের দরুন এবং রক্তের মেশামেশি হওয়ায় স্থানভেদে চেহারায় নানারকম ধাঁচ সৃষ্টি হয়েছে। মনের গড়নে, মুখের ভাষায়, সভ্যতার বাস্তব উপাদানে তার প্রচুর ছাপ আছে। বাংলাদেশের মাটির গুন আর সেই মাটিতে নানা জাতের মেলামেশা এরই মধ্যে বাংলাদেশী জনপ্রকৃতির বৈচিত্র আর ঐক্যের গোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীগন আর্য্য জাতির বংশগত নন। বাংলা ভাষার বিশ্লেষন করে পন্ডিতগণ এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। উপরন্তু দ্রাবিড় বা আর্য্য আসলে নরগোষ্ঠির নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠির নাম মাত্র। একই নরগোষ্ঠির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার চলন থাকতে পারে। কাজেই শুধুমাত্র ভাষা দিয়ে কোন নরগোষ্ঠির নামকরণ সঠিক নয়।

আসমুদ্রহিমাচল আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ। প্রশ্ন দেখা দেয় বাংলা অথবা বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তি হল কি করে? বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই সমস্ত শব্দের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক। জনাব আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাংলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা হল:- প্রাচীন বঙ্গ শব্দের সাথে আল শব্দ যুক্ত করে সুলতান শামসুদ্দিন বাঙ্গালী শব্দের চয়ন করেন। আল শব্দের অর্থ পানি রোধ করার ছোট-বড় বাঁধ। অন্যদিকে সুকুমার সেনের অভিমত হল প্রথমে বঙ্গ থেকে বাঙ্গালাহ্‌র সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম শাসন আমলে পারসিক বাঙ্গালাহ্‌ উচ্চারণ থেকে পুর্তুগীজরা বানিয়েছে বেঙ্গল এবং ইংরেজদের হাতে পড়ে বঙ্গ পরিণত হয়েছিল বেঙ্গলী বা বাঙ্গালীতে।

বাংলাদেশী জনগণের বাসভূমির রয়েছে একটি ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক সীমানা। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সীমা সংক্ষেপে বলতে গেলে, উত্তরে হিমালয় ও তার গায়ে নেপাল, সিকিম ও ভূটান রাজ্য, উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারভঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সীমান্তবর্তী সমভূমি, পূর্ব দিকে গারো, খাসিয়া, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা, আসাম, চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী বেয়ে দক্ষিনে সমুদ্র পর্যন্ত। পশ্চিমে রাজমহল, সাওঁতাল পরগনা, ছোট নাগপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলসমূহ, বিহারের বীরভূম, মানভূম, ধলভূম, কেওঞ্জর, ময়ুরভঞ্জের অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর। এই সীমারেখার মধ্যেই প্রাচীন বাংলাদেশের বা বঙ্গের গৌড়, পুন্ড্র,

বারেন্দ্র, রাঢ়, সুহম্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বাঙ্গাল, হরিকল প্রভৃতি জনপদ গড়ে তুলেছিল বঙ্গবাসী বা বাংলাদেশীরা। কোল, ভীল, শবার, পুলিন্দ, হাড়ী, ডোম, চন্ডাল, সাওঁতাল, মুন্ডা, ওরাঁও, ভূমিজ, বাগদী, বাউড়ী, পোদ, মালপাহাড়ী প্রমুখ অন্তজ জনগোষ্ঠির মিলন এবং তাদের রক্তের সাথে বহিরাগত নানা রক্তের ধারা এসে মিশে এক হয়ে সৃষ্টি হয় বঙ্গবাসী অথবা বাংলাদেশী জাতিসত্বার। সময়ের স্রোতে রাষ্ট্র বিধাতাদের হাতে বাংলাদেশীদের আবাসভূমি বাংলাদেশ খন্ড-বিখন্ড হলেও তার ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক সীমারেখা মুছে ফেলতে পারবে না কেউ কোনদিন। রাষ্ট্রীয় সীমারেখা অপরিবর্তনীয় নয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রাচীন বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ জনপদগুলো গড়েছেন। রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন, জন্ম দিয়েছেন বিস্ময়কর সংস্কৃতি ও শিল্প ঐতিহ্যের। এ ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় অধিকার। আজ রাষ্ট্রীয় পরিসীমা এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে গোষ্ঠি স্বার্থে অযথা যতই যুক্তিহীন বিতর্কের অবতারনা করা হোক না কেন, বাংলাদেশের সচেতন জনগণকে বোকা বানিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা সম্ভব হবে না বেশি দিন। তারা তাদের অতীত ঐতিহ্য এবং ন্যায্য অধিকার ভবিষ্যতে একদিন না একদিন আদায় করে ছাড়বেই ইনশাল্লাহ্। পূর্ণ মর্যাদায় একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত বাংলাদেশ এবং আমরাও বিশ্বের সামনে মাথা উচুঁ করে দাড়াতে সক্ষম হব গর্বিত বাংলাদেশী হিসাবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের কোন কোন পর্যায়ে বাংলা ভাষা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এ কথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বললে সেটা হবে বিভিন্ন নরগোষ্ঠির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাজার বছরের ঐতিহ্যে গড়ে উঠা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উপর একটি ভাষাগোষ্ঠির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ, বাঙ্গালী কোন নরগোষ্ঠির নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠির নাম মাত্র।

আমার প্রাণনাশের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

উত্তরবঙ্গে কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন করতে যাবার সময় ঐ ঘটনা ঘটে।

১৯৭৫ সালের প্রথমার্ধে সারিয়াকান্দী এবং ধুনটেতে তখন আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। একদিন আমার উপর দায়িত্ব পড়ল কিছু মেশিনপত্র নিয়ে প্রজেক্ট পরিদর্শনে যেতে হবে। স্বপন ব্যবসার কাজে দেশের বাইরে; নূরও বিশেষ একটা কাজে ঢাকাতেই আটকে পড়েছে; তাই বাধ্য হয়েই আমাকে ঐ দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ট্রাকে মাল ভর্তি করে রওনা হলাম। আমি নিজের গাড়িতেই যাব কারণ আমাকে তাড়াতাড়ি আবার ঢাকায় ফিরতে হবে অন্য আরেকটি কাজে। আরিচা ঘাটে পৌঁছে দেখি ফেরি বিভ্রাট। নগরবাড়ি ঘাটে পৌঁছালাম বেশ রাত করে। রাতে ড্রাইভ করা সেই সময় ছিল বিপদজনক। তাই ঠিক করলাম ঘাটেই রাতটা কাটিয়ে ভোরে রওনা দেব গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। প্রায়ই উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া-আসা করতে হয় নগরবাড়ি ঘাট দিয়ে। ঘাটের ছাপড়া বেড়ার একটা রেষ্টুরেন্ট বিশেষ পরিচিত। সবসময় এই রেষ্টুরেন্টেই খাওয়া-দাওয়া করে থাকি আমরা যাত্রাকালে। সেই সুবাদে মালিক হাজী সাহেবের সাথে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেছে। আমাদের সবসময় বিশেষ খাতির-যত্ন করে পছন্দমাফিক টাটকা মাছ রেধে খাওয়ান হাজী সাহেব। হাজী সাহেবকে সমস্যাটা বোঝাতে বললাম, "হাজী সাহেব রাতটাতো এখানেই কাটাতে হয় আজ।" হাসিমুখে হাজী সাহেব জবাব দিলেন, "কোন অসুবিধা নাই স্যার। চকি একটা পাইতা দিমু; বিছানাপত্র বাসা থাইকা আইনা দিমু; মশারীও একটা লাগাইয়া দিমু।" রাতের খাবারের পর বাইরে বেরিয়ে দেখি আমার ট্রাক ড্রাইভার এবং অন্য সবাই টুয়েন্টিনাইন খেলছে ট্রাকের পাশেই। ঘুম আসছিল না; ভাবলাম ওদের সাথে কিছুক্ষণ তাসই খেলা যাক। অল্প সময়েই খেলা জমে উঠল। খেলা ভীষণ জমেছে; কখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে টেরও পাইনি। হঠাৎ করে ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনতে পেলাম কাছেই। নিরাপত্তার জন্য সবাইকে ট্রাকের নিচে শুয়ে পড়তে বলে নিজেও কাভার নিলাম। ট্রাকের নিচে শোয়া অবস্থা থেকে দেখলাম হাজী সাহেবের রেষ্টুরেন্টকে টার্গেট করেই দু'জন লোক একনাগাড়ে গুলি ছুড়ে চলেছে। পাশে দাড়িয়ে আছে একটা জিপ। মিনিট খানেক গুলিবর্ষণ করে লোক দু'টো জিপে উঠার পর জিপটা উত্তর দিকে চলে গেল। হাজী সাহেবের বাসা দোকানের কাছেই। গোলাগুলির আওয়াজ থামতেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে নিয়ে। আমরাও বেরিয়ে এলাম ট্রাকের নিচ থেকে। আমাকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাজী সাহেব দৌড়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বেচারা নিজেকে সামলাতে না পেরে বাচ্চাদের মত কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, "আল্লাহ্ মেহেরবান, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।" সত্যিই আল্লাহ্ মেহেরবান। অন্যরা বুঝতে না পারলেও আমি আর হাজী সাহেব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম কি উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়া হয়েছিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে ট্রাক ড্রাইভার ও অন্যদের গন্তব্যস্থানে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে আমি ঢাকায় ফিরে এলাম। এই ঘটনার ব্যাপারে বিশেষ ঘনিষ্ঠমহল ছাড়া অন্য কারো সাথেই আলাপ করলাম না। এরপর থেকে নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া আমি ঢাকার বাইরে তেমন একটা যেতাম না। বাইরের কাজ দেখাশুনার দায়িত্ব নূর ও স্বপনকেই নিতে হয়।

বাকশাল ছিল দু-মুখী অস্ত্র

শেখ মুজিব বাকশালের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেখ মনি এবং তার দোসররা চেয়েছিল বাকশালকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে।

দেশের এই দূরাবস্থায় শেখ মুজিবের ক্ষমতালিপ্সা বেড়ে গেল। ক্ষমতার চূড়ায় অবস্থান করেও তার সন্তুষ্টি ছিল না। রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতা তার নিজ হাতে কুক্ষিগত করার জন্য তিনি একদলীয় শাসন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি মূল উপাদান ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এর জন্যই হয়তো বা শেখ মুজিব এতদিন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। তার এই মনোভাব জানতে পেরে দলীয় সুবিধাবাদী গোষ্ঠি নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্ররোচণা দিতে থাকে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই শেখ মুজিব একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পক্ষে প্রচারণা শুরু করেন। নভেম্বর ১৯৭৪-এ মস্কোপন্থী দলগুলোও সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে একদলীয় শাসন কায়েম করার জন্য আহ্বান জানায়। শেখ মুজিবের একান্ত বিশ্বস্ত তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনসুর আলীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দূতাবাসে ডেকে একদলীয় সরকার কায়েমের পরামর্শ দেয়া হয়। মনসুর আলী, শেখ মনি এবং মস্কোপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্ররোচণা এবং শেখ মুজিবের নিজের ক্ষমতাকে আরো বাড়িয়ে তোলার বাসনা ও রাষ্ট্রকে সবদিক দিয়ে তার এবং তার দলের অনুগত রাখার জন্য একদলীয় সরকার কায়েমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যখন সংসদীয় দলের মিটিং এ উত্থাপন করা হয় তখন প্রস্তাবটির বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন সংসদীয় দলের বেশিরভাগ সদস্য। এ অবস্থায় মিটিং এ বলা হয়- এই প্রস্তাব এর বিরোধিতা করা হলে শেখ মুজিব পদত্যাগ করবেন নতুবা একটি মেরুদন্ডহীন সংসদ সৃষ্টি করে এ প্রস্তাব পাশ করানো হবে। এই কথা শোনার পর মুজিবের ইচ্ছাকে অনেকটা বাধ্য হয়েই সবাইকে মেনে নিতে হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী জরুরী আইন ঘোষণার মাত্র ২৭দিন পর দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল কায়েম করে গণতন্ত্রের কবর রচনা করে এক আদেশ জারি করলেন শেখ মুজিব। সারাজীবন যে শেখ মুজিব গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে এসেছিলেন তিনিই বাংলাদেশে একদলীয় শাসনতন্ত্র কায়েম করে সর্বপ্রথম স্বৈরাতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম করেন। বাংলাদেশে একদলীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে দেশের সকল বিরোধী দল বাতিল বলে গন্য হয়।

বাকশাল গঠন করার আগে শেখ মুজিব কোন পদ্ধতিই অনুসরন করেননি। সংসদীয় দলের মিটিংয়ে অনেকেই বাকশাল গঠনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী ৫৫মিনিট বক্তৃতা করেন। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় শেখ মুজিব প্রমাদ গুনেছিলেন। তার কারণ, এ বক্তৃতাকে সংসদ সদস্যদের বৃহৎ অংশ ঘনঘন করতালির মাধ্যমে সমর্থন জানান। এই বক্তৃতার পর অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা করা হয়। পরদিন জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং জনাব শামছুল হকও বক্তৃতা করার অনুমতি চান। কিন্তু তাদের সে অনুমতি না দিয়ে জনাব শেখ মুজিব গম্ভীর স্বরে সবাইকে বলেন, "আর বক্তৃতা নয়। তোমরা আমারে চাও কি না সে কথাই শুনতে চাই।" সবাই তার এ ধরণের বক্তব্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, সব সদস্যকেই এ প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হবে। তিনি আবার বললেন, "বলো, আমারে চাও কিনা?" এরপর তার বিরোধিতা করার সাহস আর কারো হল না। কিন্তু বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী এরপরও তার বক্তৃতায় নির্ভয়ে বলেন, "আমরা ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে মুজিব খানকে চাই না।"

এরপর ২০শে জানুয়ারী বসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংগঠিত সেই কলঙ্কিত অধিবেশন।

২৫শে জানুয়ারী সংসদে কোন রকমের বির্তক ছাড়া গণতন্ত্রকে পুরোপুরি সমাহিত করে পাশ করানো হয় চতুর্থ সংশোধনী। মাত্র এক বেলার সেই অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন জনাব আব্দুল মালেক উকিল। এই আব্দুল মালেক উকিলই মাত্র তিন মাস আগে ১৬ই অক্টোবর সংসদ ভবনে পার্লামেন্ট সংক্রান্ত এক সেমিনারে বলেছিলেন, "আমাদের জনগণের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে।" তারই পৌরহিত্যে চালু হয়ে গেল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার। বাতিল করে দেয়া হল সকল বিরোধী দল। পাশ করিয়ে নেয়া হল একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্টকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে শপথ পড়িয়ে নিলেন সেই আব্দুল মালেক উকিলই। ঐ চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা সংসদ সদস্য না হলে ভোট দিতে পারবেন না। প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সংসদ সদস্য হবেন তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মন্ত্রী পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন, তবে রাষ্ট্রপতি তা কার্যকর করলেন কি করলেন না সে সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ঐ অধিবেশনে 'জরুরী ক্ষমতা বিল' কোন আলোচনা ছাড়াই আইনে পরিণত হয়ে যায়। ২৫শে জানুয়ারী দুপুর ১:১৫ মিনিটে এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে জারিকৃত চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়, "এই আইন প্রণয়নের পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। এই আইন প্রবর্তনের ফলে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন এমনিভাবে যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধিনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি ও একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার অধিনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে যে ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র সেই ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতিকে তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনায় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে কিংবা সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন প্রধানমন্ত্রী ও আবশ্যক মনে করলে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করতে এবং কার্যাবলীতে অংশ নিতে পারবেন তবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না হন তাহলে ভোট দান করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন অথবা তার নির্দেশে উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সংশোধিত সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে দেশে শুধু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা জাতীয় দল নামে অভিহিত হবে। সংশোধনীতে কার্যভারকালে তার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।" জাতীয় দলের ঘোষণায় বলা হয়, "কোন ব্যক্তি জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন কিংবা ভিন্ন ধারার কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।"

ঐ সংশোধনীর পক্ষে ২৯৪ জন সাংসদ ভোট দেন। কেউ বিরোধিতা করেননি। সংসদের ২ঘন্টা ৫মিনিট স্থায়ী ঐ অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন আব্দুল মালেক উকিল। বিলের বিরোধিতা করে তিনজন বিরোধী ও একজন স্বতন্ত্র সদস্য ওয়াক আউট করেন। এরা হলেন জাসদের আবদুল্লাহ সরকার, আব্দুস সাত্তার ময়নুদ্দিন আহমেদ ও স্বতন্ত্র সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আতাউর রহমান খান আগেই সংসদ অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসেন। বিলটি উত্থাপন করা হলে আওয়ামী লীগের দলীয় চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার প্রেক্ষিতে কোন

প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ না দেবার আহ্বান জানান। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান খান বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনার সুযোগ দানের জন্য স্পীকার জনাব মালেক উকিলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্পীকার তা নাকচ করে দেন। পরে কন্ঠভোটে চীফ হুইপের প্রস্তাব গৃহিত হয়। তারপর আইনমন্ত্রী মনরঞ্জন ধর সংসদে 'জরুরী ক্ষমতা বিল ১৯৭৫' পেশ করেন। চীফ হুইপ এ ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ বিধি প্রয়োগ না করার আবেদন জানালে বিষয়টি কন্ঠভোটে পাশ হয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষ প্রানিধানযোগ্য। যদিও বিলটি সংসদে বিনা বাধায় পাশ হয়; তবে গণতন্ত্রের বিকল্প একনায়কত্বের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যেও দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

পরে জেনারেল ওসমানী ও জনাব ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তাদের সংসদ সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ গণতন্ত্রীমনা নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের এই পদক্ষেপে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। বাকশাল গঠনের পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা ভেবে তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য অন্য কেউই দায়ী নন। স্বয়ং শেখ মুজিবই হত্যা করেছিলেন গণতন্ত্রকে। দেশে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে চাপা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। বাকশাল গঠনের দিন অনেকেই বলেছিলেন, "শেখ মুজিব নিজেই আওয়ামী লীগের নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিলেন স্বীয় স্বার্থে।" বাকশালের জগদ্দল পাথর বাংলাদেশের মানুষের বুকের উপর এভাবেই চেপে বসল। এ পাথরকে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত মানুষের নিস্তার নেই। এর পরই সরকারি আদেশ জারি করে আইন বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক স্বাধীকার ছিনিয়ে নেয়া হয়।

আওয়ামী লীগের খন্দোকার মোশতাক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাবশালী নেতা ও কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন অনেক প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ সমস্ত তথ্যগুলো ছিল আমাদের পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। আমরা জানতে পেরেছিলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখরাই ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে কট্টর রুশ-ভারতপন্থী। বাকশালী একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার মূল উদ্দ্যোক্তা ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, নজরুল ইসলাম, আব্দুস সামাদ আজাদ, আব্দুর রাজ্জাক, মনসুর আলী, সেরনিয়াবাত, সৈয়দ হোসেন, মনি সিং এবং প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং নিজের অবস্থানকে সুসংহত করার জন্যই শেখ মুজিব এ সমস্ত উচ্চাভিলাসী নেতাদের প্রভাব ও পরামর্শ মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের বলি দিয়ে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার এই হঠকারী সিদ্ধান্তকে আওয়ামী লীগের বৃহৎ অংশই মেনে নিতে পারেনি। শেখ মুজিবের ক্ষমতার প্রতাপের মুখে নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে সেদিন এরা প্রকাশ্য বিরোধিতা না করে নিরব থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের এ সিদ্ধান্তের ফলে সংসদে সেদিন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল গণতন্ত্রীমনা নেতৃবৃন্দ ও সংসদ সদস্যেদের মাঝে। এদের অনেকেই বর্ষীয়ান নেতা খন্দোকার মোশতাকের সাথে আলোচনা করে এ ব্যবস্থার প্রতিকারের রাস্তা খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কোন পদক্ষেপ নিলে আওয়ামী লীগের এই বৃহৎ অংশের সমর্থন পাওয়া যাবে অতি সহজেই। তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অভিনন্দন জানিয়ে সমর্থন করবেন এ ধরণের যে কোন পরিবর্তনকে। আর একটি বিষয়ও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে সেটা হল আওয়ামী লীগের মধ্যে খন্দোকার মোশতাকের সমর্থন রয়েছে অনেক। তার ব্যক্তিগত প্রভাব ও জনপ্রিয়তা পার্টির নেতা ও কর্মীদের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট।

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে ১৫ই আগষ্টের মহান বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান

ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদকে বন্দী করা হয়। স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট এর আওতায় ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে তাকে বন্দী করা হয়।

রাজনৈতিক শূন্যতা এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে রাজনৈতিক দলগুলো যখন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল তখন ১৯৭৪ সালে দেশের কিছু বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা হয় 'Civil Liberties and Legal Aid Committee'। মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবিতে গঠিত হয়েছিল এই মোর্চা। বিরোধী দল ও প্রতিবাদী জনগণের উপর অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদেও সোচ্চার হয়ে উঠে এই কমিটি। জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এই কমিটির প্রথম সভায় শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, কবি, আইনজীবি, সাংবাদিক এবং সমাজের অন্যান্য পেশাজীবীদের প্রতিনিধিগণ দাবি জানান :-

(১) শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী সমস্ত কালা-কানুন বাতিল এবং সরকার এর বিভিন্ন মহল কর্তৃক জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ অগণতান্ত্রিক ও আইন বিরোধী।
(২) জরুরী আইন এবং স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।
(৩) রক্ষীবাহিনী আইন বাতিল করে অবিলম্বে তাদের নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।
(৪) সকল রাজবন্দীদের অবিলম্বে শর্তহীনভাবে মুক্তি দিতে হবে।
(৫) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং
(৬) যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এবং হুলিয়া রয়েছে সেগুলো সরকারকে অবিলম্বে তুলে নিতে হবে।

অল্পসময়েই এই কমিটির উপর নেমে আসে সরকারি শ্বেত সন্ত্রাস। উদ্যোক্তাদের অনেকেই নির্যাতিত হন সরকারের হাতে।

২৩/১/১৯৯২ তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে '৭২ থেকে '৭৫ সালের আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসন প্রসঙ্গে জনাব মওদুদ আহমেদ বলেন, "১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার পর ২৯শে ডিসেম্বর ভোরে আমাকে বিনা অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বন্দী করা হয়েছিল। অথচ সরকার আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনতে পারেনি সেদিন। এই তোফায়েল সাহেবই রক্ষীবাহিনীর ইনচার্জ ছিলেন। আর এই বাহিনীর হাতেই এ দেশের ৪০ হাজার নিরীহ মানুষ জীবন হারিয়েছে। সিরাজ সিকদারের হত্যার কথা আজো এ দেশবাসী ভুলে যায়নি। '৭২ থেকে '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট অব্দি আওয়ামী-বাকশালী শাসনকাল এ দেশের ইতিহাসে সবচাইতে কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

ঘটনা প্রবাহের উত্তাল তরঙ্গ মুজিবকে ঠেলে দিয়েছিল নেতৃত্বের শিখরে

রাতারাতি অবমূশ্যতার তমশ্যা থেকে আগরতলা মামলা শেখ মুজিবকে বানিয়ে দেয় কিংবদন্তীর নায়কে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট। তার রাজনৈতিক জিবনের দিকে তাকালে সে সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । র্নিদ্বিধায় নিজের স্বার্থ উদ্বার করতে সবকিছুই তিনি করতে পারতেন। আগরতলা মামলা এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ। উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে এটা বহুলভাবে প্রচারিত করা হয়েছে যে শেখ মুজিবই ছিলেন প্রথম নেতা যিনি বুঝতে পেরেছিলেন একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা সম্ভব। এবং তিনিই ছিলেন স্বাধীনতার মূল রূপকার। কিন্তু এর কোনটাই সত্য নয়।

সারা বাংলাদেশের মানুষকে জানানো হল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তথা বাঙ্গালী জাতিকে পাঞ্জাবী শোষণের হাত থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্ত করার স্বপ্নদ্রষ্টা নাকি ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। কিন্তু সেটা ঐতিহাসিক সত্য নয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেখ মুজিবকে রাতারাতি কিংবদন্তীর নায়ক করে তুলেছিল এতে কোন সন্দেহ না থাকলেও এর মূল রূপকার ছিলেন লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জাম হোসেন। এই অখ্যাত তরুণ নেভ্যাল অফিসারই প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের। পাঞ্জাবী শোষকদের কবল থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে; এটাও তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদানের পরই। ১৯৫০ সালে তিনি মিডশিপম্যান হয়ে ইংল্যান্ডের রয়্যাল একাডেমীতে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফেরার পর কাজ আরম্ভ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রথমে মাত্র ২জন সহচর নিয়ে শুরু হয় তার বিপ্লবী কর্মকান্ড। কাজে হাত দিয়েই তিনি উপলব্ধি করলেন সবচেয়ে আগে দরকার একজন রাজনৈতিক নেতার। কারণ একজন সামরিক অফিসার হিসেবে চাকুরিতে থেকে ব্যাপকভাবে কাজ করার সুযোগ হবে না তার।

তাছাড়া শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীতে গোপন সংগঠন গড়ে তুললেই বিপ্লব করা সম্ভব হবে না। সংগঠন গড়ে তুলতে হবে দেশের জনগণের মধ্যে। তার জন্য প্রয়োজন বহুল পরিচিত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। সুপরিচিত নেতার ডাকেই অস্ত্র হাতে তুলে নেবে কর্মীরা। তিনি যোগাযোগ শুরু করলেন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সাথে। কিন্তু বেশিরভাগ নেতারাই তার প্রস্তাবে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। যারা দিয়েছেন তারা জুড়ে দিয়েছেন বিভিন্ন শর্ত। তাদের গদি দিতে হবে। অনেকে তাকে পাগলও বলেছেন প্রস্তাব শুনে। ভয়ে আতঁকে উঠেছেন অনেক নামিদামী নেতা। ১৯৬৪ সালে তিনি শেখ মুজিবর রহমানের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেন। শেখ মুজিব তার প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন, যতটুকু সম্ভব পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। এতটুকু পর্যন্তই এর বেশি কিছু নয়। ১৯৬৬ সালে কমান্ডার মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসেন। এতে তার তৎপরতা আরো জোরদার করার সুযোগ পান তিনি। ১৯৬৭ সালের জুন/জুলাই মাসে তিনি তার দুই প্রতিনিধি জনাব স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং জনাব আলী রেজাকে আগরতলাতে পাঠান ভারতীয় সাহায্যের আশায়। তার প্রতিনিধিদের সাথে ভারতীয় সরকারের আলোচনা তেমন ফলপ্রসু হয়নি। বিপ্লবী জনাব স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে স্বাধীনতার মাত্র একমাসের মধ্যে গুম করে ফেলা হয়। মুজিব সরকার কিংবা তার দল এ বিষয়ে বরাবরই এক রহস্যজনক নিরবতা অবলম্বন করে এসেছে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে রাওয়ালপিন্ডি পাঠানো হয়। সেখানে পৌছে বিভিন্ন সূত্রে তিনি জানতে পারেন, পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স সন্দেহ করছে যে কমান্ডার মোয়াজ্জেম রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। এই খবর জানতে পেরে ছদ্মনামে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ ঢাকায় চলে এসে তার ছোট ভাই এর সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িতে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকেন। ৯তারিখ রাত প্রায় ১১টার দিকে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরিরত ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম শিশু (পরবর্তীতে 'জেনারেল রাজপুটিন অফ বাংলাদেশ') ও আরো কয়েকজন হঠাৎ করে বাড়িতে হানা দিয়ে কমান্ডার

মোয়াজ্জেম হোসেনকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি তখন শারীরিকভাবে অসুস্থ। নিয়ে যাবার সময় ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম জনাব মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী কোহিনূর হোসেনকে বলেছিলেন যে, বিশেষ প্রয়োজনে তাকে ঢাকা ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘন্টা খানেকের জন্য। কিন্তু তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল ১৫ মাস পর। অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল তার উপর। দীর্ঘ ১৫ মাস অকথ্য অত্যাচার করেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ তার কাছ থেকে কোন কথাই বের করতে পারেনি। এর পরেই ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শুরু হয় বিখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ১নং আসামী কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। পরবর্তিকালে পাকিস্তানের অধিকর্তারা বুঝতে পারেন, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রধান আসামী বানানোর ফলে সারা বিশ্বের কাছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের ভীষণ বদনাম হচ্ছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এক ঢিলে দুই পাখি মারার। জড়ানো হয় শেখ মুজিবর রহমানকে প্রধান আসামী হিসাবে। পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক মতলব হাসিলের লক্ষ্যে মামলা শুরু হওয়ার পর কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নাম ১নং আসামী থেকে কেটে ২নং আসামীর জায়গায় সরিয়ে নেয়। আর এভাবেই ঐ মামলা সাপে বর হয়ে মুজিবকে গড়ে তুললো কিংবদন্তীর নায়ক হিসেবে। '৬৯ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে মেরে ফেলা হল মিথ্যে অপবাদ দিয়ে। তিনি নাকি বন্দী অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটনারই পূর্ণরাবৃত্তি ঘটেছিল মুজিব শাসনকালে বিপ্লবী নেতা সিরাজ সিকদারের হত্যার মাধ্যমে। শেখ মুজিব সর্ম্পকে কমান্ডার মোয়াজ্জেম তেমন আকর্ষণ বোধ করেননি কখনোই। শেখ মুজিবের দলের উপরও তার আস্থা ছিল না। কমান্ডার মোয়াজ্জেমের স্পষ্টবাদিতাকে শেখ মুজিব কখনই পছন্দ করেননি। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে ভোর ৬টার দিকে হানাদার বাহিনী তাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ির সামনে গুলি করলেও তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে; যার হদিস আজ অব্দি তার পরিবার পরিজন পাননি।

ধর্মপ্রাণ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। নির্ভীক এই মুক্তিযোদ্ধা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ছিলেন তার দেশ ও জাতিকে। সপেঁ দিয়ে গেলেন প্রাণ স্বাধীনতার জন্য। দেশ স্বাধীন হল। শেখ মুজিবর রহমান একচ্ছত্র নেতা বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করলেন, কিন্তু কমান্ডার মোয়াজ্জেমের ত্যাগের প্রতি সম্মান দেখাতে পারেননি তিনি। কখনো সত্যকে তুলে ধরেননি জনগণের সম্মুখে। চুপটি মেরে থেকে সব কৃতিত্ব নিজেই হজম করে গেছেন নির্বিবাদে।

আপোষহীন প্রতিবাদী কন্ঠের অধিকারীদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যই তাদের মেরে ফেলা হয় আর সুবিধাবাদী আপোষকামীদের সবসময় বাচিঁয়ে রাখা হয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। সে হিসেবেই ২৬শে মার্চ প্রাণ দিতে হয়েছিল কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে আর শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাকিস্তানে। এমনটি ঘটেছে সর্বদা, ঘটবে ভবিষ্যতেও। ইতিহাসও তাই বলে।

শেখ মুজিব নিজেই তার পতনের জন্য দায়ী ছিলেন। দুঃখজনক পরিণতির জন্যে অন্য কেউ নয়; স্বয়ং তিনিই দায়ী।

পৃথিবীর ইতিহাসে ক'জন নেতা দেশের মানুষের এত ভালোবাসা পেয়েছেন? কিন্তু পরিবর্তে তিনি জনগণকে আপন করে নিতে পারেননি। দুষ্কৃতিকারী কর্মী ও নেতারা তার কাছে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়েছে। পরিবারের অনেকের বিরুদ্ধে দুঃষ্কর্মের রিপোর্ট পেয়েও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। কর্তৃত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণের জন্য তার চেয়ে অধিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিসম্পন্ন কাউকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তার চরিত্রে ধৈর্য্যের অভাবও ছিল যথেষ্ট। ফলে তিনি পরীক্ষিত ও গুনবান যোগ্য সহযোগীদের কান কথায় বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে অপসারন করেন। তিনি এক পর্যায়ে আপন/পর, বিশ্বস্ত সহযোগী এবং নির্ভরশীল বন্ধু বিবেচনার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন। শেখ মুজিবের এই মানসিকতাকে তার রাজনৈতিক জীবনের চরম ব্যর্থতা ও পরিণতির জন্য একটি বিশেষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যুব নেতাদের দৌরাত্বে গোটা প্রশাসনযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। দেশে দুর্ভিক্ষ। প্রতিদিন হত্যার খবর শুনতে হয় মানুষকে। প্রকাশ্য দিবালোকে নির্বিচারে হত্যাকান্ড প্রায় প্রতিদিন সংঘটিত হয়েছে তখন। বিরোধী দলগুলোকে নির্মূল করার জন্য রক্ষীবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া ছাড়াও দলীয় কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছিল। পুরো দেশ এভাবেই একটা সীমাহীন নৈরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। যে মানুষ একদিন মুজিবের কারামুক্তির জন্য রোজা রেখেছে; নফল নামাজ আদায় করেছে; সেই মানুষই আওয়ামী-বাকশালী শাসনামলে আল্লাহ্পাকের কাছে কেঁদে কেঁদে শেখ মুজিবের দুঃশাসন থেকে মুক্তি চেয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের অপশাসন শেখ মুজিবকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। বাকশালী একনায়কত্ব সৃষ্টি করে তিনি তার দলের মধ্যেও অন্তঃবিরোধ তীব্র করে তোলেন। তার এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি দলের অনেকেই।

বাকশাল গঠন করার আগে জোর প্রচারণা চালানো হল- শেখ মুজিব তার দল ও দলীয় কর্মীদের ক্ষমতার লোভ, লালসা ও দুর্নীতি সর্ম্পকে উদাসীন নন। তিনি বুঝতে পেরেছেন তার পার্টির চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এ পার্টি দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করা আর সম্ভব নয়। তাই তিনি পার্টির বিলুপ্তি ঘোষণা করে একদলীয় সরকার কায়েম করে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করতে যাচ্ছেন। লোকজন ভাবল, তার এই পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে কলুশিত লোকজন ক্ষমতাচ্যুত হবে এবং সে জায়গায় নিয়োগ করা হবে ভালো লোকজনদের। কিন্তু সে আশা অল্প সময়েই কর্পুরের মত বিলীন হয়ে গেল। দেখা গেল পার্টির বিলুপ্তি ঘোষণা করে তিনি যে বাকশাল গঠন করলেন সেখানে ক্ষমতাবলয়ে স্থান পেলো ধিকৃত গাজী গোলাম মোস্তফা, মনসুর আলী এবং শেখ মনি এন্ড গংরাই। তারাই হয়ে উঠল মুখ্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। যাদের অপকর্মের বদৌলতে আওয়ামী লীগ সংগঠন হিসাবে জনগণের আস্থা হারিয়েছিল; তাদের নিয়েই 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' যাত্রা শুরু করলেন শেখ মুজিব। জনগণ হতাশ হয়ে পড়ল। পার্টি বিলুপ্ত করলেও চাটার দলকে বাদ দিতে পারলেন না শেখ মুজিব। বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে আর একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলয়ে পাকাপোক্তভাবে অধিষ্ঠিত করা হল তার পরিবারবর্গকে। ব্যাপারটা এমনই যেন- পুরো দেশটাই শেখ পরিবারের ব্যক্তিগত জমিদারী!

আমরা ঠিক করলাম, জাতিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে যে কোন ত্যাগের বিনিময়েই। পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার। শুরু হল আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে সেনা পরিষদ গড়ে তোলার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। দেশের প্রতিটি সেনানিবাসের বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্টে সমমনা

অফিসার ও সৈনিকদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে গোপন সংগঠন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, শেখ মুজিবকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আগেই বিপ্লব ঘটিয়ে শেখ মুজিবের একনায়কত্ব ও বাকশালের পতন ঘটাতে হবে। বিপ্লবকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সাংগঠনিক তৎপরতা তরিৎ গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলে কেন্দ্রিয় কমিটি।

প্ল্যানিং ষ্টেজের এক পর্যায়ে একদিন লেঃ কর্নেল আব্দুর রশিদ খন্দোকার সেনা পরিষদের কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের কয়েকজনের সাথে সাক্ষাৎ করে। মিটি-এ দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও শেখ মুজিবকে আজীবন রাষ্ট্রপতি বানাবার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে লেঃ কর্নেল রশিদ অভিমত প্রকাশ করে যে, শেখ মুজিব যদি একবার পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতায় আসন গেড়ে বসে তবে তার স্বৈরাচারী সরকারের জোয়াল থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করা খুবই দূরূহ হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দুর্বলতার কারণে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সে ও লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দোকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকারের কথা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এ ব্যাপারে সেনা পরিষদের নেতাদের অভিমত কি তা জানতে চায় লেঃ কর্নেল রশিদ। লেঃ কর্নেল রশিদ ও লেঃ কর্নেল ফারুক দু'জনেই মুক্তিযোদ্ধা। সেই সময় লেঃ কর্নেল রশিদ ও লেঃ কর্নেল ফারুক যথাক্রমে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ও ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারস এর অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছিল। দু'টো ইউনিটই তখন ঢাকায়। দু'জনই সেনা পরিষদের নেতৃবৃন্দের কাছে সুপরিচিত। তাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রশ্নে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই লেঃ কর্নেল রশিদকে সেনা পরিষদের সিদ্ধান্তের কথা খুলে বলা হল। সব শুনে লেঃ কর্নেল রশিদ প্রস্তাব রাখলো যৌথ উদ্যোগে অভ্যুত্থান সংগঠিত করার। তার প্রস্তাবে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলা হল, অভ্যুত্থানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী সর্ম্পকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত রয়েছে সেনা পরিষদের। আলোচনা সাপেক্ষে সেগুলোতে ঐক্যমত্য হলেই সেনা পরিষদ তার প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। লেঃ কর্নেল রশিদ আলোচনা করতে রাজি হওয়ায় পরবর্তিকালে ঐ সকল বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সেনা পরিষদের তরফ থেকে লেঃ কর্নেল রশিদকে জানানো হয় বিপ্লবের পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানই হবেন চীফ অফ আর্মি ষ্টাফ। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেঃ কর্নেল রশিদ প্রস্তাব রাখে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দোকারকে অব্যাহতি দিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এমজি তোয়াবকে বিমান বাহিনী প্রধান হিসাবে নিয়োগ করার। তার এই প্রস্তাব সেনা পরিষদ মেনে নেয়। ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যৌথ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেনা পরিষদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যাবলী ও নূন্যতম প্রোগ্রাম সম্পর্কে খন্দোকার মোশতাক সম্মতি প্রদান করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খবরা-খবর আদান-প্রদান ও যৌথভাবে বিপ্লবের কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এভাবেই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে অভ্যুত্থানের সফলতার সম্ভবনা স্বাভাবিক কারণেই আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত (সেনাপরিষদ একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করার সিদ্ধান্ত নেয়)

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং দেশবাসীকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দেবার জন্য সেনা পরিষদ একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাকশাল কায়েমের ফলে দেশ এক চরম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর সব কয়টাই তখন নিষিদ্ধ এবং রাজনৈতিক তৎপরতাকে বলপূর্বক আন্ডারগ্রাউন্ডে ঠেলে দিয়েছিল বাকশাল সরকার।

আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে দেশের নতুন পরিসি'তি নিয়ে মত বিনিময় করতে লাগলাম। জাতীয় অবস্থার পর্যালোচনা করে সবাই একমত হলাম, একদলীয় নিষ্পেষনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে অবিলম্বে। পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে গণতন্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার। বাকশালের শিকড় বাংলার মাটিতে প্রথিত হবার আগেই উপড়ে ফেলতে হবে। একনায়কত্বের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণকে মুক্ত করার সাথে সাথে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু এই রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার যাদের সে সমস্ত দেশপ্রেমিক এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তি ও সামর্থ্য অত্যন্ত কম। স্বৈরশাসনের ষ্টিমরোলারের পেষণে তাদের আরো দুর্বল করে ফেলা হচ্ছে দিন দিন। এ ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সরকার বদল করার কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। শিকড় গেড়ে বসার আগেই একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক মহল থেকে অনেকেই ঈঙ্গিত দিলেন, সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক হলেই সম্ভব হবে এই একনায়কত্ব ও স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে জাতিকে মুক্ত করা। তাদের এ ধরণের ঈঙ্গিতের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম আমরা। যেখানে সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একনায়কত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব নয় সেখানে স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করার জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মাধ্যমেই উৎখাত করতে হয় স্বৈরাচারী সরকার। এর কোন বিকল্প থাকে না বলেই জনগণ স্বাগত জানায় ঐ ধরণের যে কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপকে। স্বতঃস্ফুর্ত জনসমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লব অর্জন করে তার নৈতিক ও আইনগত বৈধতা। খন্দোকার মোশতাক আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রীমনা নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে একই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যে কোন বৈপ্লবিক উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে সর্বোতভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছেন তিনি এবং আরো অনেকেই। মোশতাক সাহেবের এ ধরণের উক্তির পেছনে আওয়ামী লীগের একটা বড় অংশের সমর্থন ছিল। ইস্তফা দেবার পর জেনারেল ওসমানীর সাথে দেখা করতে গেলে বাকশাল সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপের সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "মুজিব খানকে সরাতে হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?"

এদিকে বাকশালী একনায়কত্ব স্থাপন করেও শেখ মুজিব তার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। সিদ্ধান্ত হল- তাকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা দেবে বাকশাল। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেয়ার কথা প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তাকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেটাতে শেখ মুজিব সন্তুষ্ট হতে পারেননি বলেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তাকে আজীবন রাষ্ট্রপতি বানাবার। আরো খবর পাওয়া গেল সমস্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মাঝ থেকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় সরকার বিরোধী মনোভাবাপন্ন দুই লক্ষ লোকের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা গভর্ণর ও তাদের অধিনস্থ রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে ঐ তালিকাভুক্ত লোকদের মেরে ফেলা হবে। এই নীলনকশা

বাস্তবায়িত করে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন বাংলাদেশের জনগণের প্রতিবাদী কন্ঠকে আগামী কয়েক দশকের জন্য স্তব্ধ করে দিতে। এভাবে রাজনৈতিক বিপক্ষ শক্তিকে সমূলে উৎপাটন করার এক হীন চক্রান্ত করা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশেই।

খন্দোকার মোশতাক আহমদ সম্পর্কে সেনা পরিষদের মূল্যায়ন

খন্দোকার মোশতাক আহমদ ছিলেন রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অধিকারী। বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদ যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই আমাদের নজরে পড়েন। রুশ-ভারত আধিপত্যবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি।

আমরা খন্দোকার মোশতাককে '৭১ এর সংগ্রামকাল থেকে দেখে আসছি। তিনি ছিলেন ঘোর রুশ-ভারত বিরোধী। ধর্মপ্রাণ প্রবীণ নেতা খন্দোকার মোশতাক ছিলেন নীতির প্রশ্নে আপোষহীন। একজন সাচ্চা গণতান্ত্রিক এবং উদারপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিলেন। আলাপ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের অনেকেই খন্দোকার মোশতাকের ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করে অভিমত পর্যন্ত ব্যক্ত করেছেন যে, নেতৃত্বের যোগ্যতার বিচারে খন্দোকার মোশতাকের স্থান শেখ মুজিবর রহমানেরও উপরে। তাদের এ ধরণের মনোভাব থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, খন্দোকার মোশতাকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হলে তারা অতি সহজেই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে বিপ্লবের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাবেন। ফলে আওয়ামী বাকশালীদের বৃহৎ অংশকে শুধু যে নিউট্রালাইজ করাই সম্ভব হবে তা নয়; এতে করে বাকশালী যোগসাজসে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও অনেকাংশে কমে যাবে। আওয়ামী-বাকশালী নেতাদের সমর্থন পেলে রক্ষীবাহিনীকে নিরস্ত্র করার কাজটিও সহজ হয়ে যেতে পারে। তার আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচন্ড। তিনি যে একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তা নয়; তার পান্ডিত্যের গন্ডিও ছিল বিস্তৃত। রসিক এবং মিতভাসী জনাব মোশতাকের উপস্থিত বুদ্ধি ছিল চমকপ্রদ। নীতি ও নিখাদ দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন জনাব মোশতাক সেচ ও পানি সম্পদ মন্ত্রী হিসাবে। ভারতীয় পক্ষের সব চাপকে উপেক্ষা করে তিনি বাংলাদেশের স্বার্থের ব্যাপারে কোন ছাড় না দিয়ে অটল থাকেন; ফলে তাকে খেসারত হিসাবে মন্ত্রীত্ব হারাতে হয়। শেখ মুজিব তাকে ঐ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেন।

এছাড়া পশ্চিমা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতাবলয়ে একজন ধর্মপ্রাণ, উদারপন্থী, গণতন্ত্রীমনা রাজনীতিবিদ হিসেবে খন্দোকার মোশতাকের একটা ইতিবাচক গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। এ সমস্ত দেশের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের অনেকের সাথেই তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই অবস্থায় খন্দোকার মোশতাক আহমদকে সরকারের রাষ্ট্রপতি বানালে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এবং মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর স্বীকৃতি ও সমর্থন আমরা সহজেই পেতে পারব। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিনে বেসামরিক সরকার গঠন করলে আমরা দেশে-বিদেশে এটাও প্রমাণ করতে পারব যে, বাংলাদেশের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটেছে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে। স্বৈরশাসন ও রুশ-ভারতের নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বিস্তারিত বিশ্লেষনের পরই খন্দোকার মোশতাক আহমদকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

সেনা পরিষদকে অনেক জটিল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল। বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে সে সমস্ত সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কেও ভেবে দেখতে হয়েছিল নেতৃবৃন্দকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহিত তথ্যাবলী ও খবরা-খবরের ভিত্তিতেই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সর্বপ্রথম ঠিক করতে হয়েছিল- কবে বিপ্লব ঘটানো হবে, কি পরিসরে সংগঠিত করা হবে বিপ্লব? খবর ছিল, ১৫ই আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ এবং কেন্দ্রিয় নেতারা ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের প্রায় সব বাকশালী নেতারাই উপস্থিত থাকবেন। নব্যনিযুক্ত জেলা গভর্ণররা এবং জেলা পর্যায়ের নেতারা ইতিমধ্যেই ঢাকা শহরে এবং শেরে বাংলা নগরের এমপি হোস্টেলে ভীড় জমিয়েছেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে পুলিশ এবং স্পেশাল স্কোয়ার্ড। নেতাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য ছাড়াও শেখ মনি ও শেখ কামালের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের অস্ত্রধারীরাও থাকবে অনুষ্ঠানে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে ভার্সিটি এলাকায় টহল দেবার জন্য মোতায়েন করা হবে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান এবং ডেপুটি ডাইরেক্টর কর্নেল সাব্বিউদ্দিন দু'জনেই ঘটনাক্রমে সেদিন দেশের বাইরে অবস্থান করবেন। ঐ দিনটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস বিধায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আনন্দ উৎসব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ভারত সরকার। ১৪-১৫ তারিখ এর রাত ঢাকা ব্রিগেডের নাইট ট্রেনিং এর জন্য নির্ধারিত।

১২ই আগষ্ট এক বৈঠকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিপ্লব সংগঠিত হবে ১৫ই আগষ্ট সুবেহ্ সাদেকে। যেহেতু বাকশালী নেতাদের প্রায় সবাই সেদিন ঢাকায় অবস্থান করবেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ঢাকাতে অপারেশন চালিয়ে বিপ্লবকে সফল করে তোলা সম্ভব হবে। সীমিত পরিসরে বিপ্লব ঘটালে বিপ্লবের সফলতার জন্য অতি প্রয়োজনীয় তিনটি উপকরণ যথা:-

(ক) নূন্যতম শক্তির প্রয়োগ
(খ) গতিশীলতা
(গ) গোপনীয়তা

অতি সহজেই হাসিল করা যাবে। টার্গেট হিসাবে নির্ধারন করা হয় রাষ্ট্রপতি, শেখ ফজলুল হক মনি, মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, সেরনিয়াবাত, সৈয়দ হোসেন, তাজুদ্দিন আহমদ, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক। এদের বন্দী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রেডিও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ টিভি, ওয়্যারলেস সেন্টার, টিএন্ডটি, জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদর দফতর, রক্ষীবাহিনীর সাভারের মূল ক্যাম্প, সংসদ সদস্যদের হোষ্টেল, এয়ারপোর্ট, সাভার ট্রান্সমিশন-রিলে সেন্টার প্রভৃতি স্থানগুলো নিয়ন্ত্রণে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সীমিত পরিসরে নূন্যতম শক্তি প্রয়োগ করে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করা হবে নির্ধারিত টার্গেটগুলোর উপর। একই সাথে দেশের অন্যান্য সেনা নিবাসের ইউনিটগুলোর সেনা পরিষদগুলোকে সর্তক অবস্থায় রাখা হবে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে; যাতে করে প্রয়োজনে যে কোন প্রতিবন্ধকতা কিংবা সীমান্তের ওপার থেকে কোনপ্রকার সামরিক হুমকির যথাযথভাবে মোকাবেলা করা যায় জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

কেন্দ্রিয় কমিটি '৭১ থেকে '৭৫ সাল অব্দি দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং বিপ্লব সর্ম্পকে একটি দলিল তৈরি করে সেনা পরিষদের সব ইউনিটে বিতরণ করে। দলিলের সারবস্তু ছিল নিম্নরূপ: -

রুশ সামাজিক সম্প্রসারণবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ১৯৭১এর স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল আপোষকামী শ্রেণীর প্রতিভূ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের যোগসাজসে বাংলাদেশকে তাদের একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। শেখ মুজিবর রহমান এবং আওয়ামী লীগের প্রতারণা ও ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়ে উঠেছে অর্থহীন। স্বাধীকার ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতীয় সংগ্রাম নিক্ষিপ্ত হয়েছে ব্যর্থতার অন্ধ গলিতে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ভৌগলিক স্বাধীনতা লাভ করে বটে কিন্তু জাতীয় মুক্তির পথ সুকৌশলে বন্ধ করে দেয় আওয়ামী লীগ সরকার ও তার বিদেশী প্রভুরা। স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের শাসনামলের চার বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের এক চরম বিভীষিকাময় কাল। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, সম্প্রসারণবাদী নীলনকশা এবং ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠির ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্র, অবিচার, অত্যাচার এবং অবাধ দুর্নীতি জাতীয় জীবনকে করে তুলেছে র্দুবিষহ। জাতীয় সম্পদের অবাধ লুন্ঠনের ফলে দেশের অর্থনীতি হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এবং দেশ আজ পৌঁছে গেছে চুড়ান্ত ধ্বংসের শেষপ্রান্তে। জাতীয় রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে চরম নৈরাজ্য ও স্থিতিহীনতা। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করার দায়িত্ব স্বভাবতঃই বর্তায় প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর উপর। কিন্তু আওয়ামী-বাকশালী শ্বেত সন্ত্রাস এবং সুপরিকল্পিত চক্রান্তের মুখে সাংবিধানিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মুজিব সরকারকে উৎখাত করা তাদের পক্ষে আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকারি নির্যাতন ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোর অপারগতার মূল কারণ হল- তাদের অনৈক্য, তাত্বিক জ্ঞানের দেউলিয়াপনা, সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের কোন্দল এবং নেতাদের স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকতা। দেশ ও জাতি আজ এক চরম সংকটে নিমজ্জিত। স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে হতাশাগ্রস্থ জাতিকে মুক্ত করা আজ প্রতিটি দেশপ্রেমিকের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন উপায়ে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব নয় বলেই এ গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করার অভিপ্রায়ে একটি জনপ্রিয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটাবার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে সেনা পরিষদ। বিপ্লবের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জনগণের উপর সামরিক শাসনের বোঝা চাপিয়ে দেয়া নয়। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করে সামরিক শাসন কায়েম করা হয়েছে কিন্তু এভাবে সামরিক বাহিনীকে সরাসরিভাবে জাতীয় রাজনীতিতে জড়ানোর পরিণামে সে সমস্ত দেশে উচ্চভিলাসী সামরিক শাসকবৃন্দের গোষ্ঠিস্বার্থই চরিতার্থ হয়েছে; জাতি ও দেশের কোন কল্যাণ হয়নি। কোন বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ হাসিল করা আমাদের বিপ্লবের উদ্দেশ্য নয়। এই বিপ্লবের চরিত্র হবে অন্যান্য দেশে সাধারণভাবে সংগঠিত যে কোন ক্যু'দ্যাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেনা পরিষদ দেশবাসী এবং সারাবিশ্বে প্রমাণ করবে- বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশ দেশপ্রেমিক; ক্ষমতালিপ্সু, সুযোগ সন্ধানী নয়। অবস্থার সুযোগ নিয়ে জনগণের রক্ষক হয়ে ভক্ষক বনে যাবার অভিপ্রায় তাদের নেই। দেশ ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় নির্ভীক, নিবেদিত প্রাণ সৈনিক তারা। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই বিপ্লব। স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো হবে যাতে করে সুষ্ঠ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটাবার জন্য দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা সংগঠিত হতে পারেন গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারাবাহিকতায়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব হবে দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলসমূহের। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের। সেনাবাহিনী দেশ ও জাতীয় স্বার্থের অতন্ত্র প্রহরী হয়ে র্নিবাচিত সরকারের অধিনে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে যাবে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে। প্রমাণ করা হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। জাতীয় স্বার্থই তাদের কাছে মুখ্য, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠি স্বার্থ নয়। অনন্য এই বিপ্লব নিখাদ দেশপ্রেমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমূলক মাইলফলক হিসাবে স্থাপিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে।

আসন্ন বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীঃ -

১। রুশ-ভারতের নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা।

২। মানবাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩। "দ্বিতীয় বিপ্লবের" নামে বাকশাল ও মুজিব সরকারের প্রতারণামূলক কার্যক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা।

৪। কৌশলগত কারণে স্বল্প সময়ের জন্য সংসদকে বলবৎ রেখে সাংবিধানিকভাবে একটি দেশপ্রেমিক সর্বদলীয় অস্থায়ী / নির্দলীয় সরকার গঠন করা।

সর্বদলীয় অস্থায়ী / নির্দলীয় সরকারের দায়িত্বঃ

১। বাকশাল প্রণোদিত শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা আইন, রক্ষীবাহিনী আইন, আর্ন্তজাতিক শ্রমিক আইনের পরিপন্থী শ্রমিক আইন ও অন্যান্য কালা-কানুন বাতিল করা।

২। রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে দেশে অবিলম্বে প্রকাশ্য রাজনীতি ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩। সকল রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া।

৪। সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৫। জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা এবং জরুরী ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম ছেলে-মেয়েদের সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অবকাঠামো গড়ে তোলা।

৬। সমাজতন্ত্রের নামে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব ও সরকারি সহযোগিতায় জাতীয় সম্পদ লুন্ঠন, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চোরাচালান ও অবাধ দুর্নীতির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটিয়ে বিপর্যস্ত দেউলিয়া অর্থনীতির পূর্ণবিন্যাসের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭। জাতীয় জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বিচার বিভাগের পুর্ণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দেশে আইনের শাসন প্রবর্তন করা।

৮। প্রশাসন কাঠামোকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

৯। রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহে বাংলাদেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জীবনাদর্শের প্রতিফলন নিশ্চিত করার সাথে সাথে সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

১০। পঁচিশ বছরের মৈত্রী চুক্তি বাতিল করা।

উল্লেখিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই সংগঠিত করা হবে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।ঐতিহাসিক বিপ্লবের চুড়ান্ত পরিকল্পনা ও নির্দেশাবলী যথাসময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রিয় কমিটির তরফ থেকে জানানো হবে।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি

১২ই আগষ্ট মিটিং এর পর শুরু হয় ঘড়ির কাটায় সময় গোনার পালা ।

১৪ই আগষ্ট রাত ঢাকা বিগ্রেডের নাইট প্যারেড। এই অযুহাতে বিপ্লবের শেষ পর্যায়ের সব প্রস্তুতি শেষ করে ১৫ই আগষ্ট সুবেহ্ সাদেকে আল্লাহ্তা'য়ালার নাম করেই বিপ্লব শুরু করা হল। পূর্ব নির্ধারিত টার্গেটিগুলোর উপর অভিযান চালানো হল। অতি সহজেই স্ট্র্যাটেজিক পজিশনগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হল। শেখ মুজিব, শেখ মনি ও সেরনিয়াবাতের বাড়ি থেকে বাধা এল। প্রথম গোলাগুলি শুরু করা হল বাড়িগুলো থেকেই। গুলিতে তিনজন বিপ্লবী শহীদ হলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমান্ডাররা নির্দেশ দিতে বাধ্য হলেন পাল্টা আক্রমণ চালানোর। সংঘর্ষে নিহত হলেন শেখ মুজিব ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য। শেখ মনি ও সেরনিয়াবাতের বাড়িতে অবস্থানরত অস্ত্রধারীদের কয়েকজন মারা গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সব টার্গেটিগুলোই নিউট্রেলাইজ করা সম্ভব হল। রেডিও বাংলাদেশের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হল, শেখ মুজিবের সরকারের পতনের কথা। একই সাথে ঘোষণা করা হল, খন্দোকার মোশতাক আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। মার্শাল'ল জারি করা হল দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। জনগণের কাছে আবেদন জানানো হল- বিপ্লবের সমর্থনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের পতন ঘটেছে জানতে পেরে সমগ্র জাতি সেদিন স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে ঢাকার রাস্তায় লোকের ঢল নেমেছিল। জনগণ সারাদেশ জুড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে। মসজিদে মসজিদে লোকজন সেদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যদের জন্য বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেছিলেন। মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল মহল্লায় মহল্লায়। শেখ মুজিব ও তার দোসরদের জন্য সেদিন বাংলাদেশের জনগণ "ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন" পড়তেও ভুলে গিয়েছিলেন। সবারই এক কথা, "দেশ জালিমের হাত থেকে বেঁচে গেছে।"

আমরা জানতাম বাকশালী শাসনে জনগণ অতিষ্ঠ। কিন্তু আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠি যে এতটা ধিকৃত হয়ে উঠেছিল জনগণের কাছে সেটা উপলব্দি করতে পেরেছিলাম বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর জনগণের অভূতপূর্ব ও স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থনের বহিঃপ্রকাশে। বাংলাদেশের মানুষ জাতির ক্রান্তিলগ্নে অতীতে সবসময় সঠিক রায় দিয়ে এসেছেন সেটাই তারা আরেকবার প্রমাণ করলেন ১৫ই আগষ্টের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে। সমগ্র জাতির প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অভিভূত করেছিল। জনগণের দেশপ্রেম দেখে জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেছিলাম আমি। নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম জাতি ও দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছিলাম ভেবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৃহৎ স্বার্থে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সার্থকতা সেদিনই পেয়ে গিয়েছিলাম জনগণের দোয়া ও আন্তরিক অভিনন্দনে। জনগণের উপর বিশ্বাস ও প্রত্যয় বেড়ে গিয়েছিল। বুঝে নিয়েছিলাম বাংলাদেশের ৮কোটি মুসলমানকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না কোন অপশক্তিই। সব চক্রান্তের ব্যুহভেদ করে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে নিজের স্থান করে নেবে একদিন বাংলাদেশের সচেতন সংগ্রামী জনতা। জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থনের জোয়ারে সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে পড়ল রুশ-ভারত চক্র। গণবিচ্ছিন্ন দেশ বিরোধী বিশ্বাসঘাতকরা সেদিন প্রাণের ভয়ে লেজ গুটিয়ে আত্মরক্ষার জন্য গর্তে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু সেখানেও রেহাই পায়নি তারা। জনগণ জাতীয় বেঈমানদের খুঁজে বের করে ধরিয়ে দিতে থাকে আইন-শৃঙ্খলা পালনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে। এ অবস্থায় বাকশালী চক্রের যে সমস্ত নেতারা জান বাঁচাবার চেষ্টায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই জনগণের কাছ থেকে কোন সাহায্য-সহযোগিতা না পেয়ে উপায়হীন হয়ে স্বেচ্ছায় সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন। জনাব তোফায়েল আহমেদ এবং জনাব আব্দুর রাজ্জাক

তাদের মধ্যে অন্যতম। জনাব কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল থেকে একটি টেলিগ্রাম করে তাতে জানায়, সে রাষ্ট্রপতির কাছে আত্মসমর্পন করতে চায়। এ টেলিগ্রামের কোন জবাব না পেয়ে প্রাণের ভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকারের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে দেশ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর সহযোগিতায় তার দ্বারা পরিচালিত এক সশস্ত্র হামলার মোকাবেলা করতে গিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক তরুণ অফিসার ও চারজন সৈনিক শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জিয়া সরকার দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তার বিচার করে। বিচারে আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দীর্ঘ মেয়াদী সাজা প্রদান করে। তখন থেকেই রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে হালে বাংলাদেশে ফিরে এসে রাজনীতিতে আবার পুনর্বাসিত হয়েছে সেই কাদের সিদ্দিকী। কাদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রদ্রোহী কাদের সিদ্দিকী আবার বাংলাদেশের মাটিতে প্রকাশ্য রাজনীতি করার সুযোগ পেল এই রহস্যের উদঘাটনও ঘটবে একদিন এই বাংলাদেশের মাটিতেই।

ফিরে যাওয়া যাক ১৫ই আগষ্টে। অপারেশন শেষ। রেডিওতে সরকার পতন ও শেখ মুজিবের নিহত হবার খবর ঘোষিত হয়েছে। আমি কিছু জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলাম; হঠাৎ ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার এসে জানাল রক্ষীবাহিনীর তিনটি ট্রাক ও একটি জিপ টিএসসি-র দিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারলাম এরা রক্ষীবাহিনীর টহলদার ইউনিট। শেখ মুজিবের বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবের মৃত্যু সংবাদ যদি শুনে থাকে তবে তাদের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সংঘর্ষ অনিবার্য। আর যদি না শুনে থাকে তবে তাদের খবরটা জানিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে শাহরিয়ারকে বললাম, "আমি ওদের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য যাচ্ছি। ওদের সমর্থন না পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য তুমি তৈরি থেকো।" জিপ চালিয়ে একাই বেরিয়ে এলাম গেট দিয়ে। পিজি হাসপাতাল এর সামনে পৌঁছতেই দেখলাম কনভয়টি পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে এসে থেমেছে। আমি জিপ থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম জিপে বসে আছে রক্ষীবাহিনীর একজন লিডার। লিডার আমাকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে স্যালুট করে দাড়াল।

— তোমরা এখানে কি করছ? প্রশ্ন করলাম।

— আমরা টহল দিচ্ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। গোলাগুলির শব্দ শুনে এদিকে এসেছি। জবাব দিল লিডার।

বুঝলাম ওরা বিপ্লব ও মুজিবের মৃত্যুর খবরটা এখনও শোনেনি। লিডার জিজ্ঞাসা করল,

— ব্যাপার কি স্যার?

বললাম,

— শেখ মুজিবের সরকারের পতন ঘটিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। শেখ মুজিব মারা গেছেন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে। এ পরিস্থিতিতে তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমরা এই পরিবর্তনের পক্ষে না বিপক্ষে।

অল্পক্ষণ চিন্তা করে লিডার বলল,

— আমরা পরিবর্তনের সপক্ষে।

আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ট্রুপসদের গাড়ি থেকে নামিয়ে তাদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলে তাদের মতামত জানতে চাইলে সবাই একবাক্যে পরিবর্তনকে সমর্থন জানাল। এরপর সবাইকে সাথে নিয়ে "নারায়ে তাকবির। আল্লাহু আকবর", "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ", "সিপাই সিপাই ভাই ভাই" প্রভৃতি শ্লোগান দিতে দিতে রেডিওতে ফিরে এলাম। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে বুঝেছিলাম, ওদের সর্ম্পকে আমাদের মূল্যায়ন ছিল নির্ভুল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল (অবঃ) তাহের, কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন, মেজর (অবঃ) শাহজাহান ওমর, মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দিন, মেজর (অবঃ) রহমতউল্লাহ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) মাজেদ এবং এক্স পিএমএ ক্যাডেট মোস্তাক ও সরাফত এসে হাজির হল রেডিও বাংলাদেশে।

ঘোষণা শুনেই এসেছে তারা বিপ্লবের প্রতি তাদের সমর্থন ও অভিনন্দন জানাতে। খবর এল পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী ইতিমধ্যেই সাভারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পকে নিরস্ত্র করে তাদের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। লেঃ কর্নেল রশিদ চলে গেছে জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদকে নিয়ে আসার জন্য আর আমি গেলাম মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও বাহিনী প্রধানদের নিয়ে আসতে। ঘটনাগুলো ঘটছিল অতি তরিৎ গতিতে।

ঢাকা সেনানিবাস তখন সম্পুর্ণভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে সারা ক্যান্টনমেন্টে। অতি প্রত্যুষে বিপ্লবের খবর পেয়ে জেনারেল শফিউল্লাহ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলকে ফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের পক্ষে তখন কিছুই করা সম্ভব ছিল না। তিনি ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন বটে কিন্তু তার অধিনস্থ রেজিমেন্ট ও ব্যাটালিয়নগুলো সবই তখন সেনা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের স্বপক্ষে। শাফায়াত জামিলের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে জেনারেল শফিউল্লাহ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ) কে অনুরোধ জানান কিছু করার জন্য। ব্রিগেডিয়ার খালেদ জবাবে তাকে জানান, **"Bangabandhu is dead. The army has revolted and whole army has celebrated."** এ পরিস্থিতিতে কারো কিছু করার নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমি জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দোকার, নৌবাহিনী প্রধান এমএইচ খানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম রেডিও বাংলাদেশে। রশিদ ফিরে এল জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমেদকে নিয়ে। আমিন ফিরে এল তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রক্ষীবাহিনী প্রধান কর্নেল আবুল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে। বিডিআর প্রধানকেও ডেকে আনা হল। রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমদ রেডিও-তে জাতির প্রতি তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানরা সবাই রাষ্ট্রপ্রধান খন্দোকার মোশতাক আহমদের আনুগত্য প্রকাশ করে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের স্বপক্ষে ভাষণ দিলেন রেডিওতে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আওয়ামী-বাকশালী নেতারা অনেকেই গ্রেফতার হন। ঐ দিনই জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ করেন। অস্থায়ী বিচারপতি সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেন এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। একই দিন উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন জনাব মাহমুদুল্লাহ। মন্ত্রী পরিষদও গঠিত হয় সেদিনই।

মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ:

পূর্ণ মন্ত্রী গনের তালিকাঃ

১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
২. অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
৩. ফনিভূষণ মজুমদার
৪. মোঃ সোহরাব হোসেন
৫. আব্দুল মান্নান
৬. মনরঞ্জন ধর
৭. আব্দুল মোমেন
৮. আসাদুজ্জামান খান
৯. ডঃ এ আর মল্লিক
১০. ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী

প্রতিমন্ত্রী গনের তালিকাঃ

১. শাহ মোয়াজ্জম হোসেন
২. দেওয়ান ফরিদ গাজী
৩. তাহের উদ্দিন ঠাকুর

৪. অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
৫. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর
৬. কে এম ওবায়দুর রহমান
৭. মোসলেম উদ্দিন খান
৮. রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ
৯. ক্ষিতিশচন্দ্র মন্ডল
১০. সৈয়দ আলতাফ হোসেন
১১. মোমিন উদ্দিন আহমদ

খন্দোকার মোশতাক সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল পরবর্তিকালে। বাকশাল সরকারের ১৮জন মন্ত্রীর ১০জন এবং ৯জন প্রতিমন্ত্রীর ৮জনই মোশতাক সরকারে যোগদান করেছিলেন ১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়ে। পাকিস্তান অভ্যুত্থানের প্রথম দিনই খন্দোকার মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। যে সৌদি আরব মুজিব সরকারকে দীর্ঘ সাড়ে চার বছর স্বীকৃতি দেয়া থেকে বিরত ছিল সেই সৌদি আরবও অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় দিনে মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। গণচীন শুধু মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতিই দান করেনি; পিকিং বেতার ও ভয়েস অব আমেরিকা অভুত্থানের সমর্থনে একই সাথে হুশিঁয়ার বাণী প্রচার করে, "**বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন একটি আভ্যন্তরীন ব্যাপার। সে দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপার বিদেশী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীন সহ্য করবে না। এ ধরণের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে বিধায় গণচীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ধরণের হস্তক্ষেপে নিশ্চুপ থাকবে না। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই তারা গ্রহণ করবে।**" শুধু হুশিঁয়ারীই নয়; গণচীনের সেনাবাহিনীকে ভারতের যে কোন আগ্রাসী হামলার মোকাবেলায় সীমান্ত অবস্থান জোরদার করে তোলার হুকুম দিয়েছিল গণচীনের সরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীনের হুশিঁয়ারী এবং দেশের জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সরকার ১৭ই আগষ্ট বাংলাদেশে আগ্রাসী সামরিক অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়; অভ্যুত্থানের ১২দিনের মাথায় জাপান, ইরান, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আরো ৩৯টা দেশের সাথে ভারতও মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

অস্থায়ী সরকারের গৃহিত নীতি ও পদক্ষেপসমূহ

ক্ষমতা গ্রহণের পরই খন্দোকার মোশতাক শক্তহাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার হাল ধরেন। সেনা পরিষদ তাকে পর্দার অন্তরাল থেকে সার্বিক সাহায্য প্রদান করতে থাকে। অনেক কিছুই করণীয়। খুব সতর্কতার সাথে অগ্রাধিকার ঠিক করা হচ্ছিল প্রতিক্ষেত্রে।

রেডক্রস এর চেয়্যারম্যান পদ থেকে কুখ্যাত গাজী গোলাম মোস্তফাকে অপসারিত করে বিচারপতি বি.এ সিদ্দিককে তার পদে নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোশতাক এক অধ্যাদেশ জারি করে একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করে দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। মুজিব কর্তৃক দেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করে গভর্ণর নিয়োগের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। দেশের ১৯টি জেলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জেলা প্রশাসকদের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়। দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি, মুজিব সরকারের ৬জন মন্ত্রী, ১০জন সংসদ সদস্য, ৪জন আমলা এবং ১২জন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিচারের জন্য দু'টো বিশেষ আদালত গঠিত হয়। সামরিক বাহিনীর ৩৬ জন দুর্নীতিপরায়ন অফিসারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। রাজবন্দীদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বিলুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়। সরকারি আদেশে মশিউর রহমান এবং অলি আহাদকে বিনাশর্তে মুক্তি দান করা হয় ২৫শে আগষ্ট। একই দিনে জেনারেল ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির নয়া সামরিক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে জয়েন্ট চীফ অব ডিফেন্স ষ্টাফ হিসাবে এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর স্থানে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আর্মি চীফ অফ ষ্টাফ হিসাবে নিয়োগ করা হয়। বিমানবাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ হিসাবে নিযুক্ত হন এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব।

দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকা দুইটি মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৬ই আগষ্ট মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী নয়া সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এক বার্তা পাঠান। দেশের প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, নেতা এবং গণসংগঠনের সমর্থনও লাভ করতে সমর্থ হয় নতুন সরকার। তারা সবাই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে তাদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ৩রা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মোশতাক ঘোষণা করেন, "১৯৭৬ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে দেশে বহুদলীয় অবাধ রাজনীতি পুনরায় চালু করা হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী দেশে সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত করা হবে।"

এভাবেই উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নেবার ফলে দেশের সার্বিক অবস্থা অতি অল্প সময়ে শুধুমাত্র স্বাভাবিকই হয়ে উঠেছিল তাই নয়; দেশের আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং কল-কারখানার উৎপাদনেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। দেশে চুরি-ডাকাতি ও চোরাচালানের মাত্রা কমে যায় বহুলাংশে। দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে পূর্ণমাত্রায়। দেশে বিদেশে অস্থায়ী সরকারের নীতিসমূহ ও পদক্ষেপগুলি প্রশংসিত হয়।

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাপ্তাহিক দি টাইমস প্রেসিডেন্ট খন্দোকার মোশতাকের উপর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করে। সেখানে তাকে তৃতীয় বিশ্বের একজন অসাধারণ স্টেটসম্যান, ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্বার অধিকারী একজন রসিক ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয়। তার সম্পর্কে এও বলা হয় আকারে ছোট হলেও বুদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ভারতের লাল বাহাদুর শাস্ত্রীরও উপরে। এ ধরণের উক্তি যে কোন জাতির জন্যই বিশেষ গর্বের বিষয়।

১৫ই আগষ্ট ছিল জাতীয় মুক্তির দিন

জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো সেই সত্যকেই তুলে ধরেছিল। ইতিহাসও সেই সত্যকেই বহন করবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের বিপ্লব দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সমসাময়িক দেশ বিদেশের প্রতিক্রিয়াতেই তা লেখা রয়েছে। ইতিহাসেও তা থাকবে। আজ আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ৩০বছর আগে স্বাধীনতার যাত্রাকাল থেকে ক্ষমতাসীনরা যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করত, যদি সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা থাকত, যদি বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কার্যক্রম ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকত, যদি অন্যায়-অত্যাচার, হত্যা-নির্যাতন না হত, যদি সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল থাকত তাহলে দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হত না।

১৬ই আগষ্ট ১৯৭৫ দৈনিক ইত্তেফাকে "ঐতিহাসিক নবযাত্রা" নামে সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি:- "দেশ ও জাতির এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণে ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার প্রত্যুষে প্রবীণ জননায়ক খন্দোকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন এবং এক ভাবগম্ভীর অথচ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে খন্দোকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের আইন-শৃংখলাকারী সংস্থাসমূহ যথা: বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনী প্রধানগণও নতুন সরকারের প্রতি তাদের অকুন্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে এই পরিবর্তনের এক বিষাদময় পটভূমি রহিয়াছে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত ও অসংখ্য মা-বোনের পবিত্র ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা একদিন যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম সেখানে আমাদের আশা ও স্বপ্ন ছিল অপরিমেয়। কিন্তু বিগত সাড়ে তিন বছরেরও উর্ধ্বকালে দেশবাসী বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা লাভ করিয়াছে তাহাকে এক কথায় হতাশা ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার আশা-আকাংখা রূপায়নে খন্দোকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিতে আগাইয়া আসিতে হইয়াছে। তারও কারণ ছিল। পূর্ববর্তী শাসকচক্র সাংবিধানিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে কোনদিন ক্ষমতা লিপ্সার বাধ দিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় না। আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব অনেক। বাংলাদেশের এক মহা ক্রান্তিলগ্নে জননায়ক খন্দোকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সুসংহত করিতে হইলে জনগণের প্রতি অর্পিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমাদের সকলকে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া যাইতে হইবে।"

১৫ই আগষ্টের জনপ্রিয় অভ্যুত্থান নৈতিক এবং সাংবিধানিক উভয় প্রকার স্বীকৃতি পেয়েছিল

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সমর্থন দিয়েছিল নৈতিক স্বীকৃতি এবং সংসদে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহিত পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল সাংবিধানিক স্বীকৃতি।

বস্তুতঃ শেখ মুজিব তার নিজের ও পরিবারের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী একটা ভিত্তি দেয়ার লক্ষ্যেই বাকশালী স্বৈরাচার কায়েম করেছিলেন। এভাবেই যুগযুগ ধরে স্বৈরাচারী শাসকরা আর্বিভুত হয়। এরা একই নিয়মে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। জামার্নীর হিটলারের উত্থান ঘটেছিল এভাবেই। নাৎসী পার্টি তাকে মহামানব আখ্যায়িত করেছিল। বাকশালীরাও শ্লোগান তুলেছিল, "এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।" ফলশ্রুতিতে মুজিব পরিণত হয়েছিলেন, একজন স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়কে। ইটালীতে মুসোলিনির আবির্ভাবও ঘটেছিল একই প্রক্রিয়ায়।

আওয়ামী লীগের শাসনামল ছিল বর্বরতার নজীরে পূর্ণ। সংসদীয় গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করে একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারসহ সকল রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল। জাতি কখনোই এই কলংকিত ইতিহাসের কথা অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারে না। আওয়ামী-বাকশালী শাসনামল ছিল মূলতঃ হত্যার ইতিহাস, নারী নির্যাতনের ইতিহাস, লুন্ঠনের ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস, চোরাচালানের ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবার ইতিহাস, জাতীয় অর্থনীতিকে বিকিয়ে দেবার ইতিহাস, রক্ষীবাহিনীর শ্বেত সন্ত্রাসের ইতিহাস, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ও লাখো শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানীর ইতিহাস। রাষ্ট্রীয়করণের নামে আওয়ামী লীগ ব্যাংক, বীমা, মিল, কল-কারখানায় হরিলুট করেছিল। দেশে সম্পদ পাচাঁর করার জন্য সীমান্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আওয়ামী শাসনামলে অবাধ লুটপাটের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে 'তলাহীন ঝুড়ি' আখ্যা পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের আমলে বিদেশী সাহায্যের বেশিরভাগ মালই ভারতের কোলকাতা ও বিশাখা পাওম বন্দরে খালাস পেতো। একাত্তরের যুদ্ধ আর ধ্বংসযজ্ঞের পর বাহাত্তরে কোন দুর্ভিক্ষ না হয়ে আওয়ামী লীগের শাসন ও শোষণের ফলে '৭৪-এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। অনাহারে মারা গিয়েছিল লাখ লাখ আদম সন্তান। ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছিল মানুষ আর কুকুরে। অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের কলাপাতার কাফনে দাফন করতে হয়েছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বন্য লতা-পাতা, কচু-ঘেচু আর কলাগাছের কান্ড সংগ্রহে ব্যস্ত জাল পরা বাসন্তীরা আওয়ামী কুশাসনের ঐতিহাসিক সাক্ষী। বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সরকারিভাবে ভারত থেকে সুন্দরী ও সোহাগী নামের দেড় হাত প্রস্ত ও সাত হাত দৈর্ঘ্য শাড়ী আমদানি করে আওয়ামী লীগ বস্ত্রহীন, নিরন্ন ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাথে জঘণ্য মস্করা করেছিল। জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ঐ কাপড়ের নাম দিয়েছিল "**উলঙ্গ বাহার শাড়ী**"।

আওয়ামী লীগ ও বাকশাল সরকার তাদের শাসনামলে এ দেশের জনগণকে গণতন্ত্রের নামে দিয়েছিল স্বৈরাচার; সমাজতন্ত্রের নামে শুরু করেছিল সামাজিক অনাচার; বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে জাতিকে করেছিল বিভক্ত; আর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যুগিয়েছিল ধর্মহীনতার ইন্ধন। স্বৈরাচারী মুজিব সরকার সুপ্রীম কোর্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল! ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যদি না হত তাহলে গণতন্ত্রের বধ্যভুমিতে আজকের শতাধিক রাজনৈতিক দলকে একদলীয় বাকশালের ধ্বজা বহন করেই বেড়াতে হত। এমনকি আওয়ামী লীগ নামক কোন দলেরও পুর্ণজন্ম হত না। আওয়ামী-বাকশালীদের অনাসৃষ্টির জন্য বিধ্বস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ঘানি দেশবাসীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টানতে হত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, গোলাবারুদ, স্বর্ণ, মূল্যবান ধাতু, যানবাহন, মিল-কারখানার মেশিনপত্র, কাঁচামাল ভারতের হাতে তুলে দিয়ে আওয়ামী লীগ সমগ্র জাতিকে

প্রতিপক্ষ করে স্বাধীনতার সোল এজেন্ট সেজে বসেছিল। এসবের প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় দেশমাতৃকার অন্যতম সেরা সন্তান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল; প্রাণ হারাতে হয়েছিল বিপ্লবী সিরাজ সিকদার ও হাজারো মুক্তিযোদ্ধাকে। লাঞ্ছণার শিকারে পরিণত হতে হয় অনেক দেশপ্রেমিককে। দীর্ঘমেয়াদী অসম চুক্তির মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বন্ধক রেখেছিল আওয়ামী লীগই। লালবাহিনী, নীলবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, রক্ষীবাহিনীসহ ইত্যাকার নানা রকমের বাহিনী গঠনের দ্বারা দুঃসহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে বিনা বিচারে ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক কর্মীর প্রাণ সংহার করার কালো ইতিহাস আওয়ামী-বাকশালীদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় রাজনৈতিক নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে নির্মমভাবে পাশবিক অত্যাচার করে হত্যা করার পর শেখ মুজিব স্বয়ং সংসদ অধিবেশনে ক্ষমতার দম্ভে বলেছিলেন, "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?"

জাতির আশা-আকাংখাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সে ব্যবস্থা টিতে থাকেতে পারে না। জনসমর্থন ছাড়া কোন ব্যবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। জাতীয় বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকরা যখন জাতির কাঁধে একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাতন্ত্রের বোঝা চাপিয়ে দেয়, জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থ হাসিলের জন্য মীরজাফর বা রাজাকার-আলবদরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাদের অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য তাদের দুঃশাসন উৎখাত করার জন্য দেশপ্রেমিকদের বিপ্লবের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে যুগে যুগে। একই যুক্তিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বিপ্লব সংগঠিত করেছিল বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ। সেই বিপ্লব ছিল একটি সফল অভ্যুত্থান। দেশ ও জাতি মুক্তি পেয়েছিল দাসত্বের নাগপাশ ও স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে। বাকশাল সরকারের উৎখাত ও মোশতাক সরকারের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন এ কথাই প্রমাণ করেছিল জনগণের আশা-আকাংখার সাথে বাকশালের কোন সম্পর্ক ছিল না। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনসমর্থনও ছিল না। ১৫ই আগষ্টের বিপ্লব স্বতঃস্ফুর্ত জনসমর্থন পেয়ে একটি জনপ্রিয় অভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল জাতীয় সংসদে মরহুম শেখ মুজিবের উপর একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তখন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরহুম জিয়াউর রহমান এবং স্পীকার ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ। কোন মৃত ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গেলে প্রথাগতভাবে তার জীবন বৃত্তান্ত পড়ে শোনানো হয় এবং সংসদের কার্যবিবরণীতে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল শেখ মুজিবের উপর যে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তা উত্থাপন করেন স্বয়ং মীর্জা গোলাম হাফিজ। তার পঠিত শেখ মুজিবের জীবন বৃত্তান্তের শেষ লাইনে বলা হয়, "১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

এটাই মূল কথা। শেখ মুজিবের মৃত্যু একটি সাধারণ হত্যাকান্ড নয়। শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যু হয়েছিল রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রক্রিয়ায়। একই দিনে শেখ মুজিবের পতনের রাজনৈতিক দিকটি খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে ব্যাখ্যা করে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। সেটা তিনি করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনুমোদনক্রমে। তিনি বলেছিলেন, "১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে যে কুখ্যাত কালা-কানুন পাস করে বাকশাল নামক একদলীয় স্বৈরাচারী জগদ্দল পাথর দেশের তৎকালীন ৮ কোটি লোকের বুকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল; সেটা ছিল একটা সংসদীয় ক্যু'দাতা (অভ্যুত্থান)। ঐ একদলীয় স্বৈরাচারী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সংগঠিত হয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।" একই অধিবেশনে পরে তিনি ইনডেমনিটি বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটি ২৪১ ভোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়। ফলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে সংবিধানে সংযোজিত হয় এবং দেশের শাসনতন্ত্রের অংশে পরিণত হয়। এভাবেই জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ও নির্বাচিত সাংসদরা

১৫ই আগষ্টের বিপ্লবের স্বপক্ষে চুড়ান্ত ফয়সালা করে বিপ্লব ও বিপ্লব সংগঠনকারীদের সাংবিধানিক বৈধতা দান করেছিলেন।

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ এর বৈপ্লবিক সফল অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। অম্লান হয়ে থাকবে নিজ মহিমায়। সেদিন আগষ্ট বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মাটি থেকে স্বৈরশাসনের একনায়কত্ব ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটেছিল এবং উন্মোচিত হয়েছিল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্বার। আগষ্ট বিপ্লব বাকশালী কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে গতিশীলতার সৃষ্টি করে সূচনা করে এক নতুন দিগন্তের।

১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভুত্থান ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির উন্মেষ ঘটেছিল জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তারই ধারা আজও দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির প্রতীক ১৫ই আগষ্টের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও তার চেতনা সর্বকালে সর্বযুগে এদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিক ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাবে নব্য সৃষ্ট মীরজাফর ও জাতীয় বেঈমানদের উৎখাত করতে। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার জ্বলন্ত নিদর্শন ১৫ই আগষ্টের মহান বিপ্লব।

প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত, মোশতাক সরকার এবং সেনা পরিষদ

মোশতাক সরকার গঠিত হবার পর খুবই নাজুক পরিস্থিতিতে সেনা পরিষদ তাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিজয়কে আপামর দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানালেও পরাজিত বাকশালী চক্র ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী মহল সহজে এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছিল না। তারা জনসমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষভাবে এই বিপ্লবের বিরোধিতা করতে না পেরে গোপনে তাদের হারানো স্বর্গ ফিরে পাবার আশায় তাদের বিদেশী প্রভুদের যোগসাজসে চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করে বিপ্লবের পরমুহূর্ত থেকেই। তাদের এ ধরণের তৎপরতা সম্পর্কে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছিল। বিপ্লবের পর পরাজিত শক্তিকে সমূলে বাংলাদেশের মাটি থেকে উপড়ে ফেলার জন্য আমরা সচেষ্ট ছিলাম। সর্বদলীয় সরকার কায়েম করে তার তত্বাবধানে যতশীঘ্র সম্ভব নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। একই সাথে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে **proper screening** এর পর সেনাবাহিনীর সাথে একত্রীভূত করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর পুর্নগঠন করে বিপ্লবের স্বপক্ষ শক্তিকে সুসঙ্গবদ্ধ করার। সেনা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দানকারী জেনারেল ওসমানীকে নিয়োগ করা হয় প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সামরিক উপদেষ্টা। তাঁর মূল দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের উপেক্ষিত সামরিক বাহিনীর সার্বিক কাঠামো নতুন করে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ধাঁচে গড়ে তোলা। সেনাবাহিনীর পুর্নগঠনের কাজটি তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল খুবই জটিল এবং দূরহ্ একটি কাজ। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বাছাই করে তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করতে হবে। সেনাবাহিনী থেকে বাকশালীমনা, র্দুনীতিপরায়ন এবং উচ্চাভিলাসীদের বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত ইউনিটগুলোর পুর্নবিন্যাশ করতে হবে। কমান্ড স্ট্রাকচারে প্রচুর রদবদল করতে হবে। সর্বোপরি সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিককে বিপ্লবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এ সমস্ত কাজে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সেনা পরিষদের সদস্যরাই ছিল জেনারেল জিয়ার মূল শক্তি। তাদের সার্বিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করেই জেনারেল জিয়া তার দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। আওয়ামী-বাকশালী আমলে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত অফিসারদের সামরিক বাহিনীতে পুনর্বহালের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং এই নীতি কার্যকরী করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একই সাথে আমরা তখন দেশের দেশপ্রেমিক-জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল, গ্রুপ এবং ব্যক্তিবর্গের সাথে দেশের ভবিষ্যত রাজনৈতিক কাঠামো, জাতীয় সরকার, নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে মত বিনিময় করছিলাম। এই প্রক্রিয়াটাও ছিল ভীষণ জটিল। বিগত ঐক্য প্রক্রিয়ার মত এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনাকালে সব রাজনৈতিক দলই তাদের দলীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। এমনকি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবটি খন্দোকার মোশতাক আহমদও প্রথমে মেনে নিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি চাইছিলেন সরকার প্রধান থেকে একটি নিজস্ব দল গঠন করে তার অধিনস্থ অস্থায়ী সরকারের অধিনেই নির্বাচন করতে। কিন্তু আমাদের জোরালো যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মেনে নিতে হয়েছিল জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব। যে সংসদ গণতন্ত্রের বলি দিয়ে বাকশাল কায়েম করেছিল তাদের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর মোশতাক সরকার ও গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে সর্বদলীয় সরকার

গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম আমরা। বামপন্থী রাজনৈতিক অনেক দলই বিশেষ করে জাসদ চাচ্ছিল একটি বিপ্লবী সরকার কায়েম করে তাদের দলীয় কর্মসূচী আমরা বাস্তবায়ন করি। কিন্তু তাদের সেই সব প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার কোন ইচ্ছা নেই আমাদের এমনকি রাজনীতিতে সরাসরিভাবে সেনাবাহিনীর অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে সেনা পরিষদ। জাতীয় কিংবা নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে কোন বিশেষ দলের কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্য নয়। তাদের দায়িত্ব হবে দেশে একটি সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের অধিকার অর্জন করবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাজনৈতিক দল।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে

জেনারেল জিয়া জানালেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল তার কাজে বাঁধার সৃষ্টি করছে। কিছু বাকশালীমনা অফিসার তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল। তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে কিছু বাকশালপন্থী অফিসার। ব্রিগেডিয়ার খালেদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু ভীষণ উচ্চাভিলাসী। তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য অতি কৌশলে যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি তার শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করে আসছিলেন। মুজিব সরকার ও বাকশালীদের সহানুভূতিও ছিল তার প্রতি। আচমকা বাকশালী সরকারের পতনের ফলে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তাই তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যে কোন উপায়েই তার পরিকল্পনা কার্যকরী করে তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করতে। তার এই হীন চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ থেকে তাকে কিছুতেই নিরস্ত্র করতে পারছিলেন না জেনারেল জিয়াউর রহমান। ক্ষমতার প্রতি ব্রিগেডিয়ার খালেদের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল বাকশালী চক্র এবং তাদের মুরুব্বী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দোসর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। ১৫ই আগষ্ট পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে আগষ্ট বিপ্লবের পূর্ব অবস্থায় দেশকে নিয়ে যাবার এক গভীর ষড়যন্ত্রের সূচনা ঘটানো হল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রির্পোটেও এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যেতে লাগল। ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রধান উস্কানিদাতা ছিল কর্নেল শাফায়াত। শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ এই অফিসার কিছুতেই বাকশালী সরকারের পতনকে মেনে নিতে পারছিলেন না। কুখ্যাত আত্রাই অপারেশনের চ্যাম্পিয়ন কর্নেল শাফায়াত জামিল যাকে পরে ঢাকায় ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করে শেখ মুজিব পুরস্কৃত করেছিলেন; সেই শাফায়াত জামিলের অধিনস্থ ঢাকা ব্রিগেডই মুজিব সরকারের পতন ঘটালো এই humiliation তার পক্ষে কিছুতেই সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে এই গ্ল্যানি তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। এর জন্যই সে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে মোশতাক সরকার এবং জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে উস্‌কে দিয়ে তাকে বাকশালী চক্র ও তাদের বিদেশী প্রভুদের ক্রিয়াণকে পরিণত করেছিল। তাদের সাথে জোট বেধেছিল রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আগরতলা মামলার আসামীদের কয়েকজন অফিসার। প্রথমত: আমরা এবং কর্নেল ওসমানী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এ ধরণের আত্মঘাতী এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে পারেন সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু ক্রমে যখন বিভিন্ন সেনা নিবাসগুলো থেকে সেনা পরিষদের সদস্যরাও একই ধরণের খবর পাঠাতে লাগল তখন বিষয়টি চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। বোঝা যাচ্ছিল সংকট ঘনিয়ে আসছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে এ ধরণের সর্বনাশা চক্রান্ত থেকে সরে দাড়াবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হল না।

৩৬ জন সেনা অফিসারকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়

কোন অঘটন ঘটাবার চক্রান্ত বানচাল করার লক্ষ্যেই ঐ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল, ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল শাফায়াত এবং তাদের সহযোগিদের অবিলম্বে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করতে হবে। দেশ এবং জাতিকে দাসত্বের হাত থেকে বাচানোর আর কোন উপায়ই ছিল না।

অনেক বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হল- অসৎ এবং কট্টর বাকশালপন্থী অফিসারদের সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। সর্বমোট ৩৬জন অফিসারকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কাজটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ; কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামের সব যোগ্য কমান্ডারদের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষন এবং আনুগত্য ছিল তাদের অধিনস্ত যোদ্ধাদের। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে চাকুরিচ্যুত করলে সেনাবাহিনীতে একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে কিন্তু আমরা নিশ্চিত ছিলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের চক্রান্তের আসল উদ্দেশ্য সৈনিকদের সামনে তুলে ধরলে ব্যক্তিগত আনুগত্য যাদের আছে তারাও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী হীন চক্রান্তকে সমর্থন করবে না। আমাদের তরফ থেকে সিদ্ধান্তের কথাটা জেনারেল জিয়াই জেনারেল ওসমানীকে জানালেন। সব শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না খালেদ এবং শাফায়াত এ ধরণের ন্যাক্কারজনক কাজে লিপ্ত হতে পারে! কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগীয় প্রধানরা যখন বিস্তারিত রির্পোট তার সামনে পেশ করলেন তখন অসহায় আক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

বৃহত্তর চক্রান্তের বড়ে খালেদচক্র

ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসররা বৃহত্তর চক্রান্ত বড়ে হিসেবেই শুধুমাত্র ব্যবহারিত হচ্ছিল। গোয়েন্দা রির্পোট থেকে বোঝা যাচ্ছিল তাজুদ্দিন আহমদ পরবর্তী সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

গোয়েন্দা রির্পোটগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, এই চক্রান্ত হাত রয়েছে বাকশালীদের একটি চক্র এবং তাদের সার্বিকভাবে মদদ যোগাচ্ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা চালাচ্ছে আর্মির মধ্যে কিছু লোকের মাধ্যমে একটা প্রতি বিপ্লবী ঘটনা ঘটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভক্তি সৃষ্টি করে দেশকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে ২৫ বছরের আওতায় বাংলাদেশে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করে জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি অনুগত সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে আবার একটি করদ রাজ্যে পরিণত করা। রিপোর্ট থেকে আরও জানা গেল, এই নীল নকশা বাস্তবায়নে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দূতাবাস যৌথভাবে অত্যাধিক মাত্রায় তৎপর রয়েছে। তাদের পরামর্শে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ভাই সাবেক সাংসদ বাকশালী নেতা জনাব রাশেদ মোশাররফ সংশ্লিষ্ট মহল এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই চক্রান্তের সম্পর্কে পরবর্তিকালে জনাব এনায়েতউল্লাহ খানের পত্রিকা সাপ্তাহিক হলিডে-তে এক বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। "**Bangladesh The Unfinished Revolution**" গ্রন্থে জনাব লিফ্‌স্যুলজ লিখেছেন, "রয়টার সংবাদদাতা জনাব আতিকুল আলমের হাতে ভারতীয় হাই কমিশনার জনাব সমর সেনের কাছে অভ্যুত্থান বিষয়ক জনাব তাজুদ্দিনের স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠি পৌঁছেছিল।"
জনাব জিল্লুর রহমান খান **'Leadership crisis in Bangladesh'** গ্রন্থে লিখেছেন, "খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের বিষয়ে জেলে চার নেতা অবহিত ছিলেন। এটা ছিল একটি মুজিবপন্থী পাল্টা অভ্যুত্থান। কারণ চার নেতা বীরদর্পে জেল থেকে বের হয়ে এসে সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।"

জেনারেল জিয়া নিজের অজ্ঞাতেই সতর্ক ঘন্টা বাজিয়ে দিলেন

৩৬ জনের মধ্যে মাত্র দু'জন- কর্নেল রউফ এবং কর্নেল মালেকের অব্যাহতি ফাইল সই করিয়ে নিলেন তিনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে।

একই সাথে মুজিব আমলে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত অফিসারদের পুনর্বহালের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার জন্য জেনারেল জিয়াকে অনুরোধ জানানো হয়। এর কয়েকদিন পরেই আমরা আবার চাকুরিতে পুনর্বহাল হই। এতে করে সেনাবাহিনীতে বিপ্লবের স্বপক্ষ শক্তি বৃদ্ধি পায়। জেনারেল জিয়ার হাতও এতে করে তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠে। জেনারেল জিয়া অবিলম্বে আমাদের সবাইকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলোতে নিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমাদের সেনাবাহিনীতে পূর্ণবাসনের ফলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও তার সমর্থকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তারা বুঝতে পারেন, সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসলে তাদের কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। তারা এটাও বুঝতে পারলেন যে, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই তারা অস্থির হয়ে উঠলেন মরণ কামড় দেবার জন্য। ঐ সময়ে একদিন জেনারেল জিয়া প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কাছ থেকে কর্নেল রউফ (শেখ মুজিবের আমলে তার বিশেষ আস্থাভাজন সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান) এবং কর্নেল মালেকের চাকুরিচ্যুতির ফাইল সই করিয়ে নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে তাদের অবসর প্রদানের আদেশ জারি করলেন। ব্যাপারটা জানতে পেরেই আমি শংকিত হয়ে পড়লাম। ছুটে গেলাম জেনারেল জিয়ার কাছে,

— স্যার এটা আপনি কি করলেন! কথা ছিল ৩৬ জনকে একই সাথে অবসর প্রদান করা হবে। সেটা না করে মাত্র দু'জনকে অবসর প্রদান করে বাকি ষড়যন্ত্রকারীদের হুশিঁয়ার করে দিলেন আপনি। এটা কি ঠিক হল?

জবাবে জেনারেল জিয়া আমাকে বললেন,

— **Don't worry, let me move step by step. Things would be all right. Let me handle the affairs in my own way.**

একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা

একটি তরুণ প্রতারক আমার নাম ভাঙ্গিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করে।

একদিন রাতে ক্যাবিনেট মিটিং শেষ হবার পর মন্ত্রীমহোদয়গণ বঙ্গভবনের করিডোরে বেরিয়ে এসেছেন। হঠাৎ মন্ত্রী জনাব রিয়াজুদ্দিন আহমদ ভোলা মিয়া আমাকে ডেকে একটু নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন,

— ডালিম, তোমার পাঠানো লোকটার কাজটা করে দিয়েছি। কালই পারমিটটা ইস্যু করে দেবার জন্য সেক্রেটারী সাহেবকে অর্ডার দিয়েছি।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

— চাচা, আমিতো কোন লোককে পাঠাইনি আপনার কাছে। ব্যাপারটা একটু খুলে বলুনতো?

আমার জবাবে তিনি একটু বিব্রত হলেন। বললেন,

— এক যুবক সকালে আমার অফিসে এসে বলল, তুমি তাকে পাঠিয়েছ অনুরোধ জানিয়ে তাকে যাতে ৫০ লক্ষ টাকার একটা কাঠের পারমিট দিয়ে দেয়া হয় যত শীঘ্র সম্ভব।

সব শুনে আমি 'থ হয়ে গেলাম। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! আমাকে বেচার চেষ্টা করছে কেউ! লোকটা কে জানার একটা কৌতুহল হল। বললাম,

— এক কাজ করেন চাচা, আগামীকাল লোকটা যখন পারমিটটা নিতে আসবে তখন আপনি আমাকে জানাবেন, আমি আসব দেখার জন্য লোকটা কে! আপনি আমার পরিচয় দেবেন আপনার দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় বলে। বাকিটা ঘটনাস্থলেই দেখবেন কি হয়।

পরদিন সকালে যুবক পৌঁছামাত্র আমি ফোন পেলাম। আমি কয়েকজন আইবির লোক সঙ্গে করে উপস্থিত হলাম মন্ত্রী সাহেবের দফতরে। চেম্বারে ঢুকে দেখি এক কেতাদুরস্থ তরুণ চাচার মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছে। আমি সালাম জানিয়ে বসলাম যুবকের পাশেই। যুবকটি আমার পরিচিত নয়। চাচাকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

— স্যার, আপনি বলেছিলেন আজ আসতে আমার ছোট ভাই এর আর্মিতে অফিসার র‍্যাঙ্কে ভর্তির ব্যাপারে। আপনি বলেছিলেন মেজর ডালিমের খুব ঘনিষ্ঠ কেউ আসবে আজ যার মাধ্যমে কাজটা করিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন আপনি।

আমার কথার ধরণ বুঝে নিয়ে মিনিষ্টার সাহেব বললেন,

— হ্যা, এই ভদ্রলোকই সেই ব্যক্তি।

বলেই আমাকে তার দূর সর্ম্পকের আত্মীয় বলে পরিচয় করিয়ে অনুরোধ জানালেন,

— ভাই সাহেব, এর ছোট ভাই কমিশন র‍্যাঙ্কের জন্য আইএসএসবির অপেক্ষায় আছে। বুঝতেইতো পারেন এদেশে সুপারিশ ছাড়া কিছুই হয় না; আপনি মেজর সাহেবের খাস লোক তাই অনুরোধ জানাচ্ছি ওর কাজটা যদি করে দিতেন তবে খুবই উপকার হত।

কথা শেষ হতেই যুবক বলল,

— কি যে বলেন মিনিষ্টার সাহেব, এতো খুবই সামান্য একটা কাজ। এর জন্য মেজর ডালিমের প্রয়োজন নেই। জেনারেল জিয়া কিংবা ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বলে দিলেই যথেষ্ট।

কথা শেষ করে যুবক আমার দিকে ফিরে তার একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলল,

— আমার সাথে দেখা করবেন। আপনার সামনেই জেনারেল জিয়া এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদকে ফোন করে আপনার সমস্যার সমাধান করে দেবো। তার সাহস ও আত্মপ্রত্যয় দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

যুবক দিব্যি আরামে বসে সিগারেট টানছিল আর কথা বলছিল। চাচার সাথে চোখাচোখি হল; দু'জনকেই কৃতজ্ঞতা এবং সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষারত আইবির লোকদের বললাম, "লোকটা ধুরন্দর ঠগ; ভিতরে গিয়ে আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। তদন্তের রির্পোটটা আমাকে দেখাবেন।" পরে তদন্তে দেখা গিয়েছিল যুবকের নাম-ঠিকানা সবই ভূয়াঁ।

রিপোর্টে ঠিক বোঝা যায়নি সমস্ত ব্যাপারটা একটা ঠগবাজী প্রতারণা ছিল নাকি এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল। ঘটনাটি হাতে নাতে ধরা না পড়লে আমার নামে দুর্নীতির অভিযোগ রটানো যেত অবশ্যই। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে এধরণের প্রতারণার ব্যাপারে সচেতন থাকার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। আমরাও বিশেষভাবে সতর্ক হয়ে উঠেছিলাম। চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হবে।

আবেদুর রহমান অতি কৌশলে ঘুষ দেবার ধৃষ্টতা দেখান

প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিই মনে করে যেকোন জিনিষই টাকায় কেনা যায়।

অক্টোবরের শেষাশেষি ঘটলো আরেকটি ঘটনা। এক সন্ধ্যায় মেজর শাহরিয়ার রেডিও কন্ট্রোল থেকে জরুরী ফোন করে ডেকে পাঠালো।

— হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম।
— ওয়ালাইকুম আসসালাম।
— আজ রাতে আবেদুর রহমানকে **custody** থেকে বের করে লন্ডন পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট; এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি? বলল শাহরিয়ার।
— না তো; এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।
— স্যার, দুর্নীতির অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের এভাবে বিনা বিচারে ছেড়ে দেয়া হলে এ সরকারের সুনাম ক্ষুন্ন হবে। লোকজন বলাবলি করবে আবার সেই পুরনো খেলাই শুরু হল, টাকা-পয়সার লেনদেনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজরা নিজেদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
— তুমি ঠিকই বল্‌ছো শাহরিয়ার। তোমার খবর যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে কিছুতেই আবেদুর রহমানকে বিদেশে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। তুমি পুনরায় তাকে আটক করার ব্যবস্থা করো। তাকে ধরতে হবে এয়ারপোর্ট থেকে; যাতে করে এর পিছনের মূল ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়। অভিযুক্ত কাউকে ছেড়ে দেবার অধিকার কারো নেই। **After you get him let me know.**
— **OK Sir, I shall do everything that is necessary.** টেলিফোন রেখে দিল শাহরিয়ার।

মাঝ রাতের লন্ডনগামী ফ্লাইটে বিশেষ ব্যবস্থায় তুলে দেয়া হয়েছিল আবেদুর রহমানকে। প্লেনের ভিতর থেকেই **off load** করে ধরে এনেছিল শাহরিয়ারের পাঠানো টাস্কফোর্স। খবর পেয়ে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম শাহরিয়ারের কন্ট্রোল রুমে। আইজি জনাব নূরুল ইসলাম এবং গ্রেফতারকৃত বিশেষ ব্যক্তিদের ইনচার্জ ডিআইজি জনাব ই.এ. চৌধুরীকেও ডেকে আনা হল। কারণ, খবর পাওয়া গিয়েছিল এ ব্যাপারে তাদের হাত রয়েছে। জনাব ই.এ. চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলাম,

— স্যার, দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের দায়িত্বেতো আপনিই রয়েছেন তাই না?
— জ্বী হ্যাঁ। জবাবে বললেন জনাব চৌধুরী।
— সেক্ষেত্রে জনাব আবেদুর রহমানকে ছাড়পত্র দিয়ে প্লেনে তুলে দেবার বন্দোবস্ত করলেন কার হুকুমে?

আমার অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কিছুটা ভড়কে গেলেন জনাব চৌধুরী। আমতা আমতা করে বললেন,

— আইজি সাহেবের হুকুমেই এ ব্যবস্থা করেছিলাম আমি।
— আইজি সাহেব আপনি কি করে এ ধরণের হুকুম দিলেন ? থতমত খেলেন আইজি সাহেব।
— প্রেসিডেন্টের কথামত কাজ করেছি আমি।
— প্রেসিডেন্ট সাহেব এ ব্যাপারে কোন লিখিত অর্ডার দিয়েছেন কি? প্রশ্ন করলাম।
— জ্বী না। টেলিফোনে বলেছিলেন।
— টেলিফোনের কথা যদি এখন প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেন তখন আপনার অবস্থা কি হবে আইজি সাহেব? আইনের রক্ষক হয়ে এ ধরণের কাজ করাটা ঠিক হয়েছে কি আপনার?

আমার কথায় ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন পুলিশের জাদরেল অফিসার জনাব ইসলাম। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন,

— মেজর সাহেব, উপরওয়ালাদের ইচ্ছা আমাদের মত জুনিয়রদের জন্য হুকুমেরই সমান।
— বাহ্! বেশ বলেছেন! ঔপনিবেশিক আমলাদের এই বিশেষ গুনটি ভালোই জানা আছে

আপনার। কিন্তু বাংলাদেশতো একটি স্বাধীন দেশ। এক্ষেত্রে এমন একটি আইন বিরোধী কাজ করতে এতটুকুও বাধলোনা আপনার! বাধবেই বা কেন? ঘুনে ধরা ব্যবস্থার শিকার আপনারা আমরা সবাই। স্বাধীনতা পূর্বকালে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করে তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই শোষণ কায়েম রেখেছিল বিদেশী শাসকরা। তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর সেই আমলাতন্ত্রের অবকাঠামো অটুট রেখে দেশকে লুটেছে সাদা চামরার জায়গায় জাতীয় ব্রাউন সাহেবরা! তাদের ঐ অপশাসন-শোষণে সবসময়েই মদদ যুগিয়ে এসেছে ভাগীদার হিসাবে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র। অসৎ রাজনীতিবিদ এবং আমলাতন্ত্রের মাঝে জাতীয় সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে এসেছে সব আমলেই। কিন্তু এই লুটপাটের দায়-দায়িত্ব কখনোই বহন করতে হয়নি আমলাতন্ত্রকে, সব দায় বহন করতে হয়েছে শুধু রাজনীতিবিদদেরই। আমলারা হেফাজতে থেকেছেন সব সময়েই **back stage player** হিসাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু সেই অপকর্মের ধারাবাহিকতা বজায়ে রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ কিংবা আগষ্ট বিপ্লব হয়নি। এই দু'টো সংগ্রামই করা হয়েছে জাতীয় পরিসরে সর্বক্ষেত্রে গণমুখী পরিবর্তন আনার জন্য। সেক্ষেত্রে সময়ের দাবিতে আমাদের মন-মানসিকতা বদলাতে হবে তা না হলে সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আইজি সাহেব প্রেসিডেন্ট যদি আপনাকে সে ধরণের কোন কথা বলেও থাকেন তখন একজন অভিজ্ঞ অফিসার হিসাবেতো আপনার বলা উচিত ছিল যে, কাজটা বেআইনী বিধায় করা ঠিক হবে না; তাই নয় কি? আশা করি আগামীতে এধরণের ঘটনা আর ঘটবে না। আবেদুর রহমানকে ধরে আনা হয়েছে যাবার সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আইন সবার জন্যই সমান; কথাটা কাজেও প্রমাণিত হওয়া উচিত; কি বলেন?

তাদের সাথে আলাপ শেষ করে জনাব আবেদুর রহমানকে ডাকিয়ে আনা হল। আমাদের সামনে এসেই তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে বলতে লাগলেন,

— স্যার, আমি জীবনে অনেক অন্যায় কাজ করেছি। যথেষ্ট টাকা-পয়সাও অর্জন করেছি অসৎ উপায়ে। আমি তার প্রায়ঃশ্চিত্ত করতে চাই। আমাকে একটা সুযোগ দেন আপনারা। বলেই বিদেশী একটি ব্যাংকের চেক বুক বের করে তার কয়েকটা ব্ল্যাঙ্ক পাতায় সই করে সেটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললেন,

— বিদেশে আমার যা গচ্ছিত আছে তার সবটাই আমি আপনাদের দিয়ে দিতে চাই স্বেচ্ছায়।

কি সাংঘাতিক লোক! প্রকারন্তরে ঘুষ দিতে চাচ্ছেন তিনি। উপস্থাপনাটা অতি অভিনব এবং চমৎকার। তার সাথে আর কোন কথা বলতে রুচিতে বাধলো। শাহরিয়ারকে বললাম,

— আমি চললাম, অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি আবেদুর রহমান সাহেবকে আইজি সাহেবকে হ্যান্ড ওভার করে দাও বলে ফিরে এসেছিলাম।

টিপিক্যাল আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা

পররাষ্ট্র সচিব আমার শ্বশুড় মহাশয়ের চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার সুপারিশ করে আমাকে খুশি করতে চাইলেন।

একদিন পররাষ্ট্র সচিব কাজে এসেছিলেন বঙ্গভবনে। মিলিটারি সেক্রেটারীর ঘরে আমাকে দেখেই বলে উঠলেন,

— এই যে মেজর সাহেব, আপনাকেই খুঁজছি।

— কেন বলুনতো ? জানতে চাইলাম।

— আপনার শ্বশুড় জনাব আরআই চৌধুরী আমার বিশেষ বন্ধু। তিনি এ মাসেই রিটায়ার করছেন। তার মত একজন অভিজ্ঞ লোকের খুবই প্রয়োজন আমাদের লন্ডন মিশনে; বিশেষ করে এই সময়ে। তাই ভাবছি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বলে তিন বছরের একটা এক্সটেনসন করিয়ে দেই, কি বলেন? প্রেসিডেন্টের বিশেষ কারণে যেকোন অফিসারকেই সর্বাধিক তিন বছর পর্যন্ত এক্সটেনসন দেবার ক্ষমতা রয়েছে।

ধৈর্য্য সহকারে তার কথা শুনে বললাম,

— স্যার, আমার শ্বশুড় সরকারি চাকুরির নিয়মানুযায়ী রিটায়ার করছেন। তাকে এক্সটেনসন দেবার প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আপনার **departmental affairs**, সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। এক্ষেত্রে আমার মতামত কিংবা পরামর্শ নেবার যৌক্তিকতাটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

আমার জবাবে সেক্রেটারী সাহেব কেমন যেন একটু দমে গেলেন; কিন্তু ঝানু লোক যেতে যেতে বলে গেলেন,

— না মানে ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখা আর কি; এছাড়া আর কিছুই নয়।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তিনি আমাকে জানান দিয়ে গেলেন, আমার শ্বশুড়ের **extension**-টা হচ্ছে তারই উদ্যোগে। তিনি পরে ঠিকই প্রেসিডেন্টের কাছে ফাইলটা পাঠিয়েছিলেন **strongly recommend** করে। তবে আমিই সেটা হতে দেইনি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করে। আমার যুক্তি ছিল, সাধারণভাবে সরকারের নীতি যেখানে **extension** এর বিরুদ্ধে সেখানে আমার শ্বশুড়কে **extension** দিলে লোকজন কথা বলার সুযোগ পাবে।

তোষামোদকারীরা রাষ্ট্রপতিকে খুশি করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছিল

সাধারণভাবে মানব চরিত্র তোষামোদের প্রতি দুর্বল হয়ে থাকে। মোসাহেবদের দল মানুষকে আরও দুর্বল করে তুলতে পারে।

একদিন দেখি জাতীয় ব্যাংকের গভর্ণর জোরেশোরে লবি করে চলেছেন – নতুন নোট যেটা ছাপাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাতে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের ছবিই ছাপানো উচিত। কয়েকজন পদস্থ আমলাও কোরাসে যোগ দিয়ে একই কথা বলে বেড়াচ্ছেন। এক ফাঁকে আমি গভর্ণর সাহেবকে কাছে পেয়ে বললাম, "স্যার, অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতির ছবি ছাপানোর জন্য এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছেন কেন?" আমার প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে কিছু না বলেই কেটে পড়লেন। এমনিভাবে একদিন শুনতে পারলাম, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু আমলা বিতর্কের ঝড় তুলেছেন – আমাদের কোন নির্দিষ্ট জাতীয় পোষাক নেই। একটা জাতীয় পোষাক নির্ধারণ করতে হবে; পোষাক যেটাই সাব্যস্ত হোক না কেন 'মোশতাক টুপি'-কে অবশ্যই জাতীয় পোষাকের অংশ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মুসলমান হিসাবে জাতীয় পোষাকে টুপি থাকতে পারে যুক্তিসঙ্গত কারণেই; কিন্তু সেটা 'মোশতাক টুপি' হতেই হবে কোন যুক্তিতে; সেটাই বোধগম্য হচ্ছিল না। তাই একদিন তদবীরকারীদের একজন জাদরেল নেতাকে অনুরোধ করেছিলাম যুক্তিটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে। তিনি তেমন কোন ঠোস যুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এরপর হঠাৎ করেই এই তদবীরে ভাটা পরেছিল যে কোন কারণেই হোক। সব জায়গাতেই কেমন যেন পচঁনের র্দুগন্ধ। ধসে পড়ছে চারিত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ। যেকোন রাষ্ট্রের জন্য সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র হল মেরুদন্ড। সেখানে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পচঁন ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। সেই ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে জাতীয় পরিসরে। সেখানে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে কতটুকু পরিবর্তন আনা সম্ভব সেটা একটা কঠিন প্রশ্ন ও ভাবনার বিষয়। দ্রুত এই পচঁন ও অবক্ষয়ের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচানো অত্যন্ত দুরহ্ কাজ। অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রক্রিয়া শুরু করার পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবেই আজ আমাদের উপর বর্তেছে। এই গুরু দায়িত্ব পালনের আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি আমরা পাহাড় সমান প্রতিবন্ধকতার মুখে। জানি না কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এই প্রক্রিয়াকে! এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পরেছিলাম।

পরদিন অভ্যাস মতো ভোর ৬টায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে কাপড় পরছিলাম সেই সময় প্রেসিডেন্টের আরদালী এসে জানাল প্রেসিডেন্ট সাহেব নাস্তার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তার কামড়ায় গিয়ে দেখলাম আমাদের প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত। আমি একটা খালি চেয়ারে বসলাম প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে। ভাবছিলাম, প্রেসিডেন্ট গতরাতে আবেদুর রহমানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "বাবা, আমগো মইধ্যে কম্যুনিষ্ট কেডা কেডা?" অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা করেই তিনি আমাদের সবাইকে দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে। মুখে ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ রহস্যময় হাসি। আমাদের কেউই তার প্রশ্নের জবাবে কিছুই বলল না। তিনিই আমাদের সবাইকে নিশ্চুপ দেখে আবার বললেন, "যারাই কম্যুনিষ্ট হওনা কেন; তোমরা জাইন্যা রাইখো আমি সবচেয়ে বড় কম্যুনিষ্ট।" এরপর আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হল না। নাস্তা শেষে আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। মনে খট্‌কা লাগল, প্রেসিডেন্ট হঠাৎ করে এমন একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলেন কেন? তবে কি তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিদের সাথে আমাদের বিশেষ করে আমার গোপন যোগাযোগের বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছেন? নাকি তিনি ঈঙ্গিতে আমাদের কাছে নিজেকে প্রগতিবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করলেন কিছুই ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার সেই উক্তি রহস্যাবৃত্তই রয়ে গেল আমাদের সবার কাছে।

মেজর নূর পেল শেষ আলটিমেটাম

মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবাল জেনারেল জিয়াকে চীফ অফ স্টাফের পদ থেকে সরানোর ব্যাপারে তাদের শেষ কথা জানিয়ে দেয়।

এদিকে আমাদের চাকুরিতে পুনর্বহালের **Gazette notification** বেরুলেও পোষ্টিং অর্ডার তখন পর্যন্ত বেরোয়নি। লিষ্টেড অফিসারদের চাকুরিচ্যুতির ফাইলটিও সই হয়ে আসেনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। বুঝতে পারলাম বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের কূটচালের পরিপ্রেক্ষিতেই এই দু'টো বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্বিত হচ্ছে। গলদটা যে কোথায় সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেও কোন হদিস পেলাম না আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচের গোলক ধাঁধাঁয়। সংকট ঘণীভূত হতে থাকলো।

সেপ্টেম্বরের শেষে এক দুপুরে মেজর নূর এসে উপস্থিত হল আমার ঘরে।

— কী ব্যাপার নূর; তোমাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে?

— চিন্তারই বিষয় স্যার। গত দু'দিন যাবৎ মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথেই আছি। শেষবারের মত ওরা আমার মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছে, তাদের প্রস্তাবটা উপেক্ষা না করে পুর্নবিবেচনা করার জন্য। ওরা চুড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জেনারেল জিয়াকে আর্মি চীফ অফ স্টাফের পদ থেকে সরাবার প্রস্তাব সেনা পরিষদ যদি মেনে না নেয় তবে তারাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

নূরের কথায় বুঝতে পারলাম, বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। যে কোন সমঝোতার ভিত্তিতেই হোক হাফিজ ও ইকবাল ব্রিগেডিয়ার খালেদের সাথে এক হতে চলেছে। ১ম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের উপর বিশেষ প্রভাব রয়েছে হাফিজ ও ইকবালের। ১ম ইষ্টবেঙ্গলকে হাত করতে পারলেই সম্ভব হবে ব্রিগেডিয়ার খালেদের পক্ষে ঢাকায় জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে কোন প্রতি বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া আর সেটা হবারই আলামত দেখা যাচ্ছে। মেজর নূরের কাছে তাদের প্রকাশিত মনোভাব সেই ঈঙ্গিতই বহন করছে। চিন্তিতভাবেই নূরকে বলেছিলাম,

— ওদের বলে দিও, যা ইচ্ছে তাই ওরা করতে পারে, তাতে বাধা দিতে না পারলেও সমর্থন আমরা কিছুতেই দিতে পারব না। এ বিষয়ে মিটিং-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেটাই বলবৎ থাকবে।

— আমিও আপনার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত স্যার। দেশের স্বার্থে আর কিছু করতে না পারলেও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী যেকোন চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যাব শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে; তবু নীতির প্রশ্নে অটল থাকতে হবে আমাদের। আপনি জেনারেল জিয়াকে সাবধান হতে বলেন স্যার। যেকোন সময় চরম একটা কিছু ঘটে যেতে পারে।

নূরের সাথে আলাপের পর সেদিনই ছুটে গিয়েছিলাম জেনারেল জিয়ার কাছে। তার বাসার লনে বসেই কথা হচ্ছিল,

— স্যার, কি অবস্থা সেনানিবাসের ?

— খালেদ ও শাফায়াতের ঔদ্ধত্যের মাত্রা সকল সীমা ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওদের সন্দেহমূলক আচরনের খবরা-খবর আসছে সব দিক থেকেই। তাদেরকে কি করে হ্যান্ডেল করা যায় সেটাই ভাবছি।

— স্যার, শুনতে পাচ্ছি ব্রিগেডিয়ার খালেদ নাকি ১ম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে হাত করার চেষ্টা করছেন? এ ব্যাপারে আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। ১ম বেঙ্গলকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারলে ঢাকায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ যে কোন একটা চুড়ান্ত অঘটন ঘটিয়ে ফেলার ঝুঁকি নিতে পারে।

— **Don't you worry. The advanced party of the 1st Field Regiment has already**

arrived from Comilla and the mainbody is on the way. They should be here just within a few days.

— ১ম ইষ্টবেঙ্গল সম্পর্কে ভেবো না। ওটাতো আমারই নিজস্ব ব্যাটালিয়ন। How could Khaled lay his hand on it? স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জবাব দিলেন জেনারেল জিয়া।

— তবুও সাবধানের মার নেই স্যার। সবদিকেই সার্বক্ষণিক নজর রেখে চলতে হবে আপনাকে এখন থেকে। Please don't under estimate your opponent. ভালো কথা, আমাদের পোষ্টিং অর্ডারগুলো এখনো বেরুচ্ছে না কেন? এ ব্যাপারে গড়িমসি করছে কেন MS branch. Our postings at the different strategically important units would immensely strengthen your hand to deal with Brig. Khaled & Co, particularly in the present complex and explosive situation. You should have been able to get the retirement orders signed by the President by now. I tell you Sir, time is running out and you must exert yourself to get these things done before it is too late.

— I understand! জবাব দিলেন জেনারেল জিয়া।

বাইরে প্রকাশ না করলেও তিনি যে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন সেটা আমি তাকে একান্তভাবে জানি বলেই বুঝতে পারছিলাম। এভাবেই সেদিন আমাদের আলাপ শেষ হয়েছিল। সেটাই ছিল ২-৩রা নভেম্বরের আগে তার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ।

আসন্ন বিপর্যয় মোকাবেলার রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় সেনা পরিষদ

বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য সব মহলের কাছ থেকেই রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সমর্থন আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়।

আসন্ন বিপর্যয়ের মোকাবেলা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছিল সেনা পরিষদ। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম; যেকোন প্রতিবিপ্লবের মোকাবেলা করার জন্য বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিক সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করা উচিত। আলোচনা হল সাম্যবাদী দলের নেতা তোহা ভাই, সর্বহারা পার্টির মাহবুব, জাসদের মেজর জলিল এবং গণবাহিনীর নেতা কর্নেল তাহেরের সাথে।

সোভিয়েত-ভারত মদদপুষ্ট যেকোন প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন সবাই। সব কিছু জানার পর কর্নেল তাহের বলেছিলেন, "এই মুহূর্তে জেনারেল জিয়ার বিরোধিতা করা দেশদ্রোহিতারই সমান। কারণ, বর্তমান অবস্থায় সেনাবাহিনীর পুর্নঃগঠন এবং ঐক্যের প্রয়োজনে জেনারেল জিয়ার কোন বিকল্প নাই। তাছাড়া যেকোন বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য জিয়ার ভাবমুর্তি, ব্যক্তিত্ব এবং ভাবমুর্তিও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। তাই জিয়াকে আমাদের যে করেই হোক না কেন; বাঁচিয়ে রাখতে হবে বিপ্লবের স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে। তিনি দ্ব্যার্থহীনভাবে আরো বলেছিলেন, "অবশেষে খালেদ যদি সত্যিই জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে তার নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী সেনা পরিষদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই চক্রান্তের বিরোধিতা করবে। আবার আমরা শুরু করব সমাজ পরিবর্তনের অসমাপ্ত বিপ্লব। বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার স্বার্থে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করতে হবে অন্যান্য সব জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল দলগুলোর সাথে।" এ ব্যাপারে আমাদের বিভিন্ন মহলের সাথে আলোচনার কথা শুনে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। সেদিন আমাদের আলাপ হচ্ছিল পুরনো বন্ধুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। একান্ত বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতার সাথে আলোচনা করেছিলাম আমরা। সেদিন কোন বিশেষ দলের নেতা হিসাবে কথা বলছিলেন না কর্নেল তাহের। তার অঙ্গীকারে খুঁজে পেয়েছিলাম নিষ্কলুশ-নিবেদিত প্রাণ, দেশপ্রেমিক একজন সাচ্চা মুক্তিযোদ্ধার আন্তরিক উৎকন্ঠা। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে একদিন কোয়েটা থেকে একত্রে পালিয়ে আসার পরিকল্পনা প্রণয়নে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল সেই একই অনুপ্রেরণায় আজ আবার জাতির এক মহা ক্রান্তিলগ্নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম জাতীয় স্বার্থ বিরোধী যেকোন চক্রান্তের মোকাবেলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। রাজনৈতিক দর্শন এবং লক্ষ্য হাসিলের পদ্ধতিতে আমাদের মাঝে কোন কোন ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকলেও সেটা দেশ ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নয়। সে প্রশ্নে আমরা এক ও অভিন্ন। সিদ্ধান্ত নেয়া হল, যেকোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য সেনা পরিষদ এবং গণবাহিনীকে যৌথভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে অতি সতর্কতার সাথে। কর্নেল তাহের এবং আমাদের মাঝে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের বন্দোবস্ত করা হল।

৩রা নভেম্বরের ব্যর্থ ক্যু'দাতা এবং ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার সফল বিপ্লব

২রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও তার সঙ্গীরা প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দাতা ঘটাবার চেষ্টা করে

সেই ক্রান্তিলগ্নে নিম্মী ছিল আমার পাশেই। সর্বদাই ও আমার সব দুঃখ-কষ্টের সমান ভাগীদার হয়ে থেকেছে। সব বিপদ-আপদের মোকাবেলা করতেও কুন্ঠিত হয়নি কখনো।

২রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। গত বেশ কয়েকদিন কাজের চাপে বাসায় যাওয়া হয়নি। ঠিক করলাম দুপুরের পর কিছু সময়ের জন্য বাসায় যাব। প্ল্যান মাফিক লাঞ্চের পর এক ফাঁকে চলে এলাম মালিবাগে। বেশ কয়েকদিন বিরতির পর হঠাৎ আমার আগমনে বাসার সবাই খুব খুশী হল। সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোড় করা হল আনন্দঘন পরিবেশে। সন্ধ্যায় নিম্মীকে নিয়ে গেলাম মিনু ফুপ্পুর বাসায়। রাতের খাওয়া ওখানেই খেতে হল। বেশ রাত অব্দি গল্প-গুজব করে আমি আর নিম্মী ফিরছিলাম মালিবাগে। হঠাৎ নিম্মী বলল, "আজ আমি তোমার সাথে বঙ্গভবনে থাকব।" ১৫ই আগষ্টের পর থেকেই বেচারী ভীষণভাবে অবহেলিত। একদম সময় দিতে পারছিলাম না ওকে। বললাম, ঠিক আছে তাই হবে। দু'জনে ফিরলাম বঙ্গভবনে। সময় তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। তেমন কোন ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় আমার কামরার দিকে এগুচ্ছি, ডিউটিরত হাবিলদার এগিয়ে এসে বলল, "স্যার মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবাল সাহেব বঙ্গভবন ছেড়ে চলে গেছেন। ১ম ইষ্টবেঙ্গলের গার্ড রিপ্লেসমেন্ট ও এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি ঢাকা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স থেকে। সবাই আপনাকে খুঁজছেন। কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক এবং অন্যান্য সব অফিসাররাই প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে বৈঠক করছেন।" আচমকা খবরটা পেয়ে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যেভাবে অবস্থা গড়াচ্ছিল তাতে এমন কিছু একটা ঘটতে পারে সেটা অপ্রত্যাশিতও ছিল না। বিগত দিনগুলোর ঘটনা প্রবাহের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই ধরে নিয়েছিলাম সমস্ত ব্যাপারটাকে। নিম্মীকে কামরায় যেতে বলে দ্রুত গিয়ে হাজির হলাম প্রেসিডেন্টের স্যুইটে। প্রেসিডেন্ট সাহেব বেশ কিছুটা বিরক্ত এবং উত্তেজিতভাবে একটা সোফায় পা গুটিয়ে তার নিজস্ব স্টাইলে বসে তার পাইপে তামাক ভরছিলেন। কর্নেল রশিদ রেড টেলিফোনে কার সাথে যেন যোগাযোগের চেষ্টা করছিল। কর্নেল ফারুক আরেকটি সোফায় নিশ্চুপ বসেছিল। ঘরে ঢুকে প্রেসিডেন্টকে সালাম জানিয়ে কর্নেল রশিদের কাছে জানতে চাইলাম,

— ব্যাপার কি রশিদ, কি হয়েছে?

— যা এতদিন সন্দেহের পর্যায়ে ছিল তাই হয়েছে। তোর দুই বন্ধু হাফিজ এবং ইকবাল ১ম ইষ্টবেঙ্গলের সব **troops withdraw** করে নিয়ে গেছে বঙ্গভবন থেকে। প্রথমে সবাই মনে করেছিলাম এটা **routine replacement** এর ব্যাপার। কিন্তু সন্ধ্যার পরও যখন **replacement** এসে পৌঁছালো না তখন থেকেই ক্যান্টনমেন্টে ফোন করে চীফ জেনারেল জিয়া, সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ, ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত কাউকেই কন্ট্যাক্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে অস্বাভাবিক **troops movements** হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই কিছু পরিষ্কার করে বলতে পারছে না ক্যান্টনমেন্টে কি ঘটছে। জেনারেল ওসমানীর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি কিন্তু তিনিও সঠিক কিছু বলতে পারলেন না। তিনি বঙ্গভবনে আসছেন। জেনারেল ওসমানী ব্রিগেডিয়ার খলিলকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন বিডিআর-এর দু'টো রেজিমেন্ট বঙ্গভবনে পাঠিয়ে দিতে। হাফিজ এবং ইকবালকেও পাওয়া যাচ্ছে না টেলিফোনে। আমার সাথে কথা শেষ করে কর্নেল

ফারুককে বলা হল রেসকোর্সে তার ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের কাছে চলে যেতে।

কর্নেল ফারুক রেসকোর্সে যাবার জন্য উঠে দাড়াতেই আমি বললাম, "ফারুক তুই অবশ্যই রেসকোর্সে যাবি তবে **you would not move under any provocation or circumstances whatsoever.** সব বিষয়ে পরিষ্কার হবার পরই আমাদের করণীয় কি হবে সেটা বিবেচনা করা হবে। এর আগে আমাদের তরফ থেকে কোন মুভ নেয়াটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রথমত: চেষ্টা করতে হবে এই সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় কিনা। এর জন্য আমি নিজেই যাব ক্যান্টনমেন্টে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা আমার কোন কিছু না হওয়া পর্যন্ত **no action at all, is that clear?**" ইতিমধ্যে জেনারেল ওসমানীও এসে পৌঁছেছেন। তিনিও আমার অভিমতকে সমর্থন জানালেন। আমরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত তখন বিডিআর-এর দু'টো রেজিমেন্ট এসে পৌঁছে গেছে সে খবর নিয়ে এল মেজর পাশা, মেজর শাহরিয়ার এবং ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা। নিম্মীই গিয়ে তাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেজর শাহরিয়ার চলে গেল তার রেডিও বাংলাদেশের কন্ট্রোল সেন্টারে। ক্যাপ্টেন হুদা প্রেসিডেন্ট, জেনারেল ওসমানী এবং কর্নেল রশিদকে সাহায্য করার জন্য বঙ্গভবনেই থাকবে সেটাই সিদ্ধান্ত হল। বাকিরা সবাই প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট এবং ডেপ্লয়েড ইউনিটগুলোর কমান্ড নেবার জন্য যার যার পজিশনে চলে গেল। আমি বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক সেই সময় কর্নেল রশিদ আন্তরিকভাবেই বলেছিল,

— ডালিম ভেবে দেখ, এই অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া ঠিক হবে কিনা?

সেই তরল অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়াটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও তাৎক্ষণিক জবাব দিয়েছিলাম,

— এই ক্রান্তিলগ্নে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে **someone has to clean the dirty linen then why not me?**

প্রেসিডেন্টের স্যুইট থেকে বেরিয়ে চলে এলাম আমার কামরায়। বেচারী নিম্মী অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল,

— এখন কি হবে? আমি বললাম,

— তুমি বঙ্গভবন ছেড়ে ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাও। ঠিক বুঝতে পারছি না ঘটনা কোনদিকে মোড় নেয়। যাই হোক না কেন; বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।

ড্রাইভারকে ডাকিয়ে এনে নির্দেশ দিলাম,

— বেগম সাহেবের হুকুম মত তার সাথেই থাকবে তুমি যতক্ষণ তিনি চান। নিম্মী কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নিশী রাতে একা একা বেরিয়ে গেল একরাশ আশঙ্কা মনে নিয়ে অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে।

যাবার সময় অশ্রুসিক্ত চোখে ধরা গলায় শুধু বলে গেল,

— আল্লাহর হাতেই তোমাকে সোর্পদ করে দিয়ে গেলাম। সাবধানে থেকো।

শান্তির সন্ধানে

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংঘাত এবং রক্তক্ষয় এড়ানোটাই ছিল প্রথম কাজ। সৈনিকদের সাথে কথা বলার পর আমার আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গিয়েছিল। আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম রক্তক্ষয় এবং সংঘাত দু'টোই এড়ানো সম্ভব হবে।

আমিও ইউনিফর্ম পড়ে নিয়ে আমার বিশ্বস্ত গার্ড, এস্কট, অয়্যারলেস অপারেটার এবং ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম আজিমপুরে মিসেস মোয়াজ্জেম কহিনূর ভাবীর বাসায়; মেজর নূর রয়েছে সেখানে। সব শুনে নূর বলল,

— রক্তপাত বন্ধ করার একমাত্র উপায় মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথে সরাসরি দেখা করা। এছাড়া রক্তপাত কিছুতেই এড়ানো সম্ভব হবে না।

আমিও নূরের সাথে একমত হয়ে বললাম,

— সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি তোমাকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে যাবার জন্য।

ঠিক করলাম, ক্যান্টনমেন্টে যাবার আগে সার্বিক অবস্থাটা সরেজমিনে আরো একটু ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার। আমরা জিপে করে গিয়ে উপস্থিত হলাম ফুলার রোডে প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের বাসায়। ওখানে তখন মহুয়া এবং লিটু থাকত। উদ্দেশ্য থাকি পোষাক বদলে সাধারণ কাপড় পরে নেবো। ঘুম থেকে মহুয়াদের ডেকে তুললাম। সংক্ষেপে মহুয়া এবং লিটুকে অবস্থা বুঝিয়ে লিটুর কয়েকপ্রস্ত কাপড় চেয়ে নিয়ে আমরা সবাই ড্রেস পরিবর্তন করে নিলাম। মহুয়া জিজ্ঞেস করল,

— নিম্মী কোথায়? বললাম,

— বঙ্গভবনে ওকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বলে এসেছি ও যেন কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। তুই আত্মীয়-স্বজনদের ফোন করে সতর্ক করে দিস।

এরপর আমরা বেরুলাম শহর প্রদক্ষিন করতে। পুরো ভার্সিটি এলাকা, পিলখানা, নিউ মার্কেট, সেকেন্ড ক্যাপিটাল, রামপুরা টিভি ষ্টেশন, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া, রাজারবাগ পুলিশ লাইন। কোথাও কোন অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সৈনিকদের সুরক্ষিত চেকপোষ্টগুলোই নজরে পড়ল। **strategically deployed tanks** গুলোও দেখলাম ঠিকমতই রয়েছে। প্রায় সারা শহরটাই ঘুরে এলাম শাহরিয়ারের কন্ট্রোল রুমে। ওর ঘরে ঢুকতেই দেখি ও কারো সাথে টেলিফোনে কথা বলছে। আমাদের দেখে সংক্ষেপে কথা সেরে জানতে চাইলো,

— কি অবস্থা স্যার, কি বুঝছেন!

আমরা ঘুরে ফিরে যা দেখেছি তাই বললাম। শাহরিয়ার জানাল, তার খবরা-খবরও প্রায় একই রকম; তবে সাভারের বুষ্টার ষ্টেশনের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অজানা কারণে। ফলে রেডিও ষ্টেশন থেকে কোন কিছু প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে না। টিভির প্রচারণাও একই কারণে সম্ভব নয়। তাকে আমরা জানালাম,

— আমরা ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছি রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করার চেষ্টায়। নিজেদের মধ্যে যে কোন প্রকার সংঘর্ষ বন্ধ করতেই হবে যে কোন উপায়ে যাতে করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপের সুযোগ না পায়।

শাহরিয়ার আরো জানিয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও জেনারেল জিয়ার সাথে সে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়নি। শাহরিয়ারের ওখানে যাবার আগেই সোনাটেঙ্গরে আমার প্রিয় মেঝো ফুপ্পুর (বিভা ফুপ্পু) বাসায় গিয়েছিলাম কতগুলো বিশেষ জরুরী টেলিফোন কল সেরে নেবার জন্য। তাদের ফোনটা খারাপ ছিল কিন্তু ইমান আলী ফুপ্পা পাশেই তার এক কলিগের বাসা থেকে ফোন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই আমাদের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন ইউনিটের সেনা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে বুঝলাম তারা প্রায় সবাই অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। তাদের সংক্ষেপে প্রতিবিপ্লবী

অভ্যুত্থানের আশংকার কথা জানিয়ে অবস্থার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে জেনারেল জিয়ার বাসায় ফোন করে বুঝতে পারলাম তার বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। দেশের অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের সাথেও যোগাযোগ করেছিলাম সেই বাসা থেকেই। যোগাযোগের পর বুঝতে পারলাম ঘটনাটা ঘটানো হচ্ছে অতি সীমিত পরিসরে ঢাকা ভিত্তিক। এতে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। নিশ্চয়ই রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হবে।

শাহরিয়ারের ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চললাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে একটু এগুতেই দুই ট্রাক সৈনিক দেখতে পেলাম মাউন্টেড অবস্থায়। কাছে যেতেই দেখলাম তারা ৪র্থ ইষ্টবেঙ্গলের। **Contingent commander**-কে জিজ্ঞাসা করলাম,

— তোমরা এখানে কেন?

জবাবে সুবেদার সাহেব স্যালুট করে জানাল,

— আগামীকাল আওয়ামী লীগের প্রসেশন বের হবার সম্ভাবনা আছে; তাই হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের এয়ারপোর্ট এলাকায় ডেপ্লয়েড থাকতে হবে আইন-শৃংখলা বজায়ে রাখার জন্য।

তার জবাব শুনে বুঝতে পারলাম, খালেদ চক্র ট্রুপসদের কাছে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলেনি সৈনিকদের সমর্থন না পাওয়ার ভয়ে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত তার অধিনস্থ ৪র্থ বেঙ্গলকে চতুরতার সাথে মোতায়ন করেছে **just as show of force** হিসাবে আমাদের ভয় দেখাবার জন্য। সৈনিকদের কাছে খুলে বলা হয়নি সরকার এবং জিয়া বিরোধী পাল্টা অভ্যুত্থানের কথা। মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জেনারেল জিয়াকে প্রায় বন্দী করা অবস্থায় রাখা হয়েছে এ কথাটা বলার মত সাহস হয়নি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের। কারণ তারা ভালোভাবেই জানতেন, এ ধরণের কোন পদক্ষেপকে কিছুতেই মেনে নেবেনা দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ অফিসার ও সৈনিকরা। সবকিছু দেখে শুনে বুঝলাম, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরাসরি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সাথেও আলোচনা করা সম্ভব। তার বাসাতেই গেলাম প্রথম। বাসায় তাকে পাওয়া গেল না। বাসা থেকে বলা হল, তিনি সেনা সদরে গেছেন। পৌঁছালাম সেনা সদরে। সেখানেও কেউ নেই। সেন্ট্রি, ডিউটি অফিসার ও ক্লার্ক ছাড়া পুরো সেনা সদরটা নিস্তব্ধ। সেখান থেকে গেলাম মেজর হাফিজের বাসায়। হাফিজ বাসায় নেই। ইকবালের খোঁজ করে তাকেও পাওয়া গেল না। এরপর গেলাম কর্নেল শাফায়াত জামিলের বাসায়। সেখান থেকে জানানো হল তিনি ব্রিগেড হেডকোয়াটার্স এ গেছেন। সেখান থেকে ব্রিগেড হেডকোয়াটার্স এ যাবার পথে দেখলাম জেনারেল জিয়ার বাসার সামনে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। ডিউটিরত গার্ডসরা তাদের দায়িত্ব পালন করছে। ব্রিগেড হেডকোয়াটার্সেও নেই তারা। সেখান থেকে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের গেইট দিয়ে ঢুকতেই দেখি ট্রুপসরা সেখানে সব **stand to** অবস্থায় পজিশন নিয়ে আছে। এ ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কেন জানতে চাইলে আমাদের বলা হল যে, সন্ধ্যার পর রাতের আধাঁরে ৪র্থ বেঙ্গল ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের দিকে তাক করে তাদের **RR (Recoilless Rifle)** এবং সৈন্য মোতায়েন করেছে; তাই তারাও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ৪র্থ বেঙ্গল এবং ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট পাশাপাশি দু'টি ইউনিট। তাদের মধ্যে এ ধরণের উত্তেজনা যেকোন সময় বিষ্ফোরন ঘটাতে পারে। উত্তেজনা কমানোর জন্য সেনা পরিষদের সদস্যদের সার্বিক অবস্থা বুঝিয়ে তাদের বললাম, এই অবস্থায় সতর্ক অবশ্যই থাকতে হবে সবাইকে। আরো জানালাম, আমরা ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে খুঁজছি। ওদের পেলেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ৪র্থ বেঙ্গলের উস্কানিমূলক কার্যক্রম বন্ধ করার বন্দোবস্ত করব। সেখানেই জানতে পারলাম মহারথীরা সব ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্স এ রয়েছেন। ৪র্থ বেঙ্গলের গেইট দিয়ে ঢুকতেই নজরে পড়ল সাজ সাজ রব। ভীষণ ব্যস্ততা! সৈনিকদের রনসজ্জায় সজ্জিত করে রাখা হয়েছে। কিছুদূর এগুতেই ক্যাপ্টেন কবিরের দেখা পেলাম। একটি এসএমজি কাঁধে ঝুলিয়ে সে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল কবির। তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

— **Where is Brig. Khaled and Col. Shaffat?**

— **They all here Sir.** জবাব দিল কবির।

কবিরের সাথে কথা বলছিলাম এমন সময় ল্যান্সারস-এর ক্যাপ্টেন নাছের এসে উপস্থিত হল।

— **Assalamu Alaicum, welcome Sir.** বলেই করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন নাছের।

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়েই করমর্দন করলাম আমি ও নূর।

— স্যার, মোশতাক এবং জিয়াকে দিয়ে আমাদের কোন উদ্দেশ্যই সফল করা সম্ভব হবে না। **Both of them are self centered and hypocrite. They are not the right kind of people Sir.** তাই আমরা ওদের অপসারন **and I am sure both of you would be definitely with us.**

ওকে অনেকটা থামিয়ে দিয়েই বললাম,

— **Is Brig. Khaled around?**

— সবাই এখানেই আছেন। মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালও রয়েছেন এখানে।

— **Naser do me a favour, please find out Hafiz and tell him I would like to talk to him.**

— "**Ok sir.** আমি এখুনি যাচ্ছি তাকে নিয়ে আসার জন্যে। আপনারা ততক্ষণ এ্যাডজুটেন্টের অফিসে অপেক্ষা করুন" বলে চলে গেল নাসের।

এ্যাডজুটেন্টের ঘরে ঢুকে দেখি ইউনির্ফম পরা অবস্থায় কর্নেল আমিনুল হক বীর উত্তম ও লেফটেন্যান্ট মুনিরুল ইসলাম চৌধুরী বিষন্ন হয়ে চুপচাপ বসে আছে। কর্নেল আমিনকে জিজ্ঞাসা করলাম,

— কি ব্যাপার স্যার, আপনাদের এই দশা কেন? **What's up?**

— **You must be jocking at our miserable plight is'nt it Dalim?** তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারছ না ইউনিট কমান্ডার এবং এ্যাডজুটেন্ট হয়েও নিজেদের ব্যাটালিয়নেই আমাদের এমন নিঃক্রিয় অবস্থায় বসে থাকতে হচ্ছে তার মানেটা কি?

— কিছু মনে করবেন না স্যার। আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? এমন কিছু যে ঘটতে পারে সেটাতো অজানা ছিল না আপনাদের অনেকেরই। সময়মত এ্যাকশন না নেবার ব্যর্থতার জন্যই আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাই নয় কি?

আমার প্রশ্নের ঈঙ্গিত বুঝে কর্নেল আমিন চুপ করে রইলেন। বস্তুতঃ কর্নেল আমিন ও লেফটেন্যান্ট মুন্নাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে না করায় তাদের প্রায় বন্দী অবস্থাতেই রাখা হয়েছে তাদের নিজস্ব ইউনিটেই। খবর পেয়েই হাফিজ এবং ইকবাল এল। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালো পাশের একটি খালি কামরায়।

— এ কি করলে হাফিজ! শেষ পর্যন্ত অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লে?

— অঘটন বলছ কেন? জিয়া এবং মোশতাকের ঘোড়েল মনের পরিচয় পাবার পরও তারা যে আমাদের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে মোটেও আন্তরিক নয় সেটা তোমরা বুঝেও মেনে নিতে পারছ না কেন? **Both of them are betraying our cause.** উল্টো প্রশ্ন করল হাফিজ। ওদের বাদ দিয়েই এগুতে হবে। আওয়ামী লীগের গড়া সংসদকেও আর কাল বিলম্ব না করে ভেঙ্গে দিতে হবে। এই সঠিক উদ্যোগে বিশেষ করে তোমার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, শাহরিয়ার এর মাধ্যমে সেনা পরিষদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পাব আশা করছি আমরা। আমি জানি ব্রিগেডিয়ার খালেদ সম্পর্কে তোমাদের যুক্তিসঙ্গত **reservations** আছে; সেগুলোকে আমিও অস্বীকার করছি না কিন্তু এরপরও ব্রিগেডিয়ার খালেদের চীফ হবার **lifelong ambition fulfill** করে দিলে জিয়ার তুলনায় তাকে দিয়ে **more efficiently** কাজ করানো যাবে।

— দেখ হাফিজ, আমি স্বীকার আগেও করেছি এখনো করছি, আশানুরূপভাবে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ হতে হচ্ছে জেনারেল জিয়া এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাকের জন্য। শুধু তাই নয়; অনেকক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করছেন তারা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, কিন্তু তাই বলে হঠাৎ করে এ ধরণের একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর্মির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে অপশক্তিকে সুযোগ করে দিতে হবে **to stage back and reverse the process** সেটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না এবং আমাদের কাছেও

সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তা যাক, এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে; আমার ধারণা- এসমস্ত বোঝাবুঝির সময় পার হয়ে গেছে কারণ যে অঘটন কখনোই সম্ভব হত না সেটাই ঘটিয়ে বসেছো তোমরা। এই অবস্থায় কোন রক্তপাতের সূত্রপাত যাতে না ঘটে তার জন্যই আমরা স্বেচ্ছায় ছুটে এসেছি। এখন চলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে সঙ্গে করে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা যাক এই সংকটের রাহুগ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে কি করে উদ্ধার করা যায়। এ বিষয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে তবে সেটাও বলো পরিষ্কার করে। সেক্ষেত্রে আমরা ফিরে যাব। এরপর যা হবার তা হবে।

সার্বিক অবস্থার বিশ্লেষনের পর আমার এবং নূরের বিশ্বাস জন্মেছিল, আলোচনার প্রস্তাব কিছুতেই না মানা সম্ভব না খালেদ চক্রের কাছে; কারণ তাদের বিশেষ করে হাফিজ এবং ইকবালের অজানা ছিল না ঢাকায় তো বটেই অন্যান্য সেনানিবাসগুলোতেও সেনা পরিষদের শক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে তাদের চেয়ে অনেক বেশি। কি যেন ভাবল হাফিজ এরপর বলল,

— ঠিক আছে, তাই হবে। চলো আমাদের সাথে।

হাফিজ, আমি, নূর এবং ইকবাল ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেরুতেই দেখলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার মঈন, ক্যাপ্টেন নাছের, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, কর্নেল রউফ, কর্নেল মালেক প্রমুখ সবাই অফিস ব্লকের সামনে লনে দাড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। আমরা এগিয়ে যেতেই তারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে অভিবাদন জানাতেই তিনি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

— আরে এসো এসো, **welcome.** আমি জানতাম তোমরা দু'জন আসবেই।

তার কথা শেষ হতেই বললাম,

— শেষটায় অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লেন।

— **What do you mean? It's not my doing. Believe you me Dalim it is their's doing, these young officers. They think Zia can't deliver. They also think he will do nothing to achieve the goals of the 15th August revolution at the same time he is also totally incapable to protect the interest of the armed forces. Therefore, they want a change.**

— বুঝতে পারলাম স্যার, জেনারেল জিয়ার জায়গায় বসে সেই যোগ্য নেতৃত্ব দেবার জন্যই এই সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন অথবা করানো হয়েছে।

— **No! No! Not at all. I don't want to be the Chief. Believe me, I have no such ambition.** ছেলেরা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে তাই আমি এসেছি। দ্যাটস ইট!

কথার মাঝেই কে একজন বলে উঠল,

— **We don't mind to accept Brig. Khaled's leadership.**

— **Come on keep quite.**

ব্রিগেডিয়ার খালেদ সেই কন্ঠকে চুপ করিয়ে দিলেন।

— যাক স্যার, এ বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবার সময় এটা নয়; এতে কোন লাভও নেই। আমি ও নূর এসেছি কোন প্রকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ যাতে শুরু না হয় সেটা নিশ্চিত করতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। রশিদ এবং ফারুককে বলে এসেছি আপনাদের সাথে আমাদের আলোচনার ফলাফল জানার আগ পর্যন্ত বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাংক কিংবা ট্রুপস এর কোন মুভমেন্ট করা হবে না। এখন বলেন, আলোচনায় আপনারা রাজি আছেন কিনা?

আমার কথার ধরণে তারা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জবাব খোঁজার চেষ্টা করছিলেন সবাই। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ঠিক পাশেই দাড়িয়ে ছিল হাফিজ। সে নীচু স্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কিছু বলল। হাফিজের কথা শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন,

— তোমাদের আলোচনার প্রস্তাব মেনে নিলাম আমরা। আলোচনা হবে।

— কিন্তু আসার পথে দেখলাম এয়ারপোর্টের কাছে কিছু সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। অবশ্য, তাদের যে কথা বলে ডেপ্লয় করা হয়েছে তার সাথে আপনাদের কার্যকলাপ সঙ্গতিহীন।

যাক, সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু ৪র্থ বেঙ্গলের উস্কানিমূলক ডেপ্লয়মেন্টকে কেন্দ্র করে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টে যে ভয়ংকর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে সেটা প্রশমিত না করলে যেকোন মুহূর্তে বিষ্ফোরন ঘটতে পারে আর সেটা ঘটলে আমাদের আলোচনার কোন সুযোগই থাকবে না। তাই আমার অনুরোধ, খালেদ ভাই আপনি আলোচনায় বসার আগে ৪র্থ বেঙ্গলকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে **stand down** করার।

আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ কর্নেল শাফায়াতকে নির্দেশ দিলেন ৪র্থ বেঙ্গলকে **stand down** করানোর জন্য। কর্নেল শাফায়াত চলে গেলেন নির্দেশ কার্যকরী করতে।

ঐতিহাসিক এনকাউন্টার

অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর জন্য কী করা প্রয়োজন সেটা ঠিক করার জন্য আমি আলোচনার প্রস্তাব দেই। আমার প্রস্তাব গৃহিত হয়। আমরা সবাই ৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের অফিসে আলোচনায় বসি।

আমরা সবাই গিয়ে বসলাম কমান্ডিং অফিসারের ঘরে। প্রথমেই আমি জানতে চাইলাম জেনারেল জিয়ার সম্পর্কে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ জানালেন তিনি তার বাসাতেই আছেন এবং ভালোই আছেন। তার নিরাপত্তা এবং দেখাশুনার জন্য কিছু অতিরিক্ত সৈনিকে তার বাসার কাছে অবস্থান নিতে বলা হয়েছে এবং কাউকে তার সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না সাময়িকভাবে; এর বেশি কিছুই নয়। তার মানে হল, তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে এবং এই কথাটাও সৈনিকদের জানাবার সাহস হয়নি খালেদ চক্রের। আলোচনার আগেই জেনারেল জিয়ার ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে। আমি সোজা ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বললাম,

— স্যার কোন আলোচনায় বসার আগে একটা বিষয়ে আপনাকে পরিষ্কার করে দিতে চাই- জেনারেল জিয়ার সাথে এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে এর বেশি কিছু করা হলে সেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে **you have to give me your explicit assurance.**

বুদ্ধিমান লোক ব্রিগেডিয়ার খালেদ। তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। কোন সময় না নিয়েই তিনি জবাব দিলেন,

— **Be rest assured, no harm would be done to him. At the most he may be removed as the chief of army staff that's all. Nothing more than that…**

আলোচনা শুরু হল। একদিকে আমি ও নূর অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বে ওদের তরফের উপস্থিত প্রায় সবাই। শুরুতেই আমি সরাসরি প্রশ্ন রাখলাম,

— দেশে একটি জনপ্রিয় সরকার থাকতে এ ধরণের একটা সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি?

আমার প্রশ্নে উপস্থিত সবাই কেমন যেন থমকে গেলেন। মনে মনে সবাই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিলেন। নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে কর্নেল শাফায়াত বলে উঠলেন,

— **We want to dismiss the Mushtaq government and the present parliament because the present parliament is the parliament of Awami-Bksalites.**

জবাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

— তারপর?

— **We don't want Gen. Zia to remain as our Chief.**

— দেশ চালাবে কে? প্রশ্ন করলাম।

— "**We shall form a 'Revolutionary Council**" ক্যাপ্টেন ইকবাল জবাব দিল।

কর্নেল শাফায়াত আবার বলে উঠলেন,

— **Khandakar Mushtaq will handover power to the chief justice.**

ব্রিগেডিয়ার খালেদ ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন,

— **Continuation must be maintained and therefore, Khandaker Mushtaq will remain as the President but three Cheif's must be removed.**

বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না কোন নির্দিষ্ট ব্লু প্রিন্ট ছাড়াই অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন তারা। কোন পরিষ্কার পরিকল্পনা কিংবা মতানৈক্য কোনটাই নেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের। আলোচনা চলছে হঠাৎ আকাশে জঙ্গী বিমান উড়ার বিকট শব্দে সবাই চমকে উঠলাম। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম,

— **Sir, why the MIGS are up? For heaven's sake stop this provocative act. Otherwise, it would be simply impossible to holdback Col. Farooq. He will**

roll his tanks towards the cantonment.

ব্রিগেডিয়ার খালেদ টেলিফোন রিসিভার উঠিয়ে নিয়ে এয়ারফোর্স কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত নিজের উদ্যোগেই মিগ নিয়ে আকাশে উড়েছে। খবরটা জেনে তক্ষুণি Air traffic control -এর মাধ্যমে লিয়াকতকে অবিলম্বে নেমে আসার নির্দেশ দিয়ে তাকে ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্স এ আসার জন্য বললেন। রিসিভার নামিয়ে রাখার পরপরই মেস ওয়েটার এসে জানাল প্রাতঃরাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গরম গরম আলুভাজি, ডালপুরি এবং চায়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে রেজিমেন্টের ফিল্ড মেসে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ আমন্ত্রণ জানালেন নাস্তার জন্য। নাস্তা শেষ করে বেরিয়ে এসেছি হঠাৎ নজরে পড়ল কর্নেল মান্নাফ ইউনির্ফম পরে দাড়িয়ে আছেন। ব্রিগেডিয়ার বেরিয়ে আসামাত্র তিনি তার দিকে ত্রস্তপায়ে এগিয়ে এসে সেল্যুট করে বললেন, **Khaled you are the Boss, I salute you as a deciplined soldier and I am with you.** তার ব্যবহার দেখে ভাবলাম কি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ এই কর্নেল মান্নাফ! ১৫ই আগষ্ট সকালে ঠিক একই কায়দায় তিনি আমাকে একই কথা বলেছিলেন। সেদিন একজন সিনিয়র অফিসার হিসাবে তার ঐ ধরণের ব্যবহারে আমি বেশ বিব্রতবোধ করেছিলাম। সামান্য একটা চাকুরির জন্য আত্মসম্মানও যারা বিকিয়ে দিয়ে গিরগিটির মত রূপ পাল্টাতে পারেন সেই সমস্ত র্দুবল চরিত্রের অফিসারদের পক্ষে কখনোই তাদের অধিনস্থ সহকর্মীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য লাভ করা সম্ভব নয়। তার ঐ ধরণের গায়ে পড়া মোসাহেবীপনা সবার কাছেই হাস্যকর মনে হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ তার কথার কোন জবাব দেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। মুচকি হেসে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন,

— **Let's get down to business, we have to discuss a lot.**

আমরা সবাই আবার গিয়ে বসলাম আলোচনায়। আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়ার পর কর্নেল সাব্বিউদ্দিন এসে আলোচনায় শরিক হলেন।

— তুমি অযৌক্তিকভাবেই সব ঘটনার জন্য আমাকেই দোষারোপ করছ। যা ঘটেছে তার জন্য শুধুমাত্র একা আমি দায়ী নই। জিয়ার বিরুদ্ধে তরুণ অফিসাররা অসন্তুষ্ট। তারা বুঝতে পেরেছে কোন বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তার নেই। মোশতাক এবং জিয়ার উপর বিতশ্রদ্ধ্য; তাই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে এদের বিরুদ্ধে।

বলেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন কবির প্রমুখদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। এদের অনুরোধেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

বুঝলাম, তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী চতুর ব্রিগেডিয়ার খালেদ অতি কৌশলে গা বাঁচিয়ে অন্যদের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজের উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

— জেনারেল জিয়াকে সরিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যোগ্য নেতৃত্ব দেবার দায়িত্বটা কি আপনিই নিবেন স্যার?

আমার প্রশ্নের জবাবে নিজের সাফাই দেবার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

— তুমি কি মনে কর চীফ হওয়ার জন্যই আমি এখানে এসেছি?

— আমি কিছুই মনে করছি না, শুধু জানতে চাইছি আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি? কি আপনাদের দাবি-দাওয়া? আপনাদের দাবিগুলো পরিষ্কারভাবে জানার পরইতো সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা সম্ভব তাই নয় কি স্যার? ক্ষমতার লড়াই এবং রক্তপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যেইতো ছুটে এসেছি আমি ও নূর। ইনশাল্লাহ্ দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবোই যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে।

আমার বক্তব্য শেষ হতেই ল্যান্সারস এর ক্যাপ্টেন নাসের উঠে বলল,

— **Yes, we want Brigadier Khaled to be our Chief.**

"Yes, Yes" উৎসাহী সমর্থন শোনা গেল কিছু তরুণ অফিসারের গলায়। ঠিক সেই সময় duty officer খবর নিয়ে এল স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত এসেছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ duty officer-

কে বলল লিয়াকতকে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে। লিয়াকত ঘরে ঢুকে সেল্যুট করতেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ জিজ্ঞাসা করলেন,

— What's up man! Why did you took off?

— Sir, I got information that Col. Farooq had started up his tanks at the racecourse and was mooving towards the cantonment that's why I went up.

— ডালিম, তুমি বলছ রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্যই তোমরা এখানে এসেছ অথচ তোমাদেরই একজন ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের পায়তারা করছে। Is in't a contradiction? How can you justify this?

— Sir, please have trust on me. Let me check what is happening. I assure Sir, nothing of that kind would ever happen.

বলেই পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলাম কর্নেল রশিদের সাথে যোগাযোগের জন্য। ঘরে ঢুকেই দেখি এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবকে ইতিমধ্যেই ধরে আনা হয়েছে। বিমর্ষ চিত্তে নির্বাক হয়ে বসেছিলেন তিনি। পাশেই নেভ্যাল চীফ রিয়ার এডমিরাল এম.এইচ. খানও বসে আছেন দেখলাম। তারও একই অবস্থা। শংকা-উদ্বেগে দু'জনেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। আমাকে দেখে তারা দু'জনেই যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেলেন। এয়ার চীফ ত্রস্তে উঠে এসে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,

— ডালিম, তুমি এখানে! কি হচ্ছে বলতো?

তার প্রশ্নের জবাবে শুধু বললাম,

— স্যার ঘাবড়াবেন না। Take it easy. চুপচাপ বসে দেখেন কি হচ্ছে।

টেলিফোন তুলে নিয়ে বঙ্গভবনে কর্নেল রশিদের সাথে যোগাযোগ করলাম।

— রশিদ, ডালিম বলছি ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্স থেকে। এখানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল এবং অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত রয়েছেন। এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব এবং রিয়ার এডমিরাল এম.এইচ. খানও আছেন। জেনারেল জিয়াকে তার বাসাতেই রাখা হয়েছে। আমার সাথে নূরও রয়েছে। আলোচনা চলছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদের নির্দেশে লিয়াকত মিগ উড়ানো বন্ধ করে এখানে ফিরে এসেছে। তারা অভিযোগ করছেন কর্নেল ফারুক নাকি তার ট্যাংক বহর নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে; যদি খবর সত্যি হয়ে থাকে তবে তাকে এ ধরণের উদ্যোগ নিতে নিষেধ কর্। No tanks should roll down the street whatsoever. ওদের দাবি-দাওয়া জেনে নিয়ে আমি আসছি বঙ্গভবনে as soon as possible. ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বলেছি রক্তক্ষয়ী সংঘাতের হাত থেকে দেশও জাতিকে বাঁচাবার শানি-পূর্ণ উপায় খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্যই আমি ও নূর এসেছি। তারা আলোচনায় যখন রাজি হয়েছেন এবং আলোচনা চলছে সেক্ষেত্রে you have to ensure that no provocative action is initiated from our side. Please talk to Farooq and tell him to restrain himself.

— "আমি এক্ষুণি কর্নেল ফারুকের সাথে যোগাযোগ করে তাকে বলছি এ ধরণের কোন উদ্যোগ না নিতে।" জবাব দিল কর্নেল রশিদ।

কন্‌ফারেন্স রুমে ফিরে এসে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

— Don't worry Sir, Col. Farooq will not move his tanks.

আমার কথা শোনার পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ তাদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করলেন,

— Where is Air Vice Marshal Twab?

— "He is here Sir." জবাব দিল অফিসার।

— "Bring him in." নির্দেশ দিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

এভিএম তোয়াবকে নিয়ে আসা হল কন্‌ফারেন্স রুমে। ভিতরে ঢুকে সবাইকে দেখে তিনি কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন,

— Well Khaled, would you please tell me why the aircheif has been brought here in such a disgraceful way! What's happening? Where do I stand? Am I still the Chief?

তার কথা শেষ না হতেই ক্রোধে চেয়ার ছেড়ে উঠে গর্জে উঠল স্কোয়ার্ডন লিডার লিয়াকত,

— **Shut up you! You are no more the Chief. I have taken over the command of the air force.**

লিয়াকতের কথার ধরণে স্লিপিং স্যুট পরিহিত এভিএম তোয়াব কুকঁড়ে গিয়ে বসে পড়লেন খালি একটা চেয়ারে।

— "**Make him sit in some other place.**" বললেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

তার আদেশে জনাব তোয়াবকে আবার পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। এই ড্রামার পর আবার আমাদের আলোচনা শুরু হল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন,

ডালিম, আমাদের দাবি চারটি:-

১। খন্দোকার মোশতাকই প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

২। বর্তমানের তিন চীফ অফ স্টাফকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের জায়গায় গ্রহণযোগ্য নতুন চীফ অফ স্টাফ নিয়োগ করতে হবে আর্মি, এয়ারফোর্স এবং নেভীতে।

৩। আর্মিতে **chain of command re-establish** করতে হবে। বঙ্গভবন এবং শহরে **deployed** সমস্ত ট্রুপস এবং ট্যাংকস ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

৪। বাকশালী শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে বর্তমানের সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। বহুদলীয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশ পরিচালিত হবে সামরিক শাসনের মাধ্যমে।

বুঝতে পারলাম, বর্তমানে জনগণের মানসিকতা এবং গ্রহণযোগ্যতার কথা চিন্তা করেই দাবিগুলো র্নিধারণ করা হয়েছে। অত্যন্ত চতুরতার সাথে সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে বর্তমান রাজনৈতিক ধারাকে উল্টে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে। এ ধরণের সুক্ষ্ম পরিকল্পনা শুধুমাত্র ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের কাজ নয় এবং এর পিছনে যে অজানা চানক্যরা রয়েছেন সেটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না আমার। যাই হোক, সব শুনে আমি বললাম,

— ঠিক আছে খালেদ ভাই। প্রেসিডেন্টের সাথে আপনাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য চলুন তবে বঙ্গভবনে যাওয়া যাক।

আমার প্রস্তাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যরা কেন জানি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কর্নেল শাফায়াত ব্রিগেডিয়ার খালেদের হয়ে জবাব দিলেন,

— ব্রিগেডিয়ার খালেদ বঙ্গভবনে যাবেন না। তার প্রতিনিধি পাঠানো হবে।

জবাব শুনে রসিকতাচ্ছলে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

— আমরাতো নিজেরাই ছুটে এসেছি। আপনারা আমাদের সাথে কোন আলোচনা করতে আদৌ রাজি হবেন কিনা সে বিষয়েও আমরা নিশ্চিত ছিলাম না তবু এসেছি। আপনাদের সাথে বসে আলোচনা করতে আমাদেরতো কোন ভয় হচ্ছে না; সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিনিধি পাঠাতে চাচ্ছেন কেন? নিজেই চলুন না আমাদের সাথে। ভয় পাচ্ছেন নাকি স্যার? **For heaven's sake have a heart! We must have mutual trust and confidence and that is the only basis on which we shall succeed to find out a way to salvage the nation from this uncalled for crisis. Don't you agree with me Sir?**

আমার রসিকতার কোন জবাব দিলেন না খালেদ ভাই। ঠিক হল, তাদের তরফের প্রতিনিধি হয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক যাবেন আমাদের সাথে বঙ্গভবনে। তাদের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দু'জনকে সাথে করে আমরা ফিরে এলাম বঙ্গভবনে।

আসার পথে দেখলাম রাস্তাঘাটে মানুষজন র্নিলিপ্তভাবে চলাফেরা করছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাকা শহর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে। স্বাভাবিক অবস্থার আড়ালে কি ভীষণ বিষ্ফোরন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে জনগণ এখন পর্যন্ত বে-খবর। অন্যান্য দিনের মতই আজও তারা বেরিয়ে পড়েছে জীবিকার তাড়নায়।

বঙ্গভবন

রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ ছিল স্বাভাবিক। রাজকীয় এবং মনোরম। অস্বাভাবিকতা কিংবা আতংকের কিছুই দৃশ্যতঃ চোখে পড়ছিল না।

বঙ্গভবনের গেটেই নজরে পড়ল বিডিআর-এর সশস্ত্র সৈনিকরা পজিশন নিয়ে আছে। মিলিটারি সেক্রেটারীর কামরায় কর্নেল মান্নাফ ও মেজর মালেককে বসিয়ে আমি ও নুর গিয়ে ঢুকলাম প্রেসিডেন্টের কামরায়। সেখানে প্রেসিডেন্টের সাথে জেনারেল ওসমানী ও কর্নেল রশিদকে আলাপরত অবস্থায় পেলাম। হুদা ব্যস্ত ছিল নোট নেয়ায়। আমরা ঢুকতেই তারা জানতে চাইলেন, ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা কি? আমি বিস্তারিত সবকিছু খুলে বলে জানালাম, ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বেই ঘটেছে সব কিছু। তাদের সবার তরফ থেকে চারটি দাবি নিয়ে এসেছেন কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক। এরা দু'জনেই জেনারেল ওসমানীর কাছে বিশেষভাবে পরিচিত; তাই নাম শুনতেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন,

— How could they give their allegiance to Khaled!

জবাবে আমি বললাম,

— স্যার, মানুষের চরিত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীল। এ নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই এখন। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূল সমস্যা নিয়েই ভাবতে হবে।

সবাই আমাদের অভিমত কি সেটা জানতে চাওয়ায় নূর ও আমার পক্ষ থেকে আমিই আমাদের অভিমত জানালাম,

প্রথমত: আমি মনে করি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের এই putch কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমরাই বেশি শক্তিশালী। জনগণ এবং সৈনিকরা যখন তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে তখন এই ক্যু'দাতা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। শুধু তাই নয়; তখন তারা এর বিরোধিতা করার জন্যও মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের তরফ থেকে কোন প্রকার সামরিক অভিযানের তৎপরতা হবে আত্মঘাতী। তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হওয়ার আগে কোন প্রকার সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পরলে দেশের জনগণ এবং বিভিন্ন সেনানিবাসের সৈনিকরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়বে ফলে দেশে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটবে; জনগণ এটাকে শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর আভ্যন্তরীন ক্ষমতার লড়াই হিসাবে বিবেচনা করে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পরে সব কিছু থেকে নিজেদের দূরে সরিয়েও রাখতে পারে। এই দুই ধরণের অবস্থারই পূর্ণ সুযোগ নিবে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী ত্রানদাতা হিসাবে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরাজিত শক্তিকে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে দেশকে আবার নিয়ে যাবে আগষ্ট বিপ্লবের পূর্বাবস্থায়; জনগণের কিছু বোঝার আগেই। এ ধরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি এই সময় কোন প্রকার দ্বন্দ্বে না গিয়ে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরে দাড়াই তবে আমার বিশ্বাস, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খালেদ চক্রের নিজস্ব কীর্তিকলাপের মাধ্যমেই খসে পরবে তাদের মুখোশ; ফলে দেশবাসী এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা জানতে পারবে তাদের আসল পরিচয়। সবাই যখন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে যে, পরাজিত আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসন এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বিনিময়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য তাদের উস্কানি এবং মদদ নিয়েই পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন; তখন যদি কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় খালেদ চক্রের বিরুদ্ধে তবে সেই উদ্যোগকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও সমর্থন জানাবে দেশবাসী। ঠিক একইভাবে যেমনটি তারা জানিয়েছিল ১৫ই আগষ্ট বিপ্লবকে। সেক্ষেত্রে জাতীয় বেঈমান ও তাদের বিদেশী প্রভুদের যেকোন হুমকির মোকাবেলায় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে

জাগ্রত জনতা। সিপাহী-জনতার ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী করা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে; যেমনটি হয়নি আগষ্ট বিপ্লবের পর।

দ্বিতীয়ত: আমি মনে করি জাতিকে ধোকা দেবার জন্য কৌশল হিসাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগীরা প্রেসিডেন্ট মোশতাককে সামনে রেখে আমাদের নিয়োজিত চীফ অফ স্টাফদের অপসারন করে সমস্ত সামরিক বাহিনীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার হীন প্রচেষ্টা করছে। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে এই কাজটি হাসিল করার পর অতি সহজেই তাঁকে সরিয়ে তাদের রাজনৈতিক দোসরদের ক্ষমতায় পুনর্বহাল করবে তারা। তাই আমি মনে করি, জাতীয় বেঈমানদের নীলনকশা বাস্তবায়নে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কোনরূপ ভূমিকা রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। যদি রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হয় তবে সেটা তাকে করতে হবে আগষ্ট বিপ্লবের চেতনার আলোকেই; তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজিয়ে রেখেই। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে নয়। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রকে পরিষ্কার করে বলে দেয়া উচিত। তারা যদি প্রেসিডেন্টের শর্ত মেনে নিতে রাজি না হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের ছেড়ে দেওয়াই উচিত হবে বলে মনে করি আমি। আমার বক্তব্যের আলোকে রুদ্ধদ্বার অবস্থায় আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। আমার যুক্তি মেনে নিয়ে সবাই একমত হলেন এই মুহূর্তে কোনরূপ সামরিক সংঘর্ষে যাওয়া ঠিক হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের প্রতিনিধিদের কি বলা হবে সেটাও ঠিক করে নেয়া হল।

একজন পাকা স্টেটস্‌ম্যান হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করলেন রাষ্ট্রপতি খন্দোকার মোশতাক আহমদ

প্রতিনিধিদের মুখোমুখি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা রাখলেন তিনি। অতি কঠোর এবং যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন তার নিজস্ব চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

আমাদের আলোচনার পর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেককে ডেকে পাঠানো হল প্রেসিডেন্টের অফিস কক্ষে। তারা দু'জনেই কামরায় ঢুকে প্রেসিডেন্টকে সেল্যুট করে দাড়াল। ভাব গম্ভীর পরিবেশ। আমরাও রয়েছি একপাশে। প্রেসিডেন্ট মোশতাক জানতে চাইলেন,

— বলো, তোমাদের কি বলার আছে ? কর্নেল মান্নাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদদের তরফের দাবিগুলি একটা একটা করে ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্টের জবাব জানতে চাইলেন।

সব কিছু শুনে খন্দোকার মোশতাক ধীর স্থিরভাবে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দৃঢ়তার সাথে বললেন,

— - Well I have heard you patiently, go back and tell the people at the cantonment, if they want me to continue as the President then I shall execute my responsibilities at my own terms for the best interest of the nation and the country. I am not at all prepared to remain as the head of state and government to be dictated by some Brigadier. Before anything I want the chain of command be restored immediately and Khaled should allow my three chief of staffs to come over to Bangabhaban without any further delay. Khaled should also withdraw the troops from the relay station so that the national radio and TV can resume normal broadcasting at the soonest possible time. My priority at this time is to bring back normalcy in the country. আমার নির্দেশ যদি খালেদ মানতে রাজি না হয়; তবে তাকে বলবে he should come over to Bangabhaban and takeover the country and do whatever he feels like. আমি একটা রিক্সা ডাইকা আগামসী লাইনে যামুগা।

ফিরে গেলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্সে

রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক শেষ করে আমরা ফিরলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্সে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চাইছিলেন আমরাও তার সাথে যোগ দেই।

প্রেসিডেন্টের জবাব শুনার পর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেকের সঙ্গে ফিরে এলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্স এ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যান্য সবাই আমাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে ছিলেন।

কর্নেল মান্নাফ সবার উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরলেন। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, খন্দোকার মোশতাকের কাঁধে বন্দুক রেখে তার অভিসন্ধি হাসিল করা সম্ভব হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদের চাল যে করেই হোক না কেন তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী জনাব মোশতাক ধরে ফেলেছেন এবং তাই তিনি তার ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করেছেন। মুহূর্তে চাঁপা আক্রোশে ফেটে পড়ল সবাই। কর্নেল শাফায়াত ক্ষোভে বলে উঠলেন,

— **How dare he speak like that?**

তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বলে উঠলেন,

— **Allright, we shall see.**

বলেই কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার মঈন, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত, কর্নেল রউফ, মেজর মালেক প্রমুখকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গিয়ে পাশের রুমে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বসলেন। খালেদ চক্রের মূল সমস্যা ছিল, সেনা পরিষদের সাংগঠনিক শক্তি, সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে জেনারেল জিয়ার এবং জাতীয় পরিসরে মোশতাক সরকারের জনপ্রিয়তা। আমাদের সমস্যা ছিল খালেদ চক্রের বাকশালপন্থী চেহারা উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ২৫বছর মেয়াদী চুক্তির আওতায় ভারতীয় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ না করে দেয়া। মিনিট বিশেক পর তারা ফিরে এলেন নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা শেষ করে।

— "ডালিম, খন্দোকার মোশতাক যখন আমাদের দাবিগুলো মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে রাজি হচ্ছেন না; সেক্ষেত্রে তাকে প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।" বললেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।

— "জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করাটা হবে সংবিধান বিরোধী। তাছাড়া, আইনের মানুষ হয়ে জাষ্টিস সায়েম কি অসাংবিধানিকভাবে এভাবে রাষ্ট্রপ্রতি হতে সম্মত হবেন?" জবাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

— **Well**, যে ভাবেই হোক না কেন; এই হস্তান্তরকে আইনসম্মত করে নিতে হবে। জাষ্টিস সায়েমকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমার।

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা থেকে আঁচ করতে অসুবিধা হল না কোন অদৃশ্য সুতার টানে তিনি এ ধরণের সংবিধান বর্হিভূত একটা সমীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন; কোন একটা বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য।

— এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপ না করে আমরা কিছুই বলতে পারব না স্যার। আপনি আপনার প্রতিনিধিদের আমাদের সাথে দিয়ে দেন; বঙ্গভবনে ফিরে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপের পর তার জবাব তারা আপনার কাছে নিয়ে আসবেন।

— "বেশ তাই হবে।" সম্মত হলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

— **Well Sir, if there is nothing else from your side then I think we should leave now.**

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালাম। সেই ক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবে খালেদ ভাই বললেন,

— ডালিম, একটা কথা- আমরা জানি তুমি, নূর, পাশা, শাহরিয়ার, হুদা, রাশেদ, মহিউদ্দিন ও

অন্যান্যরা সবাই নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা যুদ্ধকাল থেকেই দেশ ও জাতি সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণাও প্রায় এক। আমাদের তরফ থেকে আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, কর্নেল রশিদ এবং কর্নেল ফারুক ছাড়া কারো বিরুদ্ধেই আমাদের তেমন কোন অভিযোগ নেই। **Rather we expect your co-operation to fulfill our dreams. I request earnestly, please join us and strengthen our hands for the cause.**

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা শুনে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। অভাবনীয় প্রত্যাশা! বুঝতে পারছিলাম না তার এ প্রস্তাবে কতটুকু আন্তরিকতা রয়েছে। পাল্টা ক্যু'দাতার তাৎপর্য কি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসররা বুঝতে পারছেন না? এটা অসম্ভব! আর সব বুঝে শুনে এ ধরণের প্রস্তাব রাখার মানে হল এটাও একটি অতি সূক্ষ্ম চাল। প্রেসিডেন্টের মত আমাদেরও এই রাষ্ট্র বিরোধী চক্রান্তে জড়িয়ে ফেলতে চাইছেন চক্রান্তকারীরা। একটু ভেবে নিয়ে আমি জবাব দিলাম,

— স্যার, এখন পর্যন্ত নিজেদের সম্পর্কে ভাববার কোন সময়ইতো পেলাম না তাছাড়া ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে সবার সাথে আলাপ-আলোচনা করা ছাড়া আমাদের পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়। আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক করা হবে আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কি করব। স্যার, আপনার স্বপক্ষে যারা রয়েছে তাদের অনেকেই ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় আমাদের স্বপক্ষেই ছিল। এ সম্পর্কে আপনিও অবগত রয়েছেন। আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলছি, জেনারেল জিয়া আমাদের কিংবা আগষ্ট বিপ্লবের তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন অথবা সেনাবাহিনীর স্বার্থ রক্ষা করে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এর কোনটাই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। এ ধরণের অভিযোগ এবং প্রচারণা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে করি আমরা। বিনা কারণে তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে তার উপর অনাস্থা আনার অজুহাতে এই ধরণের একটা জাতীয় সংকট সৃষ্টি করার উদ্যোগ কখনোই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি করার প্রস্তাবর পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এতটুকুই বলবো, ১৫ই আগষ্টের চেতনা এবং ৩রা নভেম্বরের উদ্দেশ্য এক নয়। ১৫ই আগষ্ট এবং ৩রা নভেম্বরের ঘটনা কোন দিনই বাংলাদেশের ইতিহাসে একইভাবে লেখা হবে না।

স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের নাগপাশ এবং বিদেশী প্রভুদের জাতাকল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে স্বাধীনতার চেতনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের পথ খুলে দেবার জন্যই সংঘটিত হয়েছিল ১৫ই আগষ্টের মহান বিপ্লব। আগষ্ট বিপ্লবের সফলতা এবং এর প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এক উজ্জ্বল-অবিস্মরণীয় মাইলফলক হয়ে চিহ্নিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে। আপোষহীন সংগ্রামী বাংলাদেশীদের জন্য জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিভু হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে ১৫ই আগষ্টের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন। পক্ষান্তরে, ৩রা নভেম্বরের ঘটনা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চক্রান্তের কালো অধ্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হবে ইতিহাসে। জানি, আমার এই বক্তব্য ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের কারো কাছেই গ্রহণীয় নয়; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতই আমার কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করবে। আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করি সেটা যথা সময়ে আপনারা জানতে পারবেন।

এভাবেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগিদের সাথে বোঝাপড়া শেষ করে বঙ্গভবনে ফিরে এলাম। সঙ্গে এসেছিলেন তাদের দুই প্রতিনিধি কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক। পথে নূর আমায় বলল,

— স্যার আপনি যেভাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কথাগুলো বলছিলেন তাতে আমি কিন্তু বেশ কিছুটা শংকিতই হয়ে উঠেছিলাম।

নূরের কথার কোন জবাব না দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম-

যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছে নূর। এতটা খোলাখুলিভাবে ঐ ধরণের কথা বলাটা নিঃসন্দেহে ছিল একটা বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কথাগুলি বেফাঁস বেরিয়ে

এসেছিল মুখ দিয়ে অটোম্যাটেকেলি। নিঃস্বার্থভাবে কোন সঠিক এবং মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলে প্রয়োজনীয় সাহসিকতা হয়তো বা আল্লাহ্‌তা'য়ালাই যুগিয়ে দেন।

বঙ্গভবনে ফিরে এসে প্রেসিডেন্টকে জানালাম, চক্রান্তকারীরা জাষ্টিস সায়েমের মাধ্যমে ক্ষমতা পুনর্দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সব শুনে প্রেসিডেন্ট মোশতাক জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার এ সিদ্ধান্তের কথা জেনে নিয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক বঙ্গভবন থেকে ফিরে যান।

সেনা পরিষদ সাময়িকভাবে চিহ্নিত নেতাদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটা ছিল একটি সাময়িক কৌশল মাত্র।

প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের পর সেনা পরিষদের কার্যনিবাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে এক জরুরী বৈঠক হয়। বৈঠকে বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের **exposed** নেতারা কৌশলগত কারণে দেশ ত্যাগ করে দেশের কাছাকাছি কোন রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে অবস্থান নেবে। সার্বিক বিবেচনায় ব্যাংকক-কেই সর্বত্তোম জায়গা হিসাবে বিবেচিত করা হয়। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কি করে খালেদ চক্রের পতন ঘটাতে হবে সেই বিষয়ে। জাতীয় বেঈমান পরাজিত আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠি এবং তাদের মুরুব্বী ভারতের হাতে ক্রিয়াণক খালেদ চক্রকে উৎখাত করার জন্য সেনা পরিষদ কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী এবং জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক অন্যান্য দল ও গ্রুপ নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে খালেদ চক্রের মুখোশ উন্মোচিত হবার পর উপযুক্ত সময়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আর একটি অভ্যুত্থান ঘটাবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা ছিল প্রেসিডেন্ট মোশতাক এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সম্পর্কে। সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ চক্রের পতনের পর সর্বপ্রথম কাজ হবে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাকে আবার সেনা প্রধান হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। নিজ পদে অধিষ্ঠিত হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানাবেন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, নেতৃবৃন্দের যে অংশ ব্যাংককে অবস্থান করবে তার সাথে প্রয়োজনমত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে সেনা পরিষদ। জরুরী বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলো বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের ইউনিটগুলোকে জানিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। কর্নেল তাহেরও তখন বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে তিনি বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। বৈঠক যখন শেষ হয় তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংককে যাবার সব ব্যবস্থা করার জন্য প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েট থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদকে আমাদের দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য ফোন করলাম,

— স্যার, আমাদের ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি হয়তো বা জেনেও থাকতে পারেন। তবুও কথা দিয়ে এসেছিলাম তাই কথা রক্ষার্থে জানাচ্ছি: রশিদ, ফারুক, শাহরিয়ার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, মহিউদ্দিন, শরফুল, মাজেদ, কিসমত, নাজমুল, মোসলেম, হাশেম, মারফত এবং আমি স্বপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ রাতেই চলে যাব আমরা। প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েটের মাধ্যমে। আপনার সাথে সহযোগিতা করার অনুরোধ রাখা সম্ভব হল না স্যার। দেশ ও জাতির জন্য ভবিষ্যতে আর কিছু করার তৌফিক আল্লাহ্পাক যদি নাই দেন সেটা মেনে নিতে পারব; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে '৭১ এর চেতনা এবং নীতির প্রশ্নে আপোষ করে জাতীয় বেঈমান হিসাবে পরিচিতির যে গ্ল্যানি সেটা সহ্য করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়; হবেও না কোনদিন।

— "রশিদ-ফারুক সম্পর্কে আমাদের বিরূপ মনোভাব আছে, তারা দেশ ছেড়ে যেতে চাইতে পারে কিন্তু তোমরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছ কেন সেটা এখনো বুঝতে পারছি না।" আবার কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

মুখে আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেও বুঝেছিলাম আমাদের দেশ ত্যাগের খবরটা পেয়ে হাঁফ ছেড়েই বেচেঁছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগিরা এটা ভেবে যে, তাদের প্রতিপক্ষের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠির **threat** থেকে রেহাই পেলেন তারা।

এভাবেই দেশ ও জাতিকে একটি সম্ভাব্য আত্মঘাতী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়ে খালেদ চক্র ও নব্য চানক্যদের ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করার কৌশলগত কারণেই ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল রাত সাড়ে দশটায় বিমানের একটি স্পেশাল ফ্লাইটে আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ সালের বৈপ্লবিক সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান

ব্যাংককের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশ ত্যাগের পর মাত্র ৩ দিনের মধ্যেই সেনা পরিষদ এবং গণবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। অন্যান্য দেশপ্রেমিক এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহও ঐ অভ্যুত্থানে যোগ দেয়। দেশপ্রেমিক বীর সেনানীদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয় জাগ্রত জনতা।

আমাদের দেশ ত্যাগের মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে মূলতঃ সেনা পরিষদ এবং কর্নেল তাহেরের অধিনস্থ গণবাহিনীর যৌথ নেতৃত্বে সংঘটিত হয় ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক সিপাহী-জনতার বিপ্লব। ক্ষমতাচ্যুত হয় খালেদ চক্র। জাতীয় বেঈমান ও তাদের বিদেশী প্রভুদের সব চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে দেয় অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা। দেশের আপামর জনসাধারণ ৭ই নভেম্বরের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়ে সেনাবাহিনীর বীর জোয়ানদের সাথে যোগ দেয় ঠিক একইভাবে যেভাবে তারা সমর্থন জানিয়েছিল আগষ্ট বিপ্লবকে। এই দুই ঐতিহাসিক দিনে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র সংগ্রামী জনতার ঢল নেমেছিল পথে-প্রান্তরে, অলিতে-গলিতে, শহরে-গ্রামে। নামাজে শুক্‌রানা আদায় করেছিলেন মুসল্লিরা মসজিদে-মসজিদে। শহর-বন্দরে খুশীতে আত্মহারা জনগণের মাঝে মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ এবং জনগণের একাত্মতায় সৃষ্টি হয়েছিল এক দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য। সেই দুই ক্রান্তিলগ্নে সম্মিলিতভাবে তারা বাংলাদেশকে পরিণত করেছিল এক দুর্জয় ঘাঁটিতে। সমগ্র জাতি প্রস্তুত ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যেকোন আগ্রাসন কিংবা হুমকির বিরোধিতা করার জন্য। সফল বিপ্লবের পর কুচক্রীদের নেতা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং তার কয়েকজন ঘনিষ্ট সহযোগী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। কর্নেল শাফায়াত জামিল ও অন্যান্যদের বন্দী করা হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে আবার তাকে আর্মি চীফ অফ স্টাফের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার আবেদন জানান। কিন্তু জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ জেনারেল জিয়াউর রহমানের আবেদনে পুনরায় রাষ্ট্রপতি হতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি ঐদিনই জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দান করে ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনা দুইটি বিচ্ছিন্ন নয়। ঘটনা দুইটি একই সূত্রে বাঁধা। একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল এই দুইটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। ১৫ই আগষ্ট অগ্রণীর ভূমিকায় ছিল সেনা পরিষদ আর ৭ই নভেম্বর একই দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করেছিল সেনা পরিষদ এবং কর্নেল তাহেরের অধিনস্থ গণবাহিনী। এই দুইটি ঐতিহাসিক জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার চেতনা, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেতনা, ইন্দো-সোভিয়েত বলয়ের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার চেতনা, স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার চেতনা- এক কথায় বলতে গেলে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

৩রা নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর এই সময়ের আমার এ ঘটনা বিবরণের স্বপক্ষে প্রমাণ হয়ে আছে ৭ই নভেম্বর সফল বিপ্লবের পর সৈনিক-জনতার মুখে ধ্বনিত শ্লোগানগুলি। সেদিন ঢাকার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল গগনবিদারী শ্লোগানে,

নারায়ে তাক্‌বীর। আল্লাহু আক্‌বর।

সিপাহী-জনতা ভাই ভাই। খালেদ চক্রের রক্ত চাই।
খন্দোকার মোশতাক জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।
মেজর ডালিম জিন্দাবাদ। কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ।
ডালিম তাহের ভাই ভাই। বাকশালীদের রক্ষা নাই।
রশিদ-ফারুক জিন্দাবাদ। খালেদ মোশাররফ মুর্দাবাদ।
জেনারেল জিয়া যেখানে, আমরা আছি সেখানে।

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ এর বৈপ্লবিক সফল অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। অম্লান হয়ে থাকবে নিজ মহিমায়। সেদিন আগষ্ট বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মাটি থেকে স্বৈরশাসনের একনায়কত্ব ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটেছিল এবং উন্মোচিত হয়েছিল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্বার। আগষ্ট বিপ্লব বাকশালী কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে গতিশীলতার সৃষ্টি করে সূচনা করে এক নতুন দিগন্তের। '৭৫ এর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময় বাকশালী প্রবীণ নেতা মরহুম আব্দুল মালেক উকিল লন্ডন সফর করছিলেন। মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তখন সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "**বাংলাদেশে ফেরাউনের পতন হয়েছে।**" আওয়ামী-বাকশালী নেতা জনাব মহিউদ্দিন আহমদ খন্দোকার মোশতাক সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে ছুটে গিয়েছিলেন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকে আগষ্ট বিপ্লবের অপরিহার্যতা বুঝিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করার জন্য। জনাব আবু সাইদ চৌধুরী মুজিব সরকারের সাবেক রাষ্ট্রপতিও স্বেচ্ছায় খন্দোকার মোশতাকের বিশেষ দূত হিসেবে ও পরবর্তিকালে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র সফর করে আগষ্ট বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে সে সমস্ত দেশের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভুত্থান ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির উন্মেষ ঘটেছিল জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তারই ধারা আজও দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির প্রতীক ১৫ই আগষ্টের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও তার চেতনা সর্বকালে সর্বযুগে এদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিক ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাবে নব্য সৃষ্ট মীরজাফর ও জাতীয় বেঈমানদের উৎখাত করতে। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার জ্বলন্ত নিদর্শন ১৫ই আগষ্টের মহান বিপ্লব।

গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল!

শেখ মুজিবকে জাতির পিতা কিংবা বঙ্গবন্ধু হিসেবে মেনে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই।

কোন ব্যক্তিকে জাতির পিতার মর্যাদা দেবার বিষয়টি জনগণের আবেগের সাথে জড়িত। শক্তি প্রয়োগ করে কিংবা আইনের দাপটে ঐ আবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। স্বাধিকারের আন্দোলনের মুজিবের অবদান অন্যান্য নেতাদের মতই সর্বজন স্বীকৃত। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব যখন ক্ষমতাসীন হন তখন তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। তার আমলেই দেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল, সেখানে তাকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য জনগণের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। মাত্র তিন বছরের মাথায় দুঃশাসনের জন্য তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। '৭৫ এর জানুয়ারীতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে স্বৈরাচারী একদলীয় বাকশাল কায়েম করে তিনি পারিবারিক রাজতন্ত্রই কায়েম করেছিলেন। স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে জনগণকে মুক্ত করেছিল ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থানের পর খন্দোকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান তার সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বাকশালীয় সাংসদরা মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদও করলেন না; শেখ মুজিবের মন্ত্রীদের বৃহদাংশ মোশতাক সরকারে যোগ দিলেন। রক্ষী বাহিনীর প্রধান কোন প্রতিক্রিয়াও দেখালেন না। পক্ষান্তরে জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল সে কথা ঐ সময়ে যাদের বয়স অন্ততঃ ১০/১২ বছর তাদেরও স্পষ্ট মনে থাকার কথা। গত ১৫ই জুলাই ২০০১ সালের রাতে কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হবার পরপরই স্বতঃস্ফুর্তভাবে জনগণ বিপুল সংখ্যায় মুক্তির আনন্দ যেভাবে প্রকাশ করেছে, '৭৫ এর আগষ্টে জনগণ এর চেয়েও বহুগুন বেশি আবেগ-উচ্ছাস ও আনন্দে মেতে উঠেছিল। উপরোক্ত প্রতিক্রিয়া এ কথাই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিবকে জনগণ জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করেনি। বরং তার কুশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পরম স্বস্তি বোধ করেছে। এবং আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। এতেও প্রমাণিত হয় যে, শেখ মুজিব কখনোই জনগণের মনে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তা না হলে তার নিহত হবার কারণে রাস্তায় নেমে জনগণ অবশ্যই বিলাপ করতো। বিলাপ করা তো দূরের কথা কেউ প্রকাশ্যে সেদিন "ইন্নালিল্লাহ...." পড়েছে বলেও নাকি জানা যায়নি। বঙ্গবন্ধু উপাধিতে যারা তাকে ভূষিত করেছিল তারাই আবার সে উপাধি ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ ব্যাপারে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্ণেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম বীর উত্তম

২রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও তার সঙ্গীরা প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দাতা ঘটাবার চেষ্টা করে

১৯৪৬ সালে জন্ম। বি. এস. সি গ্রাজুয়েট। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর তিনি বিমান বাহিনী থেকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতেই সুদূর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে যে দলটি সর্বপ্রথম মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ সাহস ও কৃতিত্বের জন্য তিনি বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হন। একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় তার অবদান উল্লেখযোগ্য।

শেখ মুজিবের স্বৈর শাসনকালে ১৯৭৪ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নং ৯ (PO-7) এর প্রয়োগে তিনি চাকুরিচ্যুত হন। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর তাঁকে সেনাবাহিনীতে পুর্ণঃনিয়োগ করা হয় এবং লেঃ কর্ণেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত হবার পর গণচীনে তাঁকে কূটনীতিক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। ১৯৮০ সালে লন্ডন হাই কমিশনের সাথে তিনি এ্যটাচ্ড হন। ১৯৮২ সালে কমিশনার হিসাবে হংকং এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রদূত হিসাবে কেনিয়ায় পোষ্টেড হন। একই সাথে তাঁকে তানজানিয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়।

ইউনেপ (UNEP) এবং হেবিটাট (HABITAT) এ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। সোমালিয়ায় যুদ্ধকালীন সময়ে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর অংশ হিসাবে প্রেরিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সার্বিক তত্বাবধানের বিশেষ দায়িত্বও তিনি পালন করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর লাভ করেন। এরপর দেশে ফিরে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন। তিনি বিবাহিত এবং এক কন্যার জনক। তার শখ হল বই পড়া, ভ্রমণ, খেলাধুলা এবং সঙ্গীত।

....সমসাময়িক ভাবনা

জাতীয় বিপ্লব এবং সংহতি দিবস ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫
এবং
অব্যাহতি আইনসমুহ

এই অবিস্মরনীয় দিনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে। তখন থেকেই দেশবাসী শ্রদ্ধার সাথে এই দিনটি উদযাপন করে আসছেন। শুধুমাত্র শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী-বাকশালীরা দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে অস্বীকার করে আসছেন বোধগম্য কারণে। এমনটি করলে তাদের অতীত ঐতিহাসিক ব্যর্থতাকে মেনে নিতে হয়। তেমন ঔদার্য্য দেখানো শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের মতো একটি দলের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা কখনোই সম্ভব নয়।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে হিজাব ধারণ করে, হাতে তাসবিহ্ নিয়ে নিজেদের অতীত ভুলভ্রান্তির জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে দেশবাসীর কাছে ভোট ভিক্ষা করেন শেখ হাসিনা। ছলনাময়ী আচড়ন, অস্থায়ী সরকারাধীন প্রশাসনের দুর্নীতিবাজ সুযোগ সন্ধানী একটি গোষ্ঠীর চক্রান্তের পরও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পেরে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হতে সমর্থ হন হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ; দীর্ঘ ২১ বছর পর। কিন্তু ক্ষমতায় বসার পরমুহুর্তেই হিজাব ও তাসবিহ্ এর লেবাস পরিত্যাগ করে অল্প সময়ের মধ্যেই জনসম্মুখে শেখ হাসিনা এবং তার সহচরগণ স্বরুপে নিজেদের আত্মপ্রকাশ ঘটান। জনগণ বুঝতে পারেন আওয়ামী লীগে কোন পরিবর্তন তো হয়নিই বরং জিঘাংসা ও প্রতিহিংসা চিরতার্থ করার জন্য তারা জলার পেত্নীর চেয়েও আরো বেশি হিংস্র ও ভয়ংকর মহিরুহতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে ২০০১ সালের নির্বাচনে ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের রাহুগ্রাস থেকে দেশ ও নিজেদের বাচাঁবার জন্য জাতি আওয়ামী লীগকে ছুড়ে ফেলে দেয় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। শোচনীয় পরাজয় ঘটে শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের। ক্ষমতা গ্রহণের পরেই জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে উদযাপনের জন্য ঘোষিত সরকারি ছুটির দিন বাতিল করে দেয় আওয়ামী সরকার। সংবিধানের তোয়াক্কা না করে অবৈধভাবে ১৫ই আগষ্টের জনসমর্থিত সফল বিপ্লবের নায়কদের বিরুদ্ধে শুরু করা হয় 'মুজিব হত্যা' ও 'জেল হত্যা' বিচারের প্রহসন।

৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় একটা বিরল ঘটনা। এমন ঘটনা জাতীয় ইতিহাসে ঘটে বিশেষ কোনো ক্রান্তিলগ্নে বিশেষ এক পটভূমিকায়। আজ অব্দি ৭ই নভেম্বর নিয়ে নানা ধরণের বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারণা করা হলেও কি ছিল এর পটভূমি? কোন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, কিসের বিরুদ্ধে, কাদের নেতৃত্বে ঘটেছিল এই অভ্যুত্থান সেই সর্ম্পকে কিছুই বলা হয়না। দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মহলও এই বিষয়টিকে রহস্যজনকভাবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন সতর্কতার সাথে।

৭ই নভেম্বরের তাৎপর্য্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে দেশবাসী বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মকে অবশ্যই পরিষ্কারভাবে জানতে হবে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব :-
কি উদ্দেশ্যে, কোন চেতনা প্রেরণা যুগিয়েছিল সেই অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটাতে?
অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন কারা?
(১) কেন ঘটেছিল সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান?
(২) কি উদ্দেশ্যে, কোন চেতনা প্রেরণা যুগিয়েছিল সেই অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটাতে?
(৩) কিসের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল বিপ্লব?

(৪) অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন কারা?

এই প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে না পেলে জাতীয় সংহতি দিবস শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতাই হয়ে থাকবে। জাতীয় চরিত্রে এর মুল্যবোধকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা কখনোই সম্ভব হবে না। ৭ই নভেম্বরের চেতনা ও উদ্দেশ্য সর্ম্পকে জানতে হলে '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকেই শুরু করতে হয়।

২৫শে মার্চ '৭১ এর কালরাত্রিতে তদানীন্তন পাকিস্তানের অর্বাচীন সামরিক জান্তার নির্দেশে সামরিক বাহিনী যখন হায়নার মত নজিরবিহীন পাশবিক বর্বরতায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল তখন প্রস্তুতিহীন জাতিকে তোপের মুখে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে শীর্ষ নেতা শেখ মুজিবর রহমান স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপদ আস্তানায় পাড়ি জমান। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি ছাত্র সমাজ ও আপামর জনগণের সব মিনতি ও অনুরোধ উপেক্ষা করে তার দলীয় নেতাদের প্রাণ বাচানোর জন্য পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান। জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার আকুতিকে শেখ মুজিব খারিজ করে দিয়েছিলেন এই বলে যে বন্দুকের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। শেখ মুজিবের স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যগণ হলেন সরকারী অতিথি। তার এই ধরণের কাপুরুষোচিত বিশ্বাসঘতকতায় জাতি ক্ষণিকের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সন্ধিক্ষনে সেনাবাহিনীর এক অজ্ঞাত তরুণ অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো কয়েকজন সমমনা তরুণ সহকর্মীদের পরামর্শে ও সহযোগিতায় চট্টলার কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন স্বাধীনতার। জাতির প্রতি আহ্বান জানালেন প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার। তার সেই দিক নির্দেশিকার ফলেই সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, আনসার-মুজাহিদ বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যদের কেন্দ্র করে সকল স্তরের জনগণ গড়ে তুলেছিলেন দেশব্যাপী জাতীয় প্রতিরোধ। তারই পরিণতিতে গড়ে উঠে স্বাধীনতার সংগ্রাম।

কিন্তু আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ভারতের কর্ণধার চানক্য গোষ্ঠি। বন্ধুত্বের আবরণে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন চিরতার্থ করার জন্য প্রণয়ন করে সুদুরপ্রসারী এক নীলনকশা। মূল লক্ষ্য তাদের পরম শত্রু পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করে তার শক্তির ভিতকে দূর্বল করে 'অখন্ড ভারত' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চিরন্তন খায়েশ কায়েমের পরিকল্পনাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একই সাথে স্বাধীন বাংলাদেশকে তাদের করদ রাজ্যে পরিণত করা। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সব কৃতিত্বের একক দাবিদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসানোর ভারতীয় সমর্থন ও অঙ্গিকারের পরিপ্রেক্ষিতে তদকালীন কোলকাতা নিবাসী অস্থায়ী প্রবাসী সরকার এবং পরবর্তীকালে মুজিব সরকার ভারতের সেবাদাসের ভূমিকা পালনের দাসখত লিখে দেয়। শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে এবং লাখো শহীদের রক্ত ও হাজারো মা-বোনের ইজ্জতের সাথে বেঈমানী করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ। শুধু কি তাই? '৭১ থেকে আজাব্দি জাতিয় মুক্তি সংগ্রামের একচ্ছত্র দাবিদার বনবার নির্লজ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করে দেশকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত করল মুজিব সরকার। মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং বাকশালী একদলীয় স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি এবং বিভিষিকায় আজো আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠে বাংলার মানুষ।

শেখ মুজিবের উত্তরসূরী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তাদের বিগত ৫ বছরের অপশাসন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুজিব আমলের সেই বিভিষিকাময় ইতিহাসকেই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে।

স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ভারত হয়ে ফেরার পথে সদ্য প্রসুত দেশের জন্য দুটো উপহার নিয়ে আসলেন।

১। তিনি ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চারটি নীতিকে আমাদের শাসনতন্ত্রের মূল স্তম্ভে প্রতিষ্টিত করলেন। হিটলারের 'মেইন ক্যাম্ফ' এর অনুকরনে 'মুজিববাদ' নামক এক উদ্ভট রাজনৈতিক দর্শণ উদভাবন করলেন। দেশবরেন্য রাজনীতি বিশারদ এবং চিন্তাবাদীদের কেউই তার সেই উদভট সৃষ্টিকে রাজনৈতিক দর্শণ হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন না। বরং তারা 'মুজিববাদ' এর মধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক এক নায়কত্বেরই পূর্বাভাষ দেখতে পান।

২। তিনি ভারতীয় জাতীয় সঙ্গিত রচয়িতার একটি কবিতাকেই পছন্দ করে সেটাকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গিতের মর্যাদা দিলেন। এ ধরনের হঠকারিতা কার পক্ষে সম্ভব; একজন দেশ প্রেমিক না একজন দেশদ্রোহীর? এ বিচারের ভার থাকল স্বদেশবাসীর উপরই।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই চানক্যদের ওই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই। তাদের পক্ষে প্রবাসী সরকার ও শেখ মুজিবের সেবা দাসত্ব মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। তারা কখনোই শুধুমাত্র ভৌগলিক স্বাধীনতার নামে ইসলামাবাদের গোলামীর পরিবর্তে দিল্লীর দাসত্ব মেনে নিতে পারেননি। তাদের চেতনা ছিলো সত্যিকার অর্থে স্বাধীন, সমৃদ্ধ, সুখী এক বাংলাদেশ। তাই স্বাধীনতা উত্তরকালে তারাই আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে গড়ে তোলেন সংগঠিত প্রতিরোধ সংগ্রাম। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শ্বেত সন্ত্রাসের জাতাকলে প্রতিপক্ষের শক্তিকে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবে। তাদের বেশির ভাগই ছিল জানবাজ মুক্তিযোদ্ধা।

স্বাধীনতার পর মুজিব সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয় জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে। স্বৈরশাসনের স্বার্থে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে মুজিব সরকার এবং আওয়ামী লীগ কখনোই জনগণের বিরুদ্ধে দলীয় লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতে পারেনি। এর মূল কারণ; বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল পরিক্ষিত জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তান থেকে দীর্ঘ কারা নির্যাতন ভোগকারী সেনা সদস্যদের সমন্বয়ে। তাই যুক্তিগত কারণেই বিশ্বের অন্য কোন পেশাদার সামরিক বাহিনী থেকে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর চরিত্র হল ভিন্ন প্রকৃতির। দেশ ও জনগণের স্বার্থই তাদের কাছে মুখ্য; কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি কিংবা দলের কায়েমী স্বার্থ নয়। এর ফলে সামরিক বাহিনীকেও পরতে হয় মুজিব সরকারের রোষানলে। পরিণামে সেনাবাহিনীতেও সময়ের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে দুটি গোপন সংগঠন। 'সেনা পরিষদ' ও 'গণবাহিনী'। জাতীয়তাবাদ ও দেশেপ্রেমের প্রশ্নে এই দুটি সংগঠন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী অন্যান্য সংগঠন-গ্রুপগুলোর অঙ্গীকার ছিল এক ও অভিন্ন। পার্থক্য ছিলো নীতি আদর্শের। সেনা পরিষদের আদর্শ ছিলো দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। গণবাহিনীর আদর্শ ছিলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।

আওয়ামী-বাকশাল শাসনামল ছিল বর্বরতার নজীরে পূর্ণ। হাজারো পৃষ্ঠায় তার বিবরণ শেষ হবার নয়। তবুও স্বৈরশাসনের একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল।

আওয়ামী-বাকশালী শাসনকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেন। জাতির কাঁধে চাপিয়ে দেন স্বৈরতান্ত্রিক এক দলীয় বাকশালী শাসনের জোঁয়াল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারসহ সকল রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল। সরকারি নিয়ন্ত্রনে মাত্র ৪টি দৈনিক রেখে বাকি সব প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। বিচার বিভাগের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়ে বিচার বিভাগকে প্রশাসনের অধিনস্থ করা হয়। এভাবেই আইনের শাসনের কবর রচিত হয়। আওয়ামী-বাকশালী শাসনামল ছিল মূলতঃ হত্যার ইতিহাস, নারী নির্যাতনের ইতিহাস, লুণ্ঠনের ইতিহাস,

শোষণের ইতিহাস, চোরাচালানের ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবার ইতিহাস, জাতীয় অর্থনীতিকে বিকিয়ে দেবার ইতিহাস, রক্ষীবাহিনীর শ্বেত সন্ত্রাসের ইতিহাস, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ও লাখো শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানীর ইতিহাস। রাষ্ট্রীয়করণের নামে আওয়ামী লীগ ব্যাংক, বীমা, মিল, কল-কারখানায় হরিলুট করেছিল। দেশে সম্পদ পাচাঁর করার জন্য সীমান্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আওয়ামী শাসনামলে অবাধ লুটপাটের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে 'তলাহীন ঝুড়ি' আখ্যা পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের আমলে বিদেশী সাহায্যের বেশিরভাগ মালই ভারতের কোলকাতা ও বিশাখা পাট্টম বন্দরে খালাস পেতো। একাত্তরের যুদ্ধ আর ধ্বংসযজ্ঞের পর বাহাত্তরে কোন দুর্ভিক্ষ না হয়ে আওয়ামী লীগের শাসন ও শোষণের ফলে '৭৪-এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও বাকশাল সরকার তাদের শাসনামলে এ দেশের জনগণকে গণতন্ত্রের নামে দিয়েছিল স্বৈরাচার; সমাজতন্ত্রের নামে শুরু করেছিল সামাজিক অনাচার; বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে জাতিকে করেছিল বিভক্ত; আর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যুগিয়েছিল ধর্মহীনতার ইনদ্ধন।

এভাবে স্বৈর সন্ত্রাসের নাগপাশে সমগ্র জাতিকে আবদ্ধ করে শ্বাসরুদ্ধকর অসহায় অবস্থায় রাষ্টীয় সন্ত্রসের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে সরকার বিরোধীদের সব শক্তি শেষ করে দেয়া হয়েছিল। সাংবিধানিক এবং গনতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের সব পথ বন্ধ করে দেয়ার লক্ষেই এসমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

এভাবেই জাতির জীবনে নেমে আসে এক চরম হতাশা। চারিদিকে দেখা দেয় ঘোর অন্ধকার। প্রানভরে শ্বাস নিতেও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পরেছিল সাধারন জনগণ।

সেই সন্ধিক্ষনে আবারো শেখ মুজিবের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি সোচ্চার হয়ে উঠেন সেনাবাহিনীর আরেক তরুণ অফিসার বঙ্গ সার্দুল কর্ণেল জিয়াউদ্দিন। ১৯৭২ সালের গ্রীষ্মকালে সাপ্তাহিক হলিডে-তে কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এ নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি সরাসরি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। তিনি তার নিবন্ধে লেখেন, **"Independence has become an agony for the people of this country. Stand on the street and you see purposeless, spiritless, lifeless faces going through the mechanics of life. Generally, after a liberation war, the new spirit carries through and the country builds itself out of nothing. In Bangladesh, the story is simply other way round. The whole of Bangladesh is either begging or singing sad songs or shouting without awareness. The hungry and poor are totally lost. The country is on the verge of falling into the abyss."**

নির্ভিক এই মুক্তিযোদ্ধা এই নিবন্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পঁচিশ বছরের গোপন চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের উল্লেখ করে তিনি বলেন,
-We fought without him and won. If need be we will fight again without him.

১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যদি না হত তাহলে গণতন্ত্রের বধ্যভূমিতে আজকের শতাধিক রাজনৈতিক দলকে একদলীয় বাকশালের ধ্বজা বহন করেই বেড়াতে হত। এমনকি আওয়ামী লীগ নামক কোন দলেরও পুনর্জন্ম হত না। আওয়ামী-বাকশালীদের অনাসৃষ্টির জন্য বিধ্বস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ঘানি দেশবাসীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টানতে হত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, গোলাবারুদ, স্বর্ণ, মূল্যবান ধাতু, যানবাহন, মিল-কারখানার মেশিনপত্র, কাঁচামাল ভারতের হাতে তুলে দিয়ে আওয়ামী লীগ সমগ্র জাতিকে প্রতিপক্ষ মনে করতে থাকে। এসমস্ত কিছুর পরও আওয়ামী লীগ নিজেদের স্বাধীনতার সোল এজেন্ট বানাবার চেষ্টা করে আসছে নির্লজ্জভাবে। এসবের প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় দেশমাতৃকার অন্যতম সেরা সন্তান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল বীর উত্তম কে গ্রেফতার করা হয়েছিল;

প্রাণ হারাতে হয়েছিল বিপ্লবী সিরাজ সিকদার ও হাজারো মুক্তিযোদ্ধাকে। লাঞ্ছণার শিকারে পরিণত হতে হয় অনেক দেশপ্রেমিককে। ২৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদী অসম চুক্তির মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বন্ধক রেখেছিল আওয়ামী লীগই। লালবাহিনী, নীলবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, রক্ষীবাহিনীসহ ইত্যাকার নানা রকমের বাহিনী গঠনের দ্বারা দুঃসহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে বিনা বিচারে চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক কর্মীর প্রাণ সংহার করার কালো ইতিহাস আওয়ামী-বাকশালীদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় রাজনৈতিক নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে নির্মমভাবে পাশবিক অত্যাচার করে হত্যা করার পর শেখ মুজিব স্বয়ং সংসদ অধিবেশনে ক্ষমতার দম্ভে বলেছিলেন, "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?" ২৩/১/১৯৯২ তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে '৭২ থেকে '৭৫ সালের আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসন প্রসঙ্গে জনাব মওদুদ আহমেদ বলেন,
"১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার পর ২৯শে ডিসেম্বর ভোরে আমাকে বিনা অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বন্দী করা হয়েছিল। অথচ সরকার আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনতে পারেনি সেদিন। এই তোফায়েল সাহেবই রক্ষীবাহিনীর ইনচার্জ ছিলেন। আর এই বাহিনীর হাতেই এ দেশের ৪০ হাজার নিরীহ মানুষ জীবন হারিয়েছে। সিরাজ সিকদারের হত্যার কথা আজো এ দেশবাসী ভুলে যাননি। '৭২ থেকে '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট অব্দি আওয়ামী-বাকশালী শাসনকাল এ দেশের ইতিহাসে সবচাইতে কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

জাতির আশা আকাংখাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সে ব্যবস্থা টিতে থাকেতে পারে না। জনসমর্থন ছাড়া কোন ব্যবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। জাতীয় বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকরা যখন জাতির কাঁধে একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাতন্ত্রের বোঝা চাপিয়ে দেয়, জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থ হাসিলের জন্য মীরজাফর বা রাজাকার-আলবদরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাদের অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন থেকে জাতিকে বাঁচানোর তাগিদে, তাদের দুঃশাসন উৎখাত করার জন্য দেশপ্রেমিকদের বিপ্লবের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে যুগে যুগে। একই যুক্তিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বিপ্লব সংগঠিত করা হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের নেতৃত্বে। সেই বিপ্লব ছিল একটি সফল অভ্যুত্থান। দেশ ও জাতি মুক্তি পেয়েছিল দাসত্বের নাগপাশ ও স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে। বাকশাল সরকারের উৎখাত ও মোশতাক সরকারের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন এ কথাই প্রমাণ করেছিল জনগণের আশা আকাংখার সাথে বাকশালের কোন সম্পর্ক ছিল না। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনসমর্থনও ছিল না। এমনকি আওয়ামী লীগের বৃহদাংশেরও সমর্থন ছিল না শেখ মুজিবর রহমানের একদলীয় স্বৈরশাসনের প্রতি। ১৫ই আগষ্টের অভ্যুত্থান স্বতঃস্ফুর্ত জনসমর্থন পেয়ে একটি জনপ্রিয় বিপ্লবে পরিণত হয়।

১৪ই আগষ্ট রাতে ঢাকা বিগ্রেডের নাইট প্যারেড তাই ১৫ই আগষ্ট সুবেহ্ সাদেক বিপ্লবের দিন ঠিক করা হল। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলছে। বিপ্লবের শেষ পর্যায়ের সব প্রস্তুতি শেষ করে আল্লাহ্তা'য়ালার নাম নিয়েই বিপ্লব শুরু করা হল, প্রভাতের প্রথম প্রহরে সমগ্র জাতি তখন গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত। সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করা হল প্রথম প্রতিপক্ষের তরফ থেকেই। গুলিতে তিনজন বিপ্লবী শহীদ হলেন। শুরু হল পাল্টা আক্রমন। অল্প সময়ের মধ্যে সফল অভ্যুত্থানে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন ঘটল। রেডিও বাংলাদেশের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হল, শেখ মুজিব সরকারের পতনের কথা। একই সাথে ঘোষণা করা হল, খন্দোকার মোশতাক আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কারফিউ জারি করা হল দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। জনগণের কাছে আবেদন জানানো হল, বিপ্লবের সমর্থনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য।

স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের পতন ঘটেছে জানতে পেরে সমগ্র জাতি সেদিন স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে ঢাকার রাস্তায় লোকের ঢল নেমেছিল।

জনগণ সারাদেশ জুড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলন স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে। মসজিদে মসজিদে লোকজন সেদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যদের জন্য বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেছিলেন। মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল মহল্লায় মহল্লায়। শেখ মুজিব ও তার দোসরদের জন্য সেদিন বাংলাদেশের জনগণ "ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন" পড়তেও ভুলে গিয়েছিলেন। সবারই এক কথা, "**দেশ জালিমের হাত থেকে বেঁচে গেছে।**"

বাকশালী শাসনে জনগণ ছিলেন অতিষ্ঠ। কিন্তু আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠি যে এতটা ধিকৃত হয়ে উঠেছিল জনগণের কাছে সেটা উপলব্দি করতে পারা গিয়েছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর জনগণের অভূতপূর্ব ও স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থনের বহিঃপ্রকাশে। বাংলাদেশের মানুষ জাতির ক্রানি-লগ্নে অতীতে সবসময় সঠিক রায় দিয়ে এসেছেন সেটাই তারা আরেকবার প্রমাণ করলেন ১৫ই আগষ্টের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে। আগষ্ট বিপ্লবের নৈতিক বৈধতার প্রমান দেশবাসীর স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন।

১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল জাতীয় সংসদে মরহুম শেখ মুজিবের উপর একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তখন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরহুম জিয়াউর রহমান এবং স্পীকার ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ। কোন মৃত ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গেলে প্রথাগতভাবে তার জীবন বৃত্তান্ত পড়ে শোনানো হয় এবং সংসদের কার্যবিবরণীতে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল শেখ মুজিবের উপর যে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তা উত্থাপন করেন স্বয়ং মীর্জা গোলাম হাফিজ। তার পঠিত শেখ মুজিবের জীবন বৃত্তান্তের শেষ লাইনে বলা হয়, "১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।" (সংসদ কার্যবিবরণীর সংরক্ষিত দলিল।)

এটাই মূল কথা। শেখ মুজিবের মৃত্যু একটি সাধারণ হত্যাকান্ড নয়। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু হয়েছিল রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রক্রিয়ায়। একই দিনে শেখ মুজিবের পতনের রাজনৈতিক দিকটি খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। সেটা তিনি করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনুমোদনক্রমে। তিনি বলেছিলেন,
-১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে যে কুখ্যাত কালা কানুন পাস করে বাকশাল নামক একদলীয় স্বৈরাচারী জগদ্দল পাথর দেশের তৎকালীন ৮ কোটি লোকের বুকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল; সেটা ছিল একটা সংসদীয় ক্যু'দাতা। ঐ একদলীয় স্বৈরাচারী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সংগঠিত হয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।" (সংসদ কার্যবিবরণীর সংরক্ষিত দলিল।)

একই অধিবেশনে পরে তিনি ইনডেমনিটি বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটি ২৪১ ভোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়ে আইনে পরিনত হয়। ফলে ইনডেমনিটি আইন পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে সংবিধানের অংশে পরিণত হয়। এভাবেই জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ও নির্বাচিত সাংসদরা ১৫ই আগষ্টের বিপ্লবের স্বপক্ষে চূড়ান্ত ফয়সালা করে বিপ্লব ও বিপ্লব সংগঠনকারীদের সাংবিধানিক বৈধতা দান করেছিলেন।

আজঅব্দি অতিত এবং বর্তমান সরকার প্রদত্ত ইনডেমনিটিগুলোর সাংবিধানিক বৈধতা দান করার বিষয় সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা বিবৃতি এবং লিখিত প্রতিবেদন জনগনের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে, পক্ষে ও বিপক্ষে। এর বেশিরভাগই অস্বচ্ছ এবং প্রশ্নবোধক। এইসব আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার দেখা যায় আওয়ামী লীগকে। বিশেষ করে দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এই বিষয়ে অতিমাত্রায় বিশেষভাবে বিষেদ্গার করে চলেছেন। আওয়ামীপন্থী কিছু চিহ্নিত বুদ্ধিজীবিও ঐ কোরাসে একই সুরে তান তুলেছেন।

একজন সচেতন নাগরিক এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ইনডেমনিটি সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত তথ্য পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরছি যুক্তিসঙ্গত কারণেই। কিছুটা হলেও এই তথ্যসমূহ জনমনে ধুম্রজাল সৃষ্টি করার যে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকেই জাতীয় রাজনৈতিক প্রবাহে ঘটিত বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে নিয়ে; সেই কথার মারপ্যাঁচের আচ্ছাদনের ভেতর থেকে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন সেই প্রত্যাশায়।
ইনডেমনিটি শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'ক্ষতিপুরন থেকে আইনি অব্যাহতি প্রদান।' এ ধরনের ইনডেমনিটি দেয়ার রেওয়াজ বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম চালু করা হয়নি। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কোন বিশেষ কার্যক্রম এবং তদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষদের আইন আদালতের উর্দ্ধে রাখার জন্যই এই ধরনের আইন প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আজকের বিশ্বে তথাকথিত সভ্যতার প্রতিক, পশ্চিমা দেশগুলি যারা বর্তমানে বিশ্ব পরিসরে মানবাধিকার- গণতন্ত্র ইত্যাদির একছত্র প্রচারক ও ধারক-বাহক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছে তারাই এই ইনডেমনিটি দেবার রীতি চালু করেছে। শুধু তাই নয়, আজঅব্দি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দেশের প্রচলিত আইনের আওতা বর্হিভুত রাখার রীতিটাও তাদেরই প্রণীত।

এই ধরনের ইনডেমনিটি প্রদানের নৈতিক ভিত্তি হচ্ছে বৃহত্তর রাষ্ট্রিয় এবং জাতীয় স্বার্থ যথা: - একনায়কত্ব, স্বৈরশাসনের অবসান, বর্হিশক্তির আগ্রাসন থেকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, মানবাধিকার, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা, সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এই প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি ফেরানো যাক বাংলাদেশের প্রতি।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মরহুম শেখ মুজিবর রহমানের সরকারই ইনডেমনিটি প্রবর্তনের ইতিহাস সৃষ্টি করে। ১৯৭২ সালে সরকারি এক অধ্যাদেশ জারি করে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সব কর্মকান্ড, ঘটনাবলী এবং যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষদের ইনডেমনিটি দেয়া হয়। এই আইন পাশ করানোর যুক্তিও ছিল রাষ্ট্রিয় এবং জনস্বার্থ। সামরিক স্বৈরশাসন, অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামকে আইনী বৈধতা দান করা হয়েছিল ঐ আইনের মাধ্যমে। ৬ই মে ১৯৭৪ শেখ মুজিবর রহমানের সরকার দ্বিতীয় ইনডেমনিটি আইন পাশ করেন কুখ্যাত রক্ষীবাহিনী এবং তাদের সমস্ত পাশবিক কার্যক্রমকে আইনি বৈধতা দান করে।

শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার প্রদত্ত প্রথম ইনডেমনিটির বিষয়ে জনাব আবদুল জলিল সাধারন সম্পাদক আওয়ামী লীগ বলেছেন, "১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একটি ইনডেমনিটি আওয়ামী লীগ সরকার জারি করেছিল।" (দৈনিক যুগান্তর ১৩ই মার্চ ২০০৩)। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও এই সত্যতা সংসদে স্বীকার করেছেন ১১ই মার্চ ২০০৩ প্রধাণমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে। কিন্তু তারা দুজনই রক্ষীবাহিনীকে দেয়া ইনডেমনিটি বিষয়টির ব্যাপারে নিঃশ্চুপ থাকেন।

তৃতীয়বার ইনডেমনিটি জারি করা হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জনপ্রিয় বিপ্লবের পর। ১৫ই আগষ্ট ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেশে সাময়িকভাবে জরুরি অবস্থা এবং মার্শাল ল' জারি করা হয় ফলে রাষ্ট্রপতি খন্দোকার মোশতাক আহমদ ১৫ই আগষ্টের ঘটনাবলী এবং বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষদের এক অর্ডিনেন্স জারির মাধ্যমে ইনডেমনিটি প্রদান করেন। এই অর্ডিনেন্স জারি করার যুক্তিও ছিল জাতীয় ও জনস্বার্থ।

এক দলীয় বাকশালী স্বৈরশাসনের নাগপাশে আবদ্ধ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে জাতিকে মুক্ত করে দেশে মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন পূণঃ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষেই সংগঠিত হয়েছিল ১৫ই আগষ্টের বিপ্লব। এরই ধারাবাহিকতায় ৩রা নভেম্বর জাতীয় স্বার্থ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এক ক্যু' ঘটায়। বন্দী করা হয় আগষ্ট বিপ্লবের পর সেনা পরিষদের প্রতিনিধি এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং পদত্যাগের পর প্রেসিডেন্ট খন্দোকার মোশতাক আহমদকেও। এই

প্রতি বিপ্লবী ক্যু' দাতার উদ্দেশ্য ছিল দেশ ও জাতিকে ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে বাকশালী স্বৈরশাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে চক্রান্তকারীদের সব প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয় ৭ই নভেম্বরের মহান সিপাহী-জনতার বিপ্লব। চক্রান্তকারী নেতাদের কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে ক্ষিপ্ত সিপাহী-জনতার হাতে। অন্যদের বন্দী করা হয়। ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবে অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন ১৫ই আগষ্ট বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যরাও। যার ফলে যুক্তিগত কারণেই সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদে প্রেসিডেন্ট খন্দোকার মোশতাক আহমদের জারিকৃত ইমডেমনিটি অধ্যাদেশের পরিসীমা বর্ধিত করে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম ও তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষদের স্বার্থে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধিত ইনডেমনিটি বিলটি সংসদে পাশ করানোর ফলে উক্ত ইনডেমনিটি আইন হিসাবে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর অংশে পরিগনিত হয় ১৯৭৯ সালে। এই ঐতিহাসিক আইনটি প্রণয়ন করেছিল শহীদ জিয়ার নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত তৎকালিন বি.এন.পি সরকার।

২০০১ সালের নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশের ও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বি.এন.পি এর নেতৃত্বে জোট সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সৃষ্ট সার্বিক নৈরাজ্য ও ভেঙ্গে পড়া আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বেসামরিক প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রনে আনতে ব্যর্থ হয়ে জাতির প্রতি অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে জোট সরকার সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে পরিক্ষিত দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনীকে নিয়োগ করে 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' পরিচালনা করার জন্য। ফলে অতি অল্প সময়ে সারা দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। যার ফলে শান্তিপ্রিয় আপামর জনসাধারন অভিনন্দন জানান ' অপারেশন ক্লিনহার্ট'-কে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ করিয়ে আইনে পরিনত করা হয়েছে তৃতীয় ইনডেমনিটি বিলটি। এ ক্ষেত্রেও প্রেক্ষাপট জাতীয় এবং জনস্বার্থ।

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি ইনডেমনিটি বিলটির বিষয়ে উচ্চবাচ্য না করলেও প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনডেমনিটি সর্ম্পকে নিশ্চুপ থেকে তৃতীয় এবং চতুর্থ ইনডেমনিটি আইন দুইটির বিরুদ্ধে জোর গলায় সোচ্চার হয়ে নানা ধরনের উদ্ভট অযৌক্তিক প্রচারনায় মেতে উঠেছে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা বি. এন. পি নেতৃত্তাধীন জোট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে।

শুধু কি তাই?
১৯৯৬ এর নির্বাচনের পর ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়েই সংবিধান কিংবা প্রচলিত আইনের বিধি বিধানের কোন তোয়াক্কা না করে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর অংশ ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব সম্পর্কে প্রদত্ব ইনডেমনিটি আইন বাতিল করে 'মুজিব হত্যা বিচার' এবং 'জেল হত্যা বিচার' এর প্রহসন শুরু করে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দেয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। সরকারের সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আদালতের শরনাপন্ন হলে, সরকার মনোনিত কয়েকজন আওয়ামী পন্থী আইনজীবির দ্বারা গঠিত একটি 'এমিকাস কিউরি' সৃষ্টি করে সরকারের পক্ষে বক্তব্য দেয়ানো হয় যে, ''সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর ইনডেমনিটি অংশটি একটি 'কালা কানুন' বিধায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্টতা ছাড়াও ঐ আইন বাতিল করার সরকারি সিদ্ধান্ত সঠিক!''

এরপর আদালত এই বিষয়ে আর কোন যুক্তিতর্ক শুনতে রাজি হয়নি। হঠকারি উন্নাসিকতার এক অদ্ভুত নিদর্শন!

কোন আইনের ব্যাখ্যা সংবিধানের বিধান অনুযায়ি অবশ্যই আদালত দিতে পারেন। কিন্তু আইনজিবীদের দ্বারা শুধুমাত্র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে কোন আইন বাতিল করা কিংবা কোন সাংবিধানিক পরিবর্তন করার সরকারি সিদ্ধান্তকে সঠিক বলানো শুধু যে সংবিধানের

অবমাননা তাই নয়, এ ধরনের আচরন সমস্ত নৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধ ও নীতি-আদর্শ যার উপর সামাজিক আইন প্রতিষ্ঠিত তার মূলেই কুঠারাঘাতের শামিল।

সরকারি চাঁপের মুখেই হউক, আর লাঠির ভয়েই হউক, কিংবা ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্যই হউক, যে সমস্ত আইনজীবি নৈতিকতা এবং পেশাগত দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে সরকারের তাঁবেদারী করে আইন বিভাগের সুনাম ক্ষুন্ন করেছেন তাদের স্থান হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে; জনধিকৃত, বিবেকবর্জিত আইন লঙ্ঘনকারী হিসাবে। তাদের এই ধরনের হঠকারিতা ক্ষমার অযোগ্য হয়ে থাকবে চিরকাল।

আইন এবং সংসদ বিষায়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ ১২ই মে ২০০৩ তার মন্ত্রনালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, "যৌথ অভিযান ছিল সময়ের দাবি। ১৪ কোটি মানুষের মানবাধিকার রক্ষার জন্য যাদের মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে তাদের বিষয়টি ব্যক্তি পর্য্যায়ের ত্যাগ হিসাবে সরকারকে মেনে নিতে হচ্ছে।"

দায়মুক্তি সর্ম্পকে তিনি বলেন,
"রক্ষীবাহিনী ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী কাজ শুরু করে, ৮ই মার্চ আইন করে বৈধতা দেয়া হয়। এই বাহিনী ৪০ হাজার লোককে খুন করে কিন্তু একটি খুনের ও বিচার হতে পারেনি। ১৯৭৪ সালের ৬মে এই আইনটি সংশোধণ করে বাহিনীটিকে দায়মুক্তি করতে ১৬এ ধারা সংবিধানে সংযোজনের ফলে এ বিচার সম্ভব হয়নি। ৪০ হাজার লোকের হত্যার জন্য রক্ষীবাহিনীকে দায়মুক্তি প্রদানের পর যৌথ অভিযাণের দায়মুক্তির ব্যপারে সমালোচনা করার অধিকার আওয়ামী লীগের আর থাকতে পারে না।" (দৈনিক যুগান্তর ১৩.৩.২০০৩)।
ঠোস্ যুক্তি বটে!

তার এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই বলা চলে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বর সম্পর্কে প্রদত্ব দায়মুক্তি আইনটি শুধুমাত্র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাতিল করে বিচারের প্রহসন করার অধিকার ও আওয়ামী লীগের ছিল না। এই বিষয়ে কিন্তু মহামান্য মন্ত্রী তার বিবৃতিতে কিছুই উল্লেখ করলেন না। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এ বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন কিনা সেটা সময়তেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। যাই হউক না কেন, তার এই একই যুক্তির ভিত্তিতে জনগণের প্রশ্ন: -
"*মহামান্য আইনমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমদ, বর্তমান সরকারের আমলে ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের নায়কদের কারা প্রকোষ্ঠের ডেথ্ সেলে এখনো বন্দী করে রাখা হয়েছে কোন অধিকারে?*"

বর্তমান জোট সরকারের কাছে দেশপ্রেমিক, সচেতন জনগনের প্রত্যাশা: - ইনডেমনিটির বিষয়ে প্রয়োজনে এমন শক্ত আইন প্রণয়ন করা হউক যাতে করে দেশ ও জাতিয় স্বার্থবিরোধী কোন অপশক্তিই ভবিষ্যতে কখনোই সংবিধানের অবমাননা করার ধৃষ্টতা দেখাতে সক্ষম না হয়। একইসাথে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার অসংবিধানিকভাবে জিয়া সরকারের প্রদত্ব ইনডেমনিটি আইনটি বাতিল করে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং '৭৫ এর নিঃস্বার্থ সূর্য্য সন্তানদের বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে কারা প্রকোষ্ঠে তিলে তিলে মারার যে হীন পরিকল্পনা করেছিল; আইনগতভাবে সেই পরিকল্পনাকে অবৈধ এবং অসাংবিধানিক ঘোষিত করা হউক।

এটা সত্যিই এক নির্মম পরিহাস! জাতীয় বীররা এখনো কারা প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর দিন গুনছে জোট সরকারের আমলেও! জনমনের সব সন্দেহের অবসান ঘটানোর জন্য বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের উচিত কালবিলম্ব না কর্বে তাদের মুক্তি দান করে এবং যারা বিদেশে নির্বাসিত অবস্থায় রয়েছেন তাদের দেশে ফেরার পথ সুগম করে দিয়ে জনগণের কাছে প্রমাণ করা যে, জোট সরকার সংবিধানের পবিত্রতা বজিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর।

একটি সত্য আজ সবাইকেই বুঝতে হবে জাতির গৌরব আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ কারোর জন্যই সৃষ্টি করার কোন অবকাশ নেই। কারণ জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা এবং অস্তিত্ব কায়েম রাখার শেষ আধার তারাই।

ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান জোট সরকারের নেত্রী শহীদ জিয়ার যোগ্য উত্তরশুরী সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আপোষহীন হিসাবে বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। তাঁর এই ইমেজকে আরো দৃঢ়ভাবে জনগনের মনে প্রথিত করতে হবে যাতে করে আগামীতে যে কোন ক্রান্তিলগ্নে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী এবং অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদীরা তাঁর উপর নিরংকুশ বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে চিহ্নিত জাতিয় বিশ্বাসঘাতক এবং তাদের দোসর এবং বিদেশী প্রভুদের দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক অপরাজয়ী শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

বিভিন্নমুখী চক্রান্তের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে হলে শুধুমাত্র দল বা জোট নয়; সেনাবাহিনী এবং জনগনের আস্থা ও শক্তির উপরেই শুধুমাত্র বর্তমান জোট সরকারকেই নয় আগামীতেও যে সমস্ত সরকার নিজেদের জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক হিসাবে দাবী করবেন তাদের সবাইকেই নির্ভরশীল হতে হবে। কারো পক্ষেই অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে জাতীয় রাজনীতির ধারা প্রবাহে এই প্রপঞ্চটি একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসাবেই প্রমানিত।

চারিত্রিক দৃঢ়তা সততা, বিচক্ষনতার সাথে সময়ের দাবি মেনে নেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। তেমনটি না করা হলে অতীতের অত্যাবশ্যক ঘটনাসমুহ যথা: -২৬-২৭শে মার্চ ১৯৭১ মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষনা।
১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন।
৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লব এবং অপারেশন ক্লিনহার্ট এর মতো প্রতিটি ঘটনার সাথে যেখানে জড়িয়ে আছে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী এবং দেশের সাচ্চা ও নিবেদিত প্রান জাতীয়তাবাদী জনগণ তার পুনরাবৃত্তি কখনও ঘটবে বলে আশা করা যায় না। তাদের কেউই ভবিষ্যতে জাতীয় সংকটের সন্ধিক্ষনে বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যগের মহৎ উদ্দেশ্যে আগুয়ান হওয়ার উদ্দীপনা, উৎসাহ, প্রেরনা কিংবা সাহস কখনোই পাবেন না। পরিশেষে জাতি নিমজ্জিত হবে আত্মঘাতী এক চরম হতাশায়। দেশকে যারা ভালোবাসেন তারা এমন হতাশাগ্রস্ত বাংলাদেশ কখনোই চান না।

দুঃখজনক-শক্তিহীন নেতিবাচক মানসিকতার শিকড় জাতীয় পরিসরে প্রথিত হবার আগেই এর আশু প্রতিবিধান একটি অত্যাবশ্যিক করণীয়।

বর্তমানে প্রচলিত যে আইন ও সংবিধানীক বিধিবিধান রয়েছে তাকে আরো জোরদার করতে হবে। নিচ্ছিদ্র করতে হবে আইনকে সব ফাঁক ও চোরা গলিগুলো বন্ধ করে দিয়ে। প্রয়োজনে প্রণয়ন করতে হবে নতুন আইন এবং সংবিধানিক বিধিবিধানে এই বিষয়ে এমনভাবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে যাতে সেনাবাহিনী ও জাতীয়তাবাদীদের কে কেউই ভবিষ্যতে যেন আর কখনোই কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে যাবার সাহস না পায় জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে সংকট মোকাবেলার দায়িত্ব পালন এবং কৃতকর্মের জন্য। এই ধরনের ঔদ্ধ্যত্ব তাদের জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের প্রকাশ্য অপমান বিধায় অসহনীয় এবং সম্পূর্ণরুপে অগ্রহনীয়। শুধুমাত্র এ ধরনের ফলপ্রসু আইন এবং সংবিধানিক বিধিবিধানের পরিবর্তনই হতে পারে বর্তমান ও ভবিষ্যত বাংলাদেশের একমাত্র রক্ষাকবচ। শুধু তাই নয় সর্বকালের জন্য বাংলাদেশ পরিনত হতে পারে এক র্দুজয় ঘাঁটিতে। যত সত্বর শুভ বুদ্ধির উদয় হবে জনগণ ও নেতা নেত্রীদের মানসিকতায় এবং উপরে যা লিপিবদ্ধ করা হল তারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন ততই মঙ্গল হবে দেশ ও জাতির।

Design & Developed By: Hemu
All Rights Reserved 2008 © www.majordalimbangla.net